ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস : পঞ্চম খণ্ড

শের-ই-খোদা হযরত আলী

কোরআনের আলোকে : চার খলিফা, খোলাফা-ই-রা'শেদীন
(ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ)

ডক্টর ওসমান গণী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশনায়:
আলহাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স,
৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৬৩

মুদ্রণে: ইউনিক প্রিন্ট এন্ড প্রসেস
২০এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

আল্-হাজ্ব
জনাব আবুল কালাম মল্লিককে

যে কোন জাতির অস্থি করিতে অসাড়্
তুলনা কাহারো নাই নিরক্ষরতার।
নবীজী দিলেন তাগিদ শতবার তাড়া——
তোমরা সকলে দিও জ্ঞান-যোগে সাড়া।
জ্ঞানের কোরকে যেন ফুল রূপে ফুটো
না খাও তবুও ভাল জ্ঞান যোগে ছুটো।

পুণ্যশ্লোক হাজীসাহেব একান্ত বিশ্বাসী
দেখিলেন দিব্য চোখে গুপ্তধন রাশি।
জ্ঞানে-গুণে ইসলামের অযুত ভাণ্ডাব
বুঝিলে সম্মুখে আনা একান্ত দরকার।
নহে শুধু অর্থকরী ব্যবসা কারবার
বাড়াতে চেয়েছো তুমি দ্বীনি-সংস্কার।
দেখিনি তোমাকে শুধু কাজেব দপ্তবে
স্বরূপ দেখেছি তব হৃদয়ে অন্তরে।
ইসলামেব পূর্ণ জ্যোতি কবিতে প্রকাশ
দিব্য-জ্ঞানে দীপ্ত তব মনেব বিকাশ।
যে-কোন জাতির ভাগ্য করিতে অসাড়্
তুলনা কাহারো নাই——বই না পড়ার।

যে-বৃক্ষ করিলে রোপন ঘর্মাক্ত শরীরে
ফলিবে তাহার ফল অদূবে-অচিরে।
একটি জ্ঞানের চারা চিরদিন তবে
তার ফুল, তার ফল নিত্য দান করে।
এরূপ কাজেতে মানুষ যখনই মবিযা——
এই নাম সত্যকাবে সদ্‌কয়ে জা'রীযা।
নিখিলের বুকে আছে যত নেক্‌কাব
আল্লাহই তাঁদেবে দিবেন তাঁদের পুরস্কাব।
একটি জাতির ভাগ্য তখনই ঝিমায
তুলনা কাহারো নাই যাহারা ঘুমায়॥

যে-পথ করিলে নির্মাণ পথিকের লাগি
হাঁটিবে ও পথ ধ'রে কত অনুরাগী।
এ পথ এমনি পথ চিরদিন রবে
বর্ষা বাদলে যার নাহি ক্ষতি হবে।
যে-সৌধ করিলে নির্মাণ নিজ অনুরাগে
সদ্‌কায়ে জা'রীয়া হলো মম চিত্তে জাগে।
তোমার প্রভূত কাজ করিয়া বরণ
করিবে অসংখ্য জন জ্ঞান আহরণ।
তোমার নির্মিত পথে পথিক সুজন
যুগ-যুগ চিরযুগ করিবে ভ্রমণ।
একটি জাতির মজ্জা করিতে অসাড়
তুলনা কাহারো নাই জ্ঞান-চর্চ্চার।

তোমার মহান ব্রতে তুমি আছ রাজী---
সাজাইতে জীবনের সাধ্যমত সাজি।
যে-কাজ করিলে তুমি অন্তরে বরণ
চিরদিন তব জাতি করিবে স্মরণ।
জাতির অস্থি-মজ্জা করিতে সুসাড়
তুলনা কাহারো নাই জ্ঞানের চর্চার।

পূণ্যশ্লোক হাজী সাহেব আবুল কালাম
পূর্ণ হোক এই পথে তব মনস্কাম।
দিবে কি দিবে না মূল্য জানি না সংসার
আল্লাহই তোমাকে দিবে তোমার পুবস্কার।
নাহি আছে এতটুকুও সংশয় আমার
মহান আল্লাহই দিবেন মহান পুবস্কার।

হযরত আলীর শাহাদত্‌ বরণ

আলী হায়দার হযরত আলী 'আল্লাহর শের আলী'
বীর জগতের প্রবাদ পুরুষ এতো নয় কাক্‌তালি।
আবু তালিবের স্নেহের রত্ন জননী ফাতেমার পুত্র
শিশু জীবনেই জন্মসূত্রে ছিলেন বীরের সূত্র।
বীরের ধর্মে বীরের কর্মে জগৎবীবের গর্ব
যাহার হাতে হয়নি কোথাও বীরের ধর্ম খর্ব।
নবীজীর গৃহে লালিত পালিত এমনি যাহার ভাগ্য
গড়িল জীবন নবীরই স্নেহে অপরূপ সৌভাগ্য।
নবীর প্রিয় নবীর প্রহরী নবীর প্রিয় জামাতা
নবী-নন্দিনী ফাতেমার সাথে বিবাহ দিলেন বিধাতা।

মনুষ্যত্বের মহাদিশারী মানবতাতে মহান
হওনি নীচু হওনি নত নীতিতে হওনি ম্লান।
শুকনো রুটিতে কেটেছে তোমার কত যে দিনের দিনান্ত
শয়তানের ফেরে 'শেরে খোদা' আজ শহীদের পাটে শান্ত।

ষড়যন্ত্রের শত বেড়াজালে তোমাকে দেখিনি শাসক
দেখেছি সমরে মহাসেনাপতি দেখেছি নীরব সাধক।
নবীর নীতিকে দিতে প্রাণ তুমি করেছিলে প্রাণান্ত
কোন রণাঙ্গনের রঙ্গ মাঝেই হওনিক পরিশ্রান্ত।
আলীর স্বরূপ সংক্ষেপে যেটি আলী সেই মহামানব
দমন করিতে দিলে প্রাণ তুমি দেশের দুষ্ট-দানব।
নবীর ঝাণ্ডা রাখিতে উঁচু হওনিক রণকান্ত
শয়তানের ফেরে 'শেরে খোদা' আজ শহীদের পাটে শান্ত।
একদিনে জয় করো নাই শুধু খাইবারের সাত দুর্গ
করেছিলে তুমি ঐ দিনে জয় খোদার সাতটি স্বর্গ।
আলীর বাচ্চা আলীর বংশ ফাতেমার সন্তান
চোখের মণি দেশের কলিজা ছিল নবীজীর প্রাণ।
কত যে চুম্বন কত যে আদর করেছেন মহানবী
পবিত্র হাদিসের পাতায় পাতায় দেখি তার কত ছবি।
হাসান হোসেন বিবি ফাতেমা হযরত আলী শের
নবীজীর সাথে এই চারজনের জড়িয়ে গেছে যে ফের
নবীর পতাকা ধরিতে কোথাও হওনিক রণক্লান্ত
শয়তানের ফেরে 'শেরে খোদা' আজ শহীদের পাটে শান্ত।

অধ্যাপক ডক্টর ওসমান গণীর
প্রকাশিত গ্রন্থমালা

---

* ১। কোরআন শরীফ, বঙ্গানুবাদ ও আধুনিকতম ব্যাখ্যা
* ২। কাব্য কানন—(কোরআন ভিত্তিক ইসলামি কবিতামালা)

বাংলা ভাষায় প্রথম সাত শত বছরের:
ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস (৫৭০-১২৫৮):

* ৩। ১ম খণ্ড: মহানবী (৫৭০-৬৩২)
* ৪। ২য় খণ্ড: হযরত আবুবকর সিদ্দীক (৫৭৩-৬৩৪)
* ৫। ৩য় খণ্ড: হযরত ওমর ফারুক (৫৮৩-৬৪৪)
* ৬। ৪র্থ খণ্ড: হযরত ওসমান গণী (৫৭৬-৬৫৬)
* ৭। ৫ম খণ্ড: হযরত আলী হায়দার (৬০০-৬৬১)
* ৮। ৬ষ্ঠ খণ্ড: উমাইয়া খেলাফত্ (৬৬১-৭৫০)
* ৯। ৭ম খণ্ড: আব্বাসীয়া খেলাফত্ (৭৫০-১২৫৮)

কোনদিন কোথাও কোন যুদ্ধেই হওনিক রণক্লান্ত
শয়তানের ফেরে 'শেরে খোদা' আজ শহীদের পাটে শান্ত।

খন্দকেতে হুনায়েনেতে ওহাদেতে স্থির পাহাড়
সকল যুদ্ধেই এনেছ বিজয় শত্রু করিয়া উজাড়।
যে কোন সমরেই সিংহ পুরুষ 'বদরে পতাকাধারী'
সাতটি দুর্গ একদিনে জয় 'খাইবার' জয় তাঁরি।
বলিলেন যখন দ্বীনের নবী 'খাইবার' হবে জয়
আলী তুমি আজ ধরো তলোয়ার করোনাক কোন ভয়।
খাইবার বিজয় করিয়া শেষে ফিরিলে যখন ঘরে
সকলেই তোমায় বীরের রাজা বলিল পরস্পরে।
আল্লাহর নবী হলেন খুশী দেখিয়া বীরের কাজ
দিলেন নবী মহান খেতাব্ 'শেরে খোদা' তুমি আজ।
দ্বীনের পতাকা তুলিতে কোথাও হওনিক রণক্লান্ত
শয়তানের ফেরে 'শেরে খোদা' আজ শহীদের পাটে শান্ত।

জ্ঞানের জগতে জ্ঞানের গগনে জগৎ-জ্ঞানীর গর্ব
করোনি কোথাও জ্ঞান-জগতে জগৎ গুণীর খর্ব।
কোথাও শৌর্যে কোথাও বীর্যে কোথাও শত 'ঘর্ষে
সকল সমরেই রেখেছ তুমি বীরের ধর্ম শীর্ষে।
কোথাও রাগে কোথাও বাগে করোনি কোনই হত্যা
ব্যক্তি স্বার্থে কখনো কোথাও দাওনি কাহারেও পাত্তা।
তোমাকে হত্যা করিল যারা বুঝিল না নরপশু
ক্ষত বিক্ষত করিল তারা দ্বীন ইসলাম-শিশু।
নবীর খেলাফত্ করিল হত্যা দ্বীনকে করিল ক্ষীণ
এই ঘৃণ্য কাজ করিল যারা তারা কি কখনো মো'মিন!
লড়িয়া গেলে বাঁচাতে শুধু নবীর খেলাফত্ নিতান্ত
শয়তানের ফেরে 'শেরে খোদা' আজ শহীদের পাটে শান্ত।

আল্লাহর দ্বীন আল্লাহই বাঁচান তবে শুধু শয়তান
ভাল মানুষেরে শত মারপ্যাঁচে করে শুধু হয়রান।
আলীকে মেরে মারিল যারা আল্লাহর খেলাফত
এই ষড়যন্ত্র করিল যারা কতখানি কম্বখত্!
আলীর স্মরণ করিবে সবাই মোমিন মুসলমান
রোজ হাশরেও দেখিবে সবাই তারা শুধু শয়তান।
স্বাগতমে শহীদের রাতে এলেন খাতুনে জান্নাত
বেহেশ্‌তের পথে আগুয়ান যবে মহানবীজীর সাক্ষাৎ।
জ্ঞানের জগতে 'জ্ঞানের দরজা' বীরের জগতে বীর
আপন নীতিতে সদাই অটল 'ধ্রুব' আকাশেও স্থির।
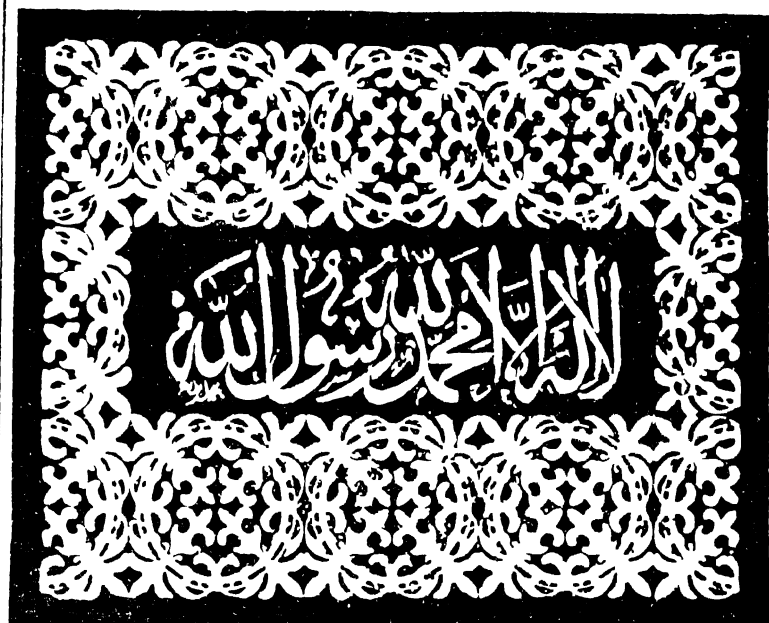
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত দূত।

হে আমাব প্রতিপালক আমাব জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

হোজাইফা বিন আল য়মেন বলেন-- যিনি ইমাম, ও যাঁর কোরআনে সম্যক অধিকার আছে, তাঁবই বিধান দেওয়া সাজে। এই প্রসঙ্গে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ওমর-বিন খাত্তাবেব নাম উল্লেখ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ বলেন--"সারা আবববাসীর জ্ঞান পাল্লাব একদিকে, ও ওমরের জ্ঞান অন্যদিকে দিলে ওমবের দিকই ভাবী হবে। ওমরের সঙ্গে এক ঘণ্টা যাপন কবা এক বছরের নফল এবাদত (অতিরিক্ত উপাসনা) অপেক্ষাও উত্তম।"

--মসনদ্ : দারিমী

শুভেচ্ছাবাণী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ওসমান গনী তাঁর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রথম খণ্ড 'মহানবী' নামে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড 'ইসলামের ন্যায়পরায়ণ চার খলিফা' ও পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা চরম নিষ্ঠার সাথে বাংলা বা মাতৃভাষায় বের করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পথিকৃৎ হয়ে থাকলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বহুদিনের দাবি ছিল, মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করেছি ও করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমানুযায়ী বাংলা ভাষায় ভাল পাঠ্যপুস্তকের এখনও অভাব আছে। এই অভাব পূরণে যাঁরা আন্তরিকতার সাথে সাড়া দিলেন ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলেন অধ্যাপক ডক্টর ওসমান গনী তাঁদের অন্যতম।

আমি আশা করি, সর্বসাধারণ থেকে অসংখ্য গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ বহুলভাবে উপকৃত হবেন ডক্টর গনীর এই কঠিন সাধনাজাত অনন্যসাধারণ কাজের দ্বারা। আমি সর্বতোভাবে কামনা করি দেশ, ভাষা, জাতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে এবং প্রয়োজনে ডক্টর গনীর এই অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ও অনবদ্য সৃজনীশক্তি চরম সার্থকতা লাভ করুক।

স্বাঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার
উপাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাগুরুর স্মৃতিচারণে বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমার জীবনের অদ্বিতীয় শিক্ষা গুরু পরম শ্রদ্ধেয় ঋষিতুল্য মাস্টার মশাই আচার্য সুকুমার সেন (১৬।১।১৯০০—৩।৩।১৯৯২)-এ জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষক, সর্বোচ্চ কারিগর। যিনি একটি মহৎ ইচ্ছা নিয়ে আমাকে দিবারাত্রি উৎসাহিত করেছিলেন এই পথে, এই কাজে। যিনি অকাতরে আমার সমস্ত (৮) গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা দিলেন। আমাদের দু-জনের মধ্যে গুরু ও শিষ্যের মাঝে যে পার্থক্য ;—আমি কতকগুলো বই তৈরী করলাম এবং তিনি আমাকেই তৈরী করেছিলেন, (শুধু শিক্ষা দিয়েই নয়, সঙ্গে ছিল প্রাণভরা স্নেহ-মায়া মমতা) কি অপূর্ব জীবন, কি অপূর্ব উদ্দেশ্য ও মহৎবেদনা, কি অপূর্ব নির্মাতা!

শিক্ষকের পেশা নয়, মহান ব্রত
যা ছিল হৃদয়ে তব স্বতঃ উৎসারিত।
অর্থের গৃধ্নু পথে নহ অধ্যাপক
জগতের জন্ম-সিদ্ধ জাতীয় শিক্ষক।
তোমারই হাতেতে গড়া এ ক্ষুদ্র ওসমান্
স্থির চিত্তে জানি, আমি তোমারই নির্মাণ্।
বলো গো কি দিয়ে গুরু, ঋণ শুধিতাম
অন্তরেতে জাগে শুধু শ্রদ্ধাও সালাম্
মহানন্দ পেতে তুমি করিতে যতন
গড়িতে সহস্র জীবন মনের মতন!
স্নেহ-মায়া মমতার প্রাচীর দিয়ে
গড়েছো অসংখ্য ছাত্র অন্তরে নিয়ে।
বলো গো কি দিয়ে ঋষি ঋণ শুধিতাম
লও শুধু এ প্রাণের প্রণতি-প্রণাম।

হে শতাব্দীর সূর্য, মোহমুক্ত মন
হে আদর্শ শিক্ষক, শিক্ষাজগতের নিখাদ স্বর্ণমোহর
তোমার অগণিত স্নেহধন্য ছাত্রের একজন
আজিও আশীর্বাদ কামী
চির শ্রদ্ধানত
ওসমান গনী

ভূমিকা

[জগদ্বরেণ্য গবেষণাবিদ পণ্ডিত, বাংলা সাহিত্য ও ইসলামি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ]

আচার্য্য সুকুমার সেন

ডক্টর ওসমান গনী আমার ভূতপূর্ব অন্যতম কৃতী ছাত্র। আমার তত্ত্বাবধানে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা সার্থক হয়েছে। তারপর তিনি বাংলাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডি. লিট. ডিগ্রীও লাভ করেছেন। তাঁর অমূল্য গবেষণা গ্রন্থ "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হলে সুধী পাঠক ডক্টর গনীর কাজের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদক ডক্টর ওসমান গনীর ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড 'মহানবী' গ্রন্থটি একটি সার্থক সৃষ্টি।

ডক্টর ওসমান গনীর সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড- 'ইসলামের ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ' প্রথম খণ্ডের মতই সবিশেষ মূল্যবান রচনা। হযরত মহম্মদ (দঃ) এর পরে সবশুদ্ধ তিরিশ বছরের ঘটনা, চারজন খলিফার আমল। এই সময়ে খলিফাদের হাতে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বাণী অনুযায়ী সুবিন্যস্ত ও দৃঢ়নিবদ্ধ হয়, এবং তার ফলে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটায়। এই কারণে এই সময়ের এই ব্যাপার সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে স্বীকৃত। দুঃখের বিষয়, এতদিন পর্যন্ত এই ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক পরিচয় পাবার কোন উপায় ছিল না বাঙালী পাঠকের। এখন আমাদের বাঙালী জীবনে ডক্টর গনী সেই অভাব মোচন করলেন বেশ ভালভাবেই। ডঃ গনীর দ্বারা বাংলায় ইসলামি ইতিহাসের ধারা পুষ্ট হল, পূর্ণ হল; এবং বাংলা ভাষায় ইসলামি আলোচনার পথ সুগম হল বাঙালী পাঠকের কাছে। গ্রন্থটি শুধু বিদগ্ধজনের পাঠ্য নয়, ইসলামি ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের পাঠ্য, অবশ্য পাঠ্য।

ডক্টর গনী তাঁর 'পূর্বাভাষে' 'মুসলিম খেলাফত ও সাম্যবাদ' অনুচ্ছেদে 'সৎখলিফাদের আমলে সাম্যবাদ' (Communism under the pious caliphs) যে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, তা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে ও বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। এরই সমর্থনে গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে বা পরিশিষ্টে সমগ্র ইসলাম জগতের প্রখ্যাত প্রবক্তা একজন জগৎ-মনীষা মওলানা আবুল কালাম আজাদের

লেখা 'ইসলামি গণতন্ত্র' (Democracy under the pious caliphs) নিবন্ধটি জুড়ে দিয়ে গ্রন্থটিকে মানে ও মর্মগত দিক থেকে যেন পূর্ণ মর্যাদা দান করেছেন। এখানে পাঠক-পাঠিকা অতি সহজেই বুঝতে পারবেন, ইসলামের চোখে ইসলামের সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র কি। ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে হযরত আলীব শাহাদত বরণের পর ইসলামের প্রকৃত খেলাফত ব্যবস্থা রহিত হয়, এবং হিজরী সপ্তম শতকে গোটা মুসলিম জাহানের ওপর তাতারদের বর্বরোচিত হামলা নেমে এলে ইসলামের নামমাত্র খেলাফত ব্যবস্থাও চিরতরে লোপ পায়। মোটামুটি এইটাই হল ইসলামেব খেলাফতের ইতিহাস কাল। লেখক দৃঢ় ও অকৃপণ দৃষ্টিতে এ সমস্ত কথাই তুলে ধরেছেন।

আর একটি কথা, গ্রন্থকার চারজন ন্যায়পরায়ণ খলিফার জীবন-ইতিহাস তুলে ধরতে কাহিনী-বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণে যে উচ্ছ্বসিত কলম ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অতি নিরপেক্ষভাবে মুয়াবিয়া ও মারওয়ান প্রমুখ চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তাঁর বেগবান লেখনীকে প্রশমিত করেননি। এটা তাঁর লেখনীর নিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে। যিনি যাব উপযুক্ত, লেখক ঠিক সেই ভাবেই তাঁর চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। কোথাও কোন সত্যের অপলাপ না করে অকৃত্রিম প্রাণে, মুক্ত মনে, স্বাধীন চিন্তায় সকল জটিলতা ও দুর্বলতাকে পবিহাব করে ন্যায় ও নিষ্ঠাব সাথে কোথাও প্রশংসা করেছেন, কোথাও নির্মমভাবে আঘাত হেনেছেন। সত্যের এই সহজাত দৃষ্টিভঙ্গিই লেখককে সফল করেছে অতীতেব ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরতে। তাই তাঁব ইতিহাস লেখা সার্থক হয়েছে যে কোন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর চোখে।

আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি, আমাদের অনেকেই অনেক কিছু কাজ করেন, কিন্তু বিষয়বস্তুর গভীব দেশে প্রবেশ করার শক্তি না থাকায় শুধু অনুবাদ দ্বারাই বাজিমাত করেন। বর্তমান লেখকের সেই দুর্ভাগ্য ঘটেনি। ডঃ গনী ইসলাম জগতের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে যেমন সাবলীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন ও করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহাব করেছেন ইসলামের ইতিহাসের খ্যাতনামা লেখকগণের পুস্তকসমূহ, যেমন অধ্যাপক মূইব, হিট্টি, গিবন, ভনক্রেমার, জোসেফ হেল, আমির আলী, মহম্মদ আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মূল্যবান মতামত। তাঁদের মতামতকে সর্বতোভাবে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে কোথাও সমর্থন করেছেন, কোথাও খণ্ডন কবেছেন।

বই চারটি পড়লে যে কোন পাঠক পাঠিকা সহজেই বুঝতে পারবেন, ডঃ গনী চারটি মামুলি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেননি। এমন চারটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যেখানে আছে --আদর্শ রাজা-বাদশাদের ইতিহাস, আদর্শ মানুষের ইতিহাস, জীবন যাপনের ও সংসার পবিচালনার আদর্শ ধারা, অতি উত্তম চিরজীবন্ত বাণী ও জ্বলন্ত উপমা ইত্যাদি। লেখক দেখাতে সক্ষম হয়েছেন

ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ রাজ্য পরিচালনায় ছিলেন শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ, আবার সংসার পরিচালনায় ছিলেন আদর্শ সংসারী, আচারে-বিচারে, চরিত্র গঠনে ছিলেন মহামানব, গরিবের দুঃখ মোচনে ছিলেন মহানুভব। তাঁরা ত্যাগ ও তিতিক্ষার তুঙ্গে বসে ইসলামের সেবা করেছেন। মানুষের সেবা, সত্যের সেবা, সাম্যের সেবা, শান্তির সেবা তথা সমাজ জীবনের এমন কোন শুভ ও অশুভ অধ্যায় নেই যাকে তাঁরা স্পর্শ করেননি, এবং যাকেই স্পর্শ করেছেন, তার আমূল পরিবর্তনও করেছেন, এখানে তাঁরা ছিলেন সর্বযুগের শাশ্বত সমাজ সংস্কারক ও বিপ্লবী মানুষ। সুতরাং তাঁরা ছিলেন মহান জীবনশিল্পী, তাই ইসলামের ন্যায়পরায়ণ খলিফাদের ইতিহাস মহান জীবনশিল্পীদের ইতিহাস।

এই সমস্ত বিবিধ কারণেই ডঃ গনী রচিত 'চার খলিফা' গ্রন্থাবলী সত্যিকারেই খুব ভাল ও আনন্দদায়ক হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক ভাষাসমূহের গভীর জ্ঞান, ইসলাম জগতের সাথে নিবিড় পরিচিতি, কোরআন ও হাদিসের অসামান্য ব্যুৎপত্তি তাঁর গবেষণালব্ধ ইতিহাস গ্রন্থরাজীকে করেছে জ্ঞানদীপ্ত। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অকৃত্রিম সাধনা তাঁকে সক্ষম করেছে এরূপ সাতটি তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভরশীল অতি উত্তম ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে। যা একদিকে ইতিহাস ও অন্যদিকে কালজয়ী সাবলীল সাহিত্য।

এই গ্রন্থরাজী শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, যাঁরা সেদিনের সমাজ জীবনের একটি নিখুঁত ছবি দেখতে চান, যাঁরা সেদিনের সমাজ জীবনের খলিফাদের পরিচালিত সাম্যবাদকে আজকের সভ্য জগতের মেকী সাম্যবাদের সাথে একবার মিলিয়ে দেখতে চান, যাঁরা প্রকৃত গণতন্ত্রের গগনচুম্বী অজানা ও অভাবনীয় রূপ বুঝতে চান, যাঁরা ইসলামের চার-খলিফার অচিন্ত্যনীয় মহাজীবন চিনতে ও জানতে চান, এককথায় যাঁরা অখণ্ড মনুষ্য সমাজের প্রকৃত মানব জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে চান, তাঁরা অবশ্যই ডক্টর গনী রচিত 'ইসলামের চার খলিফা' পড়বেন, আনন্দ পাবেন। আমি বাঙালী পাঠকদের হয়ে ডক্টর গনীকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

ইতি -

শ্রীসুকুমার সেন

অভিমত

আপনি নিরলসভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে যে বিপুল কর্ম ক'রে চলেছেন, তা বাস্তবিক বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করি।

ইতি—

স্বাঃ স্বামী উমানন্দ

সম্পাদক
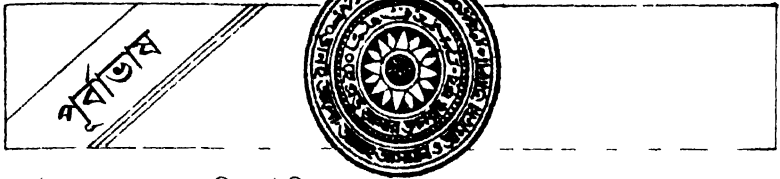
ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড হযরত মহম্মদ (দঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ 'মহানবী' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী ও দেশজোড়া পাঠক পাঠিকাগণের আশাতীত আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়েছি, উৎসাহ বোধ করেছি। বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি পত্রও দিয়েছেন -'ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস' শেষ করার জন্য। তাঁদের অকৃত্রিম অনুরোধে আমি অনুপ্রাণিত ও কৃতজ্ঞ। 'মহানবী' গ্রন্থটি সমাজে এত সত্বর এরূপ মর্মস্পর্শী সাড়া জাগাবে আমি ধারণাও করতে পারিনি। যে কোন লেখকের জীবনে এটা খুবই আনন্দের কথা।

'মহানবী'র পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ইচ্ছা রেখেছি। বহু বিদগ্ধজন হতে সাধারণ মানুষও 'মহানবী' (দঃ) কে 'মানুষ' হিসাবে দেখার যথার্থ মূল্য দিয়েছেন, যার জন্য খুবই আনন্দ পেলাম। বাংলাদেশ হতেও বহু বিদ্যানুরাগী আমাকে অনুরূপ পত্র দিয়ে ধন্য করেছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'মহানবী' গ্রন্থটি প্রভূত সমাদর লাভ করায় সকলকে আবার বিনম্র চিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

কোরআন ১৮ : ১০৯, ১১০, ৪১ : ৬।

আজ সকলের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা মাথায় নিয়ে ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড 'খোলাফায়ে রাশেদীন' (সৎপথে পরিচালিত ন্যায়পরায়ণ চার খলিফাগণ) প্রকাশিত হল। আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি, বহু জনের আগ্রহ ও অনুরোধ আমাকে এই কাজে শক্তি জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে নিবিড় সাধনায়।

মহানবী রচনাকালে যে কোরআনভিত্তিক নীতি অনুসরণ করেছিলাম, এখানেও সেই একই নীতির প্রয়োগ করেছি। কেননা, এখানে যাঁদের কথা আলোচনা করেছি তাঁরা ছিলেন মহানবী (দঃ) এর একান্ত অকৃত্রিম অনুসারী, সুতরাং ঐ একই নীতির প্রয়োগ স্বাভাবিক।

মুসলিম খেলাফত ও সাম্যবাদ

মহান গুরুভার ও বিশাল গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েও সংসার জীবনে, সমাজ-জীবনে ও প্রশাসনে মানুষ কি করে আপন গুণে মহান হতে পারে, মহিমান্বিত হতে পারে, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনধারা তারই আলেখ্য। তাঁরা আপন কর্মগুণে আলোক-সামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন মানব সমাজে। সুতরাং এখানেও অহেতুক অলৌকিকতার মোহ বা দুর্বলতা পরিহার

করার চেষ্টা করেছি। কেননা, সাবধান বাণী এইটুকু—সত্য ও সুন্দরের পথে তাঁদের কঠিন-অর্জিত মনুষ্যত্বের দীপশিখা যেন কোন অনিশ্চিত অলৌকিকতার ঝড়-ঝাপটায় নিভন্ত হয়ে না ওঠে। সবার সম্মুখে তাঁরা দেহগতভাবে ছিলেন সাধারণ মানুষ, অন্তরে ছিলেন আদর্শ মানব।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সবসময় নিজেকে অতি সাধারণ মানুষ বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন এবং ঠিক ঐ ভাবেই দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরাও করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ"। পরবর্তীকালে তাঁর চারজন অকৃত্রিম অনুসারী খলিফাও ঠিক ঐ ভাবেই নিজেদের সমাজে তুলে ধরেছিলেন। খলিফাগণের জীবন ছিল এমনই সরল ও সহজ, কোথাও কোন দুর্বলতা ও জটিলতা নেই, অভিনয় নেই, অভিমান নেই, আড়ম্বর নেই, অহমিকা নেই, অসাম্যের চিহ্ন নেই। তাঁরা শুধুমাত্র সাম্যের প্রবক্তা ছিলেন না, বাগ্মী ছিলেন না, তাঁরা বিশাল জনসমাবেশে সাম্যের সুন্দর ভাষণ দিয়ে অসাম্যের বিরাট অট্টালিকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বৈধ-অবৈধ সম্ভোগের চরম প্রাচুর্যে দিন ও রাত্রি কাটিয়ে নিজেদেরকে নিজেই প্রবঞ্চনা করতেন না। ১৮ : ১১০।

তাঁরা ছিলেন সত্য, শান্তি ও সাম্যের আচার্য। তাই তাঁদের বলা হয়- -খোলাফায়ে রাশেদীন, অর্থাৎ সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ। আরবী খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। মহানবী (দঃ) ছিলেন এক আল্লাহর প্রতিনিধি। চাব খলিফা ছিলেন তাঁব প্রতির্নিধি ৬৩২ ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

মহানবী (দঃ) রাতের পর রাত, নিবিড় ধ্যানে, একান্ত আরাধনায় আত্মিক সাধনায় আল্লাহর নিকট হতে শক্তি সঞ্চয় করতেন এবং দিবালোকে মানুষের কল্যাণে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করতেন। 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ও [illegible] ঠিক তাঁর পূর্ণ অনুসারী। তাঁরাও বলতেন—'রাত্রিতে যে শক্তি সঞ্চয় করি, দিবালোকে তা খরচ করি।' তাঁরা আরো বলতেন, মনের জন্য যেমন প্রার্থনা আছে, দেহের জন্যও তেমনি প্রার্থনা আছে। মনের প্রার্থনা ধর্মযোগে, অর্থাৎ মন ভাল থাকে ধর্মযোগে, দেহের প্রার্থনা কর্মযোগে, অর্থাৎ দেহ ভাল থাকে কর্মযোগে। এইভাবে তাঁরা একদিকে ছিলেন ধর্মযোগী, আবার অন্যদিকে ছিলেন কর্মযোগী। তাই তাঁদের জীবনধারা ছিল আদর্শের ধারা, অনুশীলনের ধারা, মানুষ গঠনের ধারা, সমাজ গঠনের ধারা। তাঁদের ধারা শুধু জড়বাদের (Materialistic world) মতো দেহ ও ইহলোকের ধারা নয়। তাঁদেব জীবনধারা দেহ ও মনের সমন্বিত ধারা, ইহলোক ও পরলোকের সম্মিলিত ধারা, এককথায় অখণ্ড জীবনের ধারা।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারায় বিধৃত হয়েছিল সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র জাতি, যার নাম মানবজাতি। একটি মাত্র সমাজ, যার নাম মানবসমাজ। তিনি চেয়েছিলেন একটি মাত্র সরকার, যার নাম বিশ্ব-সরকার বা মানব সরকার। (বর্তমানের U.N.O. জাতিসংঘ তার

কিছুটা মাত্র।) একটিমাত্র শাসন, যার নাম বিশ্ব-শাসন বা মানব-শাসন; একটি মাত্র সভ্যতা, যার নাম বিশ্ব-সভ্যতা বা মানব-সভ্যতা; একটি মাত্র পরিবার, যার নাম বিশ্ব-পরিবার বা মানব-পরিবার। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার, যে ব্যক্তি এই পরিবারের নিকট ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক। যে তার প্রতিবেশীর চোখে ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক।" সুতরাং ভাল লোকের সংজ্ঞা তিনি কোন দেশ-পাত্র বংশ-গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যাননি।

আজ ১৪০০ বছর পর সমগ্র বিশ্ব যেন একটি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। অতএব সমগ্র বিশ্ব-মানব আজ ঐরূপ একটি একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা নিতে না পারলে, একদিন বিশ্ব-সমাজ একে অপরের অব্যর্থ আঘাতে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসকে প্রতিরোধ করার জন্যই আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বনবী এরূপ একটা চিন্তা নিয়েছিলেন—বিশ্ব-মানব, বিশ্ব-সরকার। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল—বিশ্ব সৃষ্টি, বিশ্ব-সমাজ। তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল মানবাধিকার, মানব-সমাজ। তাঁর এক হাতে ছিল বিশ্বপিতার বন্দনা, অন্য হাতে ছিল সেই এক বিশ্ব পিতার সকল সন্তানে এক ও অভিন্ন জানা এবং সকল মানুষের মানবাধিকারকে স্বীকার কবা ও সম্মান দেওয়া।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস—সেই এক মাতা ও এক পিতার ইতিহাস, সেই এক ও অভিন্ন সন্তানের ইতিহাস, মানবাধিকারের ইতিহাস, সবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পুরুষ ও রমণী সকলকে নিয়ে সাম্যভিত্তিক উন্নয়নশীল অখণ্ড মনুষ্য-সমাজের ইতিহাস।

ইসলাম ধর্ম মূলত তাই শান্তি ও সাম্যভিত্তিক, প্রতিবেশী, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সহ পরিবারভিত্তিক, উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক, দেশ পরিচালনাব জন্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রভিত্তিক, সংসার ও সমাজভিত্তিক, সংস্কার ও সভ্যতাভিত্তিক এবং বিপ্লব ও বিবর্তনভিত্তিক। ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও পবিত্র হাদিস এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণপঞ্জী। শুধু গ্রন্থ মধ্যে কাগজে-কলমেই এই সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন হতে তাঁর অকৃত্রিম খলিফাগণ 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' জীবনধারা এর প্রমাণের কোন অপেক্ষাই রাখে না। ধর্মে, শাস্ত্রে, শাসনে, প্রশাসনে, ইতিহাসে, দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনে দূর অতীত হতে সুদূর ভবিষ্যতের অখণ্ড মানুষের এবং মানুষের অখণ্ড জীবনের জন্য 'খোলাফায়ে রাশেদীন' সর্বজনগ্রাহ্য একটি আদর্শ জীবন-ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যেন সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য কতিপয় মহাজীবনের প্রবল প্রয়াসের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইতিহাস, দৃষ্টান্তের ইতিহাস, উপমার ইতিহাস, অনুশীলনের ইতিহাস, প্রতিজ্ঞার ইতিহাস, প্রজ্ঞার ইতিহাস, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস, আদর্শের ইতিহাস ও মানবাধিকারে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের ইতিহাস।

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) নিবঙ্কুশ সাম্যের ভিত্তিতে জগৎ-শান্তির যে সমাজব্যবস্থা, যে বিধিবিধান দান করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন সেই পথে পরিচালিত হলেন। মহানবী (দঃ)-এর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেওয়া পথ ও পন্থা কিছু কিছু সমাজবিরোধীদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল, তখন ইসলাম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২ ৩৪ খ্রীঃ) তরীর হাল ধরলেন। খুবই শক্ত হাতে, খুবই দক্ষতার সাথে বিপদাপন্ন উত্তাল তরঙ্গ হতে ইসলামের তরীকে তীরে আনতে সক্ষম হলেন। তাই তাঁকে Saviour of Islam বা ইসলামের ত্রাণকারী বলা হয়।

এরপর হাল ধরলেন আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪ ৪৪ খ্রীঃ)। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা রূপে শাসনে সমাজ জীবনে, সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং গঠনে ও বিচারাসনে যে অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ও কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, তা জগতের ইতিহাসে আজও দুর্লভ। তাই তাঁকে Real Builder of Islamic State বা ইসলামি রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

অতঃপর এলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪ ৫৬ খ্রীঃ)। হযরত ওসমান (রাঃ) চিরদিনই ছিলেন অতীব দয়ালু, দাতা, মহানুভব। তিনি নিজে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, পররর্তীকালে ইসলামের সেবায় সমস্ত ধন বিতরণ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে জগতের বুকে অক্ষয় ও নিখুঁত রাখার জন্য তাঁর অবদান অসামান্য। অন্যান্য সকল কাজের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন একত্রীকরণে তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা চিরস্মরণীয় বস্তু। তাই তাঁকে জা'মেয়ুল কোরআন বা কোরআন একত্রকারী বলা হয়।

এরপর এলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ বা শের ই খোদা হযরত আলী হায়দার (কঃ) (৬৫৬ ৬১ খ্রীঃ)। পৃথিবীর বীরের ইতিহাসে বহু বীর এসেছেন ও গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানব সমাজ দ্বিতীয় আলীর (কঃ) জন্ম দিতে পারেনি। তিনি শারীরিক শক্তির দিক থেকে ছিলেন মহাবীর, আবার মানুষের দিক থেকেও ছিলেন মহামানব, পৌরুষের দিক থেকে ছিলেন মহাপুরুষ, মনের দিক থেকে ছিলেন মহানুভব। দেহের বীরত্ব ও মনের মহত্ত্ব একযোগে তাঁকে এতদূর ঊর্ধ্ব জগতে নিয়ে গিয়েছিল, স্বয়ং মহানবী (সাঃ) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ ও 'জ্ঞানের দরজা' বলে ভূষিত করেন। সত্যিই তিনি ছিলেন মানব সমাজের নজিরবিহীন সিংহ পুরুষ। তার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন পবিত্র খোলাফায়ে

রাশেদীনের অক্ষত সময়কাল, মানবতার পরিপূর্ণ জীবনদীপ, সাম্যের পূর্ণ প্রতীক, শান্তির নিরঙ্কুশ বাহন চির ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল। মানব সমাজ হারাল তার সাম্যের যুগ, স্বর্ণ যুগ, আদর্শ সাম্যবাদ। ইসলামের প্রকৃত খেলাফত যুগ এখানেই সমাপ্ত হল। পরবর্তী অধ্যায় খলিফা বনাম রাজা-বাদশার যুগ। মানবকালের মধ্য-গগনে মানবতার পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সততা ও ধর্মপরায়ণতা, হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিচার ও প্রশাসনিক প্রতিভা ও যোগ্যতা, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জনহিতকর কার্য ও মহানুভবতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও মহত্ত্বকে মানব সমাজে মানুষের স্মৃতিতে ম্লান করতে পারে মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি। খলিফাগণ এই যে অলোকসাধারণ শক্তি অর্জন করেছিলেন, এর মূলে ছিল তাঁদের অদম্য চরিত্রবল। তাই তাঁদের ইতিহাস একদিকে রাজা-বাদশার ইতিহাস, অন্যদিকে ফকিরের ইতিহাস; একদিকে মানুষের ইতিহাস, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, সমৃদ্ধির ইতিহাস। সবের ঊর্ধ্বে সত্য ও সুন্দরের পথে ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁদের ইতিহাস সাম্যের ইতিহাস, শান্তির ইতিহাস। এককথায় তাঁদের ইতিহাস রাষ্ট্রের ও সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কথা স্মরণ করে সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকারের অকৃত্রিমভাবে অনুস্মরণের ইতিহাস।

সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকার

অতীতের ইতিহাস হতে, বর্তমানের অভিজ্ঞতা হতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে, ধর্মগ্রন্থ হতে ও নানা দিক হতে ভবিষ্যতের পথে একটি কথা বিশ্ব-মানবসমাজ বারবার জানতে পেরেছে—যখনই যে কোন সমাজ বা দেশ তার সাম্যের ভারসাম্য হারিয়ে, মনুষ্যত্বকে হারিয়ে পশুত্বের পরিচয় দিয়েছে, তখনই বিধাতা পুরুষ পরম করুণাবশত এক-একটি ক্ষণজন্মা পুরুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর দূতরূপে, সাম্যকে ফিরিয়ে এনে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর দূতগণের সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ দূত ছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ) (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)। কোরআন—৩ : ১৪৪, ৪ : ৭৯, ৩৩ : ২১, ৪১ : ৬, ৪৮ : ২৯, ৬১ : ৬।

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অখণ্ড মানবসমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুলের ত্রাণকারী ও দরদী বন্ধু; এবং দুর্গত মানবতার উদ্ধারকারী মহান দূত, মরুর কল্যাণে মরুদুলাল, দুর্লভ মানব জন্মে ও মানুষের চিন্তায় মহামানব, শান্তি-সাম্যে মহাসেনা, সমাজ সংস্কারের দুর্জয় সাধনায় সিদ্ধ সাধক, ক্ষমার দরবারে দয়ার সাগর, প্রেম ও ভালবাসায় পরমপুরুষ। কোরআন—৩ : ১৫৯, ৪ : ৭৯, ১৬৫, ৯ : ১২৮, ১৫ : ১০, ১৬ : ৪, ২১ : ১০৭।

তুলিতে মানব জাতি মনুষ্য সম্মানে
এক সুরে ডাক দিলে মানব সন্তানে।
দুই হাত তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ।

* * *

জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কণ্টকেতে ক্ষতবিক্ষত
তখনো নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান। —মহানবী

তবে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী (দঃ)-এর চিন্তাধারাকে তদানীন্তন বিশ্ব-সমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি অলোড়িত করেছিল, এবং যে দুটো দিকে তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ হয়েছিল, ঐ দুটো জিনিস সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত নারী সমাজ। কোরআন—২ : ১৮৭, ৩ : ১২৯, ৪ : ৩৪।

পুরুষ-রমণী সমাজপাখি মহানবীর হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল আকাশেতে উড়িবার।
যুবক-যুবতী ভেদাভেদ নাই, উন্নত পরিবার
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বারা গড়িবে এ সংসার।
এক যদি গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী। —মহানবী

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান ব্রতের মূল লক্ষ্য ছিল—সকল মানুষের মাঝে বিশ্ব স্রষ্টার বন্দনা, এবং সেই এক বিশ্ব স্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মাঝে জাতিগত-বর্ণগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় মানুষ রচিত কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করে সাম্যের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। মানবতার এই বাস্তবায়নের জন্যই কখনও উড়িয়েছিলেন ধর্মের পতাকা, কখনও বা উড়িয়েছিলেন কর্মের নিশান, কখনও বা রেখেছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রাণের সুদৃঢ় পদক্ষেপ, কখনও বা ঘোষণা করেছিলেন 'জেহাদ'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কোরআন—৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯, ১০, ৯৩ : ১০।

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।
যার লাগি নির্যাতন যত নিপীড়ন
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
দেখিবারে দেখেছিলে জগৎ স্বপন
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।

—মহানবী

মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—এই জগতে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্, এবং তাঁর সৃষ্ট-জগতে ও সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। তিনি কোন রাজতন্ত্র মেনে নেননি। কোন রাজা মানেননি। কোন জমিদার ও জোতদারকেও স্বীকার করেননি। কোন অতিরিক্ত সঞ্চয়কারীকেও বরদাস্ত করেননি। এ বিশ্বে মদিনার বুকে নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন গণতন্ত্রমুখী সমাজব্যবস্থা। যা ছিল একান্ত সাম্যভিত্তিক।

এ ধরার মালিকানা জগৎপিতার
সকল সম্পদ হতে সবকিছু তার।
শিখায়েছ মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ-সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব সেবক।
শিখাইলে মানুষের মান—মানবতার
অবাধে করিতে পার রুজি-রোজগার
অফুরন্ত সঞ্চয়ের নাহি অধিকার।
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতার।
মহানবীর গণতন্ত্র সভ্যসমাজ
শিখায়েছে মানবেরে গড়িতে সমাজ।

অক্ষত সাম্যবাদের ক্ষতবিক্ষত রূপ

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মহানবী (দঃ)-এর বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী ও মানবতার উদ্ধারকারী, চিন্তা ও কর্মধারার প্রয়োগ প্রণালীকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলেছিলেন তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন (ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ অর্থাৎ মহান সঙ্গীগণ।

এই খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল মানব সমাজে প্রথম নিরঙ্কুশ সাম্যবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি চূড়ান্ত ফল। কি করে এই সংসারের একটি মানুষ সামান্য সংসার জীবন হতে অসামান্য বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেও সাম্যের ভিত্তিতে সহজেই প্রমাণ করতে পারেন—একদিকে তিনি ফকির, অন্যদিকে তিনি সম্রাট; আবার শক্তির দিক থেকে একদিকে তিনি পার্থিব জীবনের

শক্তিধর পুরুষ ও সম্রাট, অন্যদিকে আত্মিক দিক থেকে স্বয়ং স্রষ্টার অমিত শক্তির অসীম আধার। এইখানেই, এই তাৎপর্যেই তাঁরা স্রষ্টার দূতের প্রতিনিধি, প্রতিনিধিত্বও তাঁদের সার্থক হয়েছে। তাঁদের যে জীবন, তা জাগতিক ও ঐশ্বরিক দ্বিশক্তিকে দু'হাতে ধারণ করে মানব সমাজে সাম্যের সেনারূপে মানবতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনকাল সময়কাল জগতেরও (স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ) সংসারের এই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল, সত্য পরীক্ষায় উন্নীত। সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনে-প্রশাসনে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাম্য সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোন গালভরা সংবিধানে নয়, কোন কনফারেন্স বা সেমিনারে নয়, কোন ঐতিহাসিক মঞ্চের আসনে নয়, ভাষণে নয়, তাঁদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সাম্য পেয়েছে প্রাণ সমাজ-জীবনে।

তাঁদের পবিত্র জীবন ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব ইতিহাসে, রাজ-ইতিহাসে এই অপূর্ব সমন্বয়ের সাম্যের অধ্যায়টি অলিখিত থেকে যেত। সংসারের কঠিন ধারা ও স্বর্গের সুধা কেমন করে একটি মানুষের জীবনে একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে, কি করে একটি সম্রাট ফকিরের জীবনযাপন করতে পারেন, সাম্যের প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন-প্রণালী, খেলাফতকাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, নজিরবিহীন উপমা। এই দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন মরণোত্তর অখণ্ড জীবনের ও সাম্যবাদী মানব-সমাজের এবং সভ্যতার, শাসনের-প্রশাসনের মহান রূপকার।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪) (ইসলামের ত্রাণকারী) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই মহানবী (দঃ)-এর মহান চিন্তাধারাকে সমাজ-জীবনে রূপ দিলেন। দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ) (ইসলামি রাজ্য ও শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা) ঐ চিন্তাধারাকে সযত্নে লালন করে বিশ্ব-সমাজ জীবনের সারবান বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করেছিলেন সাম্যের ভিত্তিতে ধনী-দরিদ্র, মুসলমান-অমুসলমান যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। (মহানবী (দঃ) বলেছিলেন—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার। যে এই পরিবারের নিকট ভাল মানুষ, সেই আল্লাহর নিকট ভাল মানুষ।") হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশাসনে ও দক্ষ হাতে মহানবী (দঃ)-এর এই পরিবারভিত্তিক চিন্তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ দেখতে পাই। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীও ছিলেন এই পথেরই অনুসারী।

কোন অনিবার্য কারণবশত তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৫৬) (কোরআন একত্রকারী)-এর সময় ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ফলে সমাজে কিছু কিছু ধনী, জমিদার ও জোতদারের আবির্ভাব হলে মহানবী (দঃ)-এর কয়েকজন বিশেষ সাহাবী সাম্যের জন্য সিংহবিক্রমে গর্জিয়ে ওঠেন।

মহানবী (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যের গায়ে সামান্যতম আঘাতকে তাঁরা যেন আপন শরীরের অসামান্যতম আঘাত বলে অনুভব করেছিলেন। এই সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম।

তখন (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ) সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া। সিরিয়াতে হযরত আবুজর গিফারীর (রাঃ) অসন্তোষের বহ্নি যখন বিরাট আকার ধারণ করল, তখন স্বয়ং গভর্নর প্রমাদ গুণলেন। তিনি কালবিলম্ব না করেই হযরত গিফারীকে সুকৌশলে মদিনায় খলিফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা বহু চেষ্টা করেও হযরত গিফারী (রাঃ)-কে বোঝাতে সক্ষম হননি। হযরত গিফারী (রাঃ) মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জন্য জনগণকে ডাক দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর শরীর তাঁকে আর বেশিদিন সময় দেয়নি। কিন্তু তাঁর আন্দোলন ও আহ্বান সকলের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব-সমাজবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা বেরিয়েছে, জার্মান ভাষা তাদের অন্যতম। এই পথে জার্মান পণ্ডিতগণ, রাজনীতিবিদগণ পবিত্র কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস হতেই সর্বপ্রথম কমিউনিজমের সন্ধান পান। (কোরআন-সূরা*মাউন ১০৭ : ১-৭।) এবং আবুজর গিফারী (রাঃ)-কে বিশ্বের সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট—সাম্যবাদী) বলে আখ্যায়িত করেন। জার্মানবাসীদের মনে মুসলিম ভাব ও চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অধ্যয়ন শুরু হয়। পবিত্র কোরআন হতে আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি জার্মান ভাষায় অনূদিত হল। পরবর্তীকালে (KARL MARX) কার্ল মার্কস ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডারিক এঞ্জেলস মুসলিম ইতিহাসকে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার ও উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং জার্মান পণ্ডিতগণও এই মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পরিচিতির ফলে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

সুতরাং আজ যদি মহানবীর প্রিয় উম্মত বিশ্ব মুসলমানকে ও ঋষি মহর্ষীগণের বংশধর ভারতবাসীকে বা যে কোন ধর্মের যে কোন আস্তিককে কোন নাস্তিকের নিকট সাম্যের সেবক ও শান্তির শিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে বিশ্ব মুসলমানের জন্য ও বিশ্ব-আস্তিকের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে!

---

*সূরা মাউন: (১) তুমি কি তাকে দেখেছ—যে ধর্মকে অস্বীকার করে? (২) ফলত সে ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, (৩) যে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। (৪) সুতরাং ঐ সকল নামাজ আদায়কারীদের জন্য পরিতাপ, (৫) যারা স্বীয় নামাজে (অর্থাৎ নামাজের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে) অমনোযোগী। (৬) যারা শুধু (যেন লোকচক্ষে লোক) দেখানোর জন্য (উপাসনা) করে। (৭) এবং (গৃহস্থালীর) প্রয়োজনীয় ছোটখাটো দ্রব্যাদি দ্বারা (গরিবকে) সাহায্য করতে বিরত থাকে। কোরআন ২ : ২৬১-৬৪, ৩ : ৯২, ১০৭ : ১-৭, ৯৩ : ১০।

পরবর্তীকালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ইসলামের সেই অনাবিল শান্তি ও সাম্যকে ফিরিয়ে আনতে। ইসলামের প্রথম দুই খলিফা মূলত যুদ্ধ করেছিলেন অমুসলমানদের সাথে। তখন মুসলমানদের মধ্যে কোনপ্রকার মতভেদের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হযরত আলীর জন্য চরম দুর্ভাগ্য, তাকে তাঁর আপন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তরবারি ধরতে হল। তিনি যখন খেলাফতে বসলেন, তার পূর্বেই ইসলাম জগতে বা রাষ্ট্রে দুষ্ট কায়েমী স্বার্থ বসে পড়েছে। তখন অনেকেই বড় বড় জমিদার ও জোতদার বা ধনকুবের। হযরত আলী (রাঃ) কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। বরং যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। যখন আঁতে ঘা লেগেছিল কপট মারওয়ান ও কুচক্রী মুয়াবিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণের, তখন তাঁরা হযরত আলীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁরা সকলেই জানতেন হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) চিরছায়া স্বরূপ ছিলেন। চরিত্রে ব্যক্তিত্বে ছিলেন তুলনাহীন মানুষ। তবুও তাঁরা তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য। অন্যদিকে মহাবীর মহানুভব আলী (রাঃ) তাঁদেরও সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ইসলামের শান্তি ও সাম্যের জন্য। এই যুদ্ধে হজরত আলীর পরাজয়ের প্রধানতম কারণ কোথাও তিনি অসৎ, হীন ও নীচ হতে পারেননি। যে কোন পরিবেশে, যে কোন পরিস্থিতিতে হীনতা ও নীচতা কোনদিনই মহানুভব আলীর (রাঃ)-এর একটি স্নায়ুবিহীন লোমকেও স্পর্শ করতে পারেনি। পরিশেষে তাঁর শাহাদাত বরণের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ কর্তৃক লালিত-পালিত ইসলামের প্রকৃত সাম্যবাদ সমাধিস্থ হল, এবং কপট কুচক্রী আমির মুয়াবিয়ার হাতে ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম জগতে কুখ্যাত রাজতন্ত্র জন্ম নিল।

—ওসমান গনী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

. তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

চরিত্রে হযরত আলী

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

হযরত আলী (রাঃ)

পরিশিষ্ট—১

ন্যাপরায়ণ সৎ খলিফাগণের

শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক চিত্র

পরিশিষ্ট—২

ইসলামি গণতন্ত্র

পরিশিষ্ট—৩

—ঃ—

প্রথম অধ্যায়

জন্ম বংশ ও শৈশব

পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি মানুষ জন্মগ্রহণ করছে, করেছে ও করবে। এই জনস্রোতের কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীকে ধন্য করে, আবার কিছু কিছু মানুষ পাপময় করে তোলে। একবাক্যে হযরত আলী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁদের আগমনে, যাঁদের পদস্পর্শে পৃথিবী বারে বারে ধন্য হলো, হযরত আলী তাঁদের অন্যতম। হযরত আলীর নামের সাথে কি যেন একটা জড়িয়ে গেছে। একমাত্র মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-কে বাদ দিলে সমগ্র মুসলিম জাহানে এত ভক্ত আর কারো নেই।

এই বিশ্ববিখ্যাত স্বনামধন্য মানুষটি ৬০১ খ্রীস্টাব্দে আরবের কোরেশ বংশের বিখ্যাত হাশেমী শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবু তালিব। মাতা ফাতেমা। পিতার আসল নাম ছিল আবদ মুনাফ। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল তালিব, তাই তাঁকে আবু তালিব বা তালিবের পিতা বলে অভিহিত করা হতো। এই নামেই তিনি ইতিহাসে বেশি প্রসিদ্ধ।

মহানবীর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের দশ পুত্রের মধ্যে হামজা, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ ও আব্বাস অন্যতম। আবু তালিবের পুত্র আলী এবং আব্দুল্লাহর পুত্র মহানবী। এই দিক থেকে হযরত আলী ছিলেন মহানবীর আপন চাচাতো ভাই। পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যখন মহানবীর প্রিয় দুহিতা খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমার সাথে হযরত আলীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত আলীর মাতা বিবি ফাতেমার পিতা ছিলেন আসাদ। এই আসাদ ছিলেন আব্দুল মোত্তালিবের আপন ভাই। অর্থাৎ মহানবীর দাদাজান ও আলীর নানাজান পরস্পর সহোদর ভাই ছিলেন।

অনেকে বলেন, হযরত আলী কাবাগৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁর মাতা ফাতেমা কাবা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করছিলেন, তখনই তাঁর প্রসব বেদনা ওঠায় তিনি নাকি মহানবীর কথায় কাবার ভিতরে যান এবং আলীকে প্রসব করেন। এই কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে আলী যে মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একথায় কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আলীর জননী ফাতেমা স্নেহভরে পুত্রের নাম রাখলেন আপন পিতার নামানুসারে আসাদ অর্থাৎ সিংহ। পিতা আবু তালিবের নামটি তেমন পছন্দ না হওয়ায় তিনি পুত্রের নাম রাখলেন আলী অর্থাৎ সমুন্নত। পরবর্তীকালে স্বয়ং মহানবী তাঁর দুটো নাম দিয়েছিলেন আসাদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সিংহ, এবং আবু তোরাব অর্থাৎ মাটির বাপ। প্রথম নামটি দিয়েছিলেন তাঁর সিংহবিক্রম দেখে, এবং

দ্বিতীয় নামটি দিয়েছিলেন একদিন জামাতার বাড়ি গিয়ে দেখলেন আলী বাড়িতে নেই। তখন মেয়ে ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আলী কোথায়? মেয়ে জানালেন, "এই মাত্র আমার সাথে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছেন।" মহানবী বাড়ি হতে সামান্য দূরে এসে একটি গাছতলায় লক্ষ্য করলেন আলী মাটিতে ঘুমাচ্ছেন। তখন তিনি তাঁকে 'হে আবু তোরাব' বলে সম্বোধন করেন। তখন হতে তিনি এই নামেও পরিচিত। হযরত আলীর অন্য একটিও নাম আছে 'হায়দর'। অর্থাৎ সিংহ। হযরত আলীকে অনেকেই আলী হায়দর বলে থাকেন। মায়ের দেওয়া স্নেহভরা নামের তাৎপর্য যেন হযরত আলীকে জগদ্বিখ্যাত করে তুললো। এই সঙ্গে তাঁর আরো একটি নাম আমরা লক্ষ্য করি ফতেহ্ আলী অর্থাৎ আলীর জয়। কোন স্থানে বিরোধ আরম্ভ হলে অনেকে বলে থাকেন ফতেহ্ আলী। অর্থাৎ আলীর যেন কোথাও পরাজয় নেই। আলী শব্দেরও অর্থ সমুন্নত। উন্নত আলী জীবনে কোথাও অবনত হননি। জীবনে ছিলেন উন্নত, মরণেও ছিলেন সমুন্নত। এ এক বিরল জীবন, বিরল ইতিহাস।

ইতিহাসের চাকা আবার ঘুরে গেল। মহানবী পিতাকে আপন চোখেই দেখেননি। জন্মের পূর্বেই তাঁর পরলোকগমন। শৈশবেই মাতৃবিয়োগ। অতঃপর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের আশ্রয়ে। পরে তাঁরও পরলোকগমন। তখন চাচা আবু তালিব বালক মহানবীকে আপন আশ্রয়ে নিয়ে যান। চাচা আবু তালিব সকল পুত্র অপেক্ষা বেশি স্নেহদান করেছিলেন শিশু মহানবীকে। পরবর্তী কালে মহানবীর সাথে বিবি খাদিজার বিবাহ সম্পন্ন হলে তিনি আর্থিক দিক থেকে খুবই সচ্ছল হয়ে ওঠেন। এই সময়ে আরবে দেখা দেয় মহা অভাব, দুর্ভিক্ষ। আবু তালিবের অনেক ছেলেমেয়ে, অভাব-অনটনে জর্জরিত। তখন মহানবী চাচা আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে চাচা আবু তালিবের নিকট গমন করলেন। এবং অনুমতি চাইলেন তাঁর দুটো পুত্রকে দু'জনে নেওয়ার জন্য। চাচা সানন্দে অনুমতি দিলেন। আব্বাস নিলেন পুত্র জাফরকে, মহানবী নিলেন বালক আলীকে। তখন আলীর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এইভাবে আলী সান্নিধ্য পেলেন এক ভাবী মহানবীর। এই বিরাট ও বিশাল মহীরুহের সান্নিধ্য আলীকে কত যে মহান করেছিল, কত যে মহত্ত্ব দান করেছিল, কত যে গৌরবে গৌরবান্বিত করেছিল, পরবর্তী জীবনে হযরত আলী তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন।

হযরত আলীর জীবনে পরম সৌভাগ্য, মহানবীর নবুয়তের সূচনাক্ষণে ও শুভক্ষণে আলী ছিলেন তাঁর সহচর, যদিও তিনি তখন কিশোর বালক মাত্র। আলীর বয়স যখন দশ বছর, তখন মহানবী নবুয়ত লাভ করেন। এর পূর্বে পাঁচ বছর দুই মহীয়ান ও মহীয়সীর মাঝ থেকে চরিত্র গঠনের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

মহানবীর মহান জীবন এগিয়ে যাচ্ছিল নবুয়ত প্রাপ্তির জন্য এবং আলীর মহৎ জীবন এগিয়ে যাচ্ছিল ঐ নবুয়তকে সর্বপ্রথম আলিঙ্গন করার জন্য। সবই ছিল অজানা অন্ধকারে। মহানবীর অতি নিকট পার্শ্বচর হিসাবে আলীর মত এত নিবিড় সান্নিধ্যলাভ আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি।

এই সমস্ত জানা-অজানা নানা কারণে মহান আলীর খেলাফতকে বাদ দিলেও আলীর নামের এমনই একটি মহিমা সমগ্র ইসলাম জগতকে এমনিভাবে পরিবেষ্টন করে আছে, এক স্বয়ং মহানবীকে বাদ দিলে তাঁর ধারে-কাছে আজও কেউ পৌছাতে পারেননি। ঠিক অনুরূপ ভাবেই মা খাদিজাতুল কোবরাকে বাদ দিলে খাতুনে জান্নাৎ বিবি ফাতেমার জনপ্রিয়তার পাশে দাঁড়ান এমন কে আছে. সেই খাতুনে জান্নাতের স্বামী হযরত আলী। মুসলিম সমাজে দু'টি যেন চির প্রবাদ বাক্য—ইমামদ্বয় 'হাসান হোসেন'। যাঁদের পিতা হযরত আলী। পাক পাঞ্জাতনের তিনি একজন—মহানবী, বিবি ফাতেমা, হাসান, হোসেন, আলী। বীরের প্রধান আলী, জ্ঞানের দরজা আলী। মহানবী বলেন, 'আমি জ্ঞানের শহর, আলী ওর দরজা'। অর্থাৎ বীর আলীর এক হাতে ছিল ইহজগৎ, অন্য হাতে ছিল পরজগৎ। অপূর্ব জীবন, পূর্ণ জীবন।

মহানবী, আবু তালিব ও আলী (কঃ)

৬১০ খ্রীস্টাব্দে মহানবী মহান আল্লাহর নবুয়তলাভে ধন্য হলেন, বরেণ্য হলেন। প্রথম নবুয়তের পর কিছুদিন বিরতি বা বিশ্রাম। নবুয়তের সূচনা বা শুভক্ষণ অতিক্রান্ত, মহাযোগ বা মহাক্ষণ আগতপ্রায়। মহানবী কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। হেনকালে --"হে মোদাচ্ছের (কম্বলাবৃত মহাপুরুষ), ওঠো, সতর্কবাণী প্রচার কর, এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা কর।" ৭৪ : ১ ৩।

অতঃপর মহানবী আল্লাহর বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রচার আপন বাড়িতে আপন স্ত্রীর নিকট। প্রথম মুসলমান মহানবীর জীবনসঙ্গিনী খাদিজাতুল কোবরা। দ্বিতীয় জন আপন পরিবারের বালক আলী। আলীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে সকলে একমত নন। কেউ কেউ বলেন তিনি মহানবী ও বিবি খাদিজার আরাধনা-এবাদত দেখে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন পিতাকে জিজ্ঞাসা করেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পিতার কোন আপত্তি ছিল না। তবে অধিকাংশের মতে তিনি কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই মহানবীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা বশত বালক বয়সেই আপন মতানুসারেই ইসলামকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করেছিলেন। এই ইসলাম গ্রহণ ছিল হযরত আলীর সহজাত

প্রবৃত্তি। কেননা তাঁর বালক প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল মহানবীর সহজাত প্রবৃত্তির অনুসরণে। আলীর জীবনবৃক্ষ জন্ম নিয়েছিল পিতা আবু তালিবের কোলে, শিশু বৃক্ষচারা বর্ধিত হলো মহীরুহ মহানবীর সুনিবিড় ছায়াতলে। কি পরম সৌভাগ্য !

হযরত মহম্মদ (দঃ) ও হযরত আলীর বংশমূল ও কুল

হাশিম
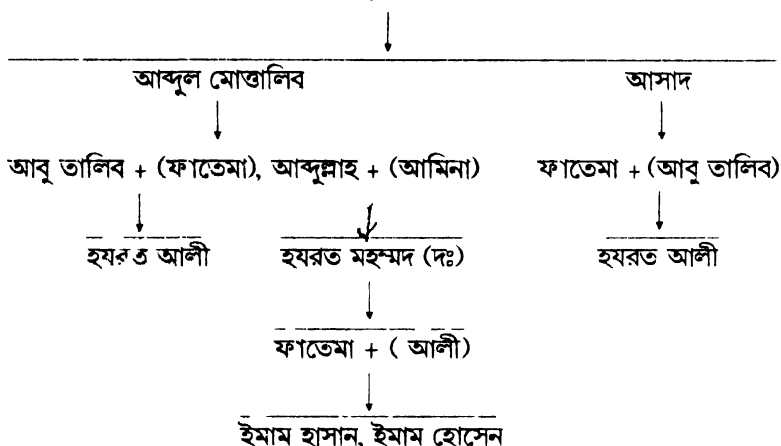
চাচাজান আবু তালিবের সাথে মহানবীর কথপোকথন সম্পর্কেও নানা জন নানা মত পোষণ করেন। কেউ বলেন মহানবীর বাড়িতে, কেউ বলেন চাচার বাড়িতে, কেউ বলেন মক্কার বাইরে নির্জন প্রান্তরে। চাচা আবু তালিব অতি স্নেহভরে ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি শুনলাম একটি ধর্ম প্রচার কবছো। তার নাম কি? উত্তরে—ইসলাম। অর্থ কি? উত্তরে—শান্তি। এটা কি কোন নতুন ধর্ম? উত্তরে—না, প্রথম হতে যত নবী এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই একটিই ধর্ম প্রচার করে গেছেন। যার নাম 'ইসলাম'। আমিও সেই একই ধর্ম প্রচার করছি। (আমরা এই আলোচনা হতে বুঝতে পারছি ধর্ম একই। তবে সময়ের ব্যবধানে তার সংশোধন ও সংস্কারের দরকার হয়ে পড়ে। কেননা সমাজ চির পরিবর্তনশীল ও বিশ্ব চির বিবর্তনশীল। এবং মহাপুরুষের আবির্ভাবের দূর হতে সুদূর ব্যবধানে ধর্মে অনেক মরচে পড়ে যায়। অনেক আগাছা গজিয়ে ওঠে। অনেক অখাদ্য খাদ্যরূপ ধারণ করে। তাই প্রয়োজন হয় মোজাদ্দাদ বা সংস্কারকের।) আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করুন। চাচা উত্তর দিলেন—'তুমি যা বলেছ সত্য। যা প্রচার করছ সত্য। কিন্তু আমি আমার দেশের প্রচলিত ধর্ম এখন ত্যাগ করতে পারছি না। আমি তোমার প্রচারিত

ধর্মগ্রহণ না করলেও, তুমি তোমার ধর্মমত প্রচার করতে থাক। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব। অতঃপর তোমার আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, অতঃপর পুত্র আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন— তুমি তোমার ভাই মহম্মদ (দঃ)-কে অনুকরণ করবে, কখনও তার সঙ্গ ছাড়া হবে না। সে যা বলবে, তাই করবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। বিদায়।

আমরা সকলেই জানি এই ঘনঘোর বিপদের দিনগুলোতে এক প্রান্তে ছিলেন মহানবী, অন্য প্রান্তে ছিল দুর্ধর্ষ কোরেশগণ এবং মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন আবু তালিব। বহু ঝড়, বহু ঝঞ্ঝা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কিন্তু মহীরুহ কোনদিকেই ঝুঁকে পড়লেন না। বিশাল শক্তিধর কোরেশগণ তাঁর জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁকে মহানবীর নিকট হতে ছিনিয়ে নেওয়ার সহস্রবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আবার অন্যদিকে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও মহানবীকে আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জেনেও তাঁর ধর্মে দীক্ষা নিলেন না। ধর্ম-অধর্মের কথা ছেড়ে দিয়ে অতি নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে আবু তালিবের ন্যায় এরূপ বিরল ব্যক্তিত্ব বিশ্ব আজও কি আর একটি জন্ম দিতে পেরেছে ! ব্যক্তিত্বে মহান আবু তালিব বিশ্বজয়ী। যাই ঘটুক, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও মহানবীর প্রতি আবু তালিবের স্নেহের এতটুকুও কমতি ছিল না, আবার আবু তালিবের প্রতিও মহানবীর শ্রদ্ধার কণামাত্রও কমেনি। এককথায় সকল কিছুকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করেছিল একের প্রতি অন্যের স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

দীর্ঘকাল কেটে গেল। প্রায় দশ বছর অতিবাহিত। নবুয়তের বাতাস আন্দোলিত, অত্যাচারের ঝড় ও আকাশে-বাতাসে আচ্ছাদিত। নবীজীবন প্রায় বিধ্বস্ত, দিশেহারা। এমন কোন অনাচার নেই, যা তখন নবীজীর ওপর চলছে না। ঠিক হেনকালে নবীজীর পিতৃতুল্য চাচা আবু তালিব ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে গেলেন। মহানবী চাচার অন্তিম শয়নে তাঁর শয্যাপার্শ্বে হাজির হলেন, সঙ্গে আলী। মহানবী বললেন — চাচাজান, আপনি একবার শুধু কলেমা পাঠ করুন, যাতে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য ফরিয়াদ করতে পারি। চাচা উত্তর দিলেন— বৎস, সুস্থ অবস্থায় যদি ইসলাম কবুল করতাম, তাহলে কোন কথাই ছিল না, তা যখন করিনি এবং আজ যদি অন্তিম শয়নে তা করি, তাহলে দশ ও দেশ বলবে — বৃদ্ধ কেবল মাত্র মৃত্যুর ভয়ে ওটা করেছে। তখন মহানবী নিরুত্তর ও নিরুপায় হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এবং বললেন — তবুও আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য দোয়া করবো, বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। এক দিকে মারাত্মক কোরেশ বাহিনী এবং অন্য প্রান্তে স্বয়ং মহানবীর 'নবুয়ত', কোনটাই এই

মহীরুহ আবু তালিবকে নড়াতে পারল না, এ কোন্ মহামানব, কোন্ বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তিত্ব, যাঁকে আজীবন মহানবী শীর্ষতম সম্মান দেখিয়েছিলেন ও শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

আলী বলেন — "আব্বার মৃত্যু সংবাদ আমি মহানবীকে দেওয়া মাত্র তিনি কেঁদে উঠলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন—"তুমি গিয়ে তাঁকে গোসল করাও, কাফন পরাও এবং দাফন করে এসো।" আমি বললাম — তিনি তো মুসলমান নন। তিনি বললেন —"যাও, তুমি তাঁকে মাটির নিচে রেখে এসো। আমি মহানবীর নির্দেশমত আব্বাকে গোসল করালাম, কাফন পরালাম এবং দাফন করে মহানবীর নিকট ফিরে এসে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন— "যাও, তুমিও গোসল করে এসো।" আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। আবু তালিবের মৃত্যুতে আলী হারালেন পিতা, মহানবী হারালেন অভিভাবক, ইসলাম হারাল শ্রেষ্ঠতম আপসহীন অদ্বিতীয় সমর্থক, পৃথিবী হারাল অদ্বিতীয় ঋজুদৃঢ় আদর্শ মানুষটিকে।

হিজরতের রাতে হযরত আলী (কঃ)

ইসলামের ইতিহাস তথা বিশ্বের ইতিহাসে মহানবীর মক্কা হতে মদীনাতে হিজরত এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই বিশ্ববিশ্রুত ঘটনাটিতে যে কয়েকজন জড়িয়ে আছেন, আলী তাঁদের অন্যতম। ঐ মহাক্ষণে ঐ রাতে মহানবীর সাথে প্রধানত তিনজনকে দেখতে পাই — হযরত আবুবকর ও তার কন্যা আসমা এবং হযরত আলী। ৬১০ খ্রীস্টাব্দ হতে ৬২২ খ্রীস্টাব্দ। প্রায় দীর্ঘ ১৩ বছর মহানবী মক্কার মাটিতে নবুয়তের প্রচারে সংগ্রাম চালালেন। অন্যদিকে কোরেশগণও প্রচণ্ড সংঘর্ষ চালালো। পরিশেষে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো, মহানবী চিন্তা করতে বাধ্য হলেন হিজরতের কথা। অন্যপক্ষে কোরেশগণও বদ্ধপরিকর হলো মহানবীকে হত্যা করতে। পরিস্থিতি এইভাবে চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করলো। আমি গ্রন্থ সূচনাতেই বলেছি, হযরত আলীর জীবন একটানা মহানবী হতে খলিফা ওসমান পর্যন্ত নানা ঘটনায় নানা প্রকারে নানা ব্যাপারে জড়িত, অতঃপর তিনি নিজেই খলিফা। সুতরাং মহানবী হতে খলিফা ওসমান পর্যন্ত ঘটনারাশিগুলোর সঙ্গে যেখানে যেখানে হযরত আলী জড়িত, সেগুলো আগেই বর্ণিত হয়েছে মহানবী হতে খলিফা ওসমান পর্যন্ত (১ম হতে ৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থাবলীতে। তাই ঐগুলোর পুনরাবৃত্তি না করে বর্ণনা হবে অতি সংক্ষিপ্ত।

ইসলামের হিজরত আরম্ভ হয়েছিল আবিসিনিয়া হতে, যা পূর্ণরূপ লাভ করলো মহানবী কর্তৃক মদীনাতে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে। মহানবী তাঁর জন্মভূমিকে অত্যন্ত

ভালবাসতেন। কোনদিনই তিনি হিজরতের কথা চিন্তাও করেননি। পরে পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাঁকে বাধ্য করেছিল চিন্তা করতে। সকলকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন আবিসিনিয়া হতে মদীনা পর্যন্ত। বলতে গেলে একাই রয়ে গেলেন মক্কাতে। মহাক্ষণ দেখার জন্য, শেষক্ষণের প্রতীক্ষায়, মহান আল্লাহর ঐশীবাণী নির্দেশের অপেক্ষায়। ততক্ষণে কোরেশগণ যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে নিয়েছে। সিদ্ধান্ত ছিল একটিই— মহানবীকে হত্যা করতে হবে। সকল স্থানে সবার মুখে একই কথা — মহানবীকে বধ করো। এমনকি বহু পুরস্কার ঘোষিত হলো।

মহানবীও অতি দ্রুততার সাথে তাঁর ছোটখাটো কাজগুলো সেরে ফেলছিলেন। না জানি কখন মহান আল্লাহর কোন নির্দেশ এসে পৌঁছায়। একদিকে কোরেশকুল অঙ্গীকারবদ্ধ মহানবীকে হত্যা করতে, অন্যদিকে মহানবীও তাদের জাল থেকে মুক্তি পেতেও সচেষ্ট। মাথার ওপরে মহান আল্লাহ্ দু'পক্ষেরই সবকিছু লক্ষ্য করছেন আবু জেহল– আবু লাহাব -- আবু সুফিয়ান শেষ বৈঠকে বসলেন। বিশিষ্ট চোদ্দ গোত্রের চোদ্দজন বীর যুবকের ওপর ভার পড়ল মহানবীর গৃহ পরিবেষ্টন করার। চোদ্দজন বীর যুবক সেই অন্ধকার রাতে চোদ্দটি উলঙ্গ তরবারি-সহ মহানবীর গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হলো। সিদ্ধান্ত ছিল– ফজরের নামাজের জন্য মহানবী বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোদ্দটি আরবীয় তরবারি একসাথে মহানবীর ওপর পড়বে। মহানবীও এটা জানতে পারলেন, বুঝতেও পারলেন। এখন অপেক্ষা শুধু মহান আল্লাহর নির্দেশের।

মহানবী অধীরচিত্তে শুনতে পেলেন আল্লাহর নির্দেশ—"আমি ওদের সামনে ও পেছনে অন্তরাল স্থাপন করেছি, এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি, ফলে ওরা দেখতে পাবে না।" সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৯। পূর্বে মহানবীর দু'পাশে দু'জন ছিলেন। বাইরে ছিলেন চাচা আবু তালিব, ঘরে ছিলেন বিবি খাদিজা। আজকে সেই স্থানে বাইরে থাকলেন আবুবকর এবং ঘরে থাকলেন আলী। এখানেই বোঝা যাচ্ছে এই দু'জনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব কত বেশি। এঁরা যেন মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি পাঞ্জা কষে দাড়িয়ে গেছেন। বিশেষ করে আলীকে রেখে গেলেন চোদ্দটি আরবীয় নেকড়ের মুখে। আজ আর কেউ নেই। সমগ্র আরব কোরেশ একদিকে, এবং অন্যদিকে একাকী নির্ভীক আলী। মহানবীর সাথে পাড়া-প্রতিবেশীর কিছু লেনদেন ছিল। যাতে কেউ কোনদিন মনে করতে না পারে যে, মহানবী লেনদেন না বুঝিয়ে দিয়ে গোপনে পালিয়ে গেছেন। যার জন্য আলীকে একাকী ঘরে রেখে গেলেন পাড়া-প্রতিবেশীর সকল কিছু দেনা-পাওনা বুঝিয়ে দিতে। আলীকে নির্দেশ দিলেন তাঁর আপন বিছানাতে শুতে এবং তাঁর আপন চাদর ব্যবহার করতে। আলী নির্দেশমত কাজ করলেন। আলীর সারা রাত কেটে গেল ঘুমিয়ে, পাহারাদাররা

সারা রাত কাটালো পাহারা দিয়ে। ভোরের বেলায় আলীকে বের হতে দেখে সবাই অবাক, কোথায় মহানবী, কোথায় শিকার, সকল শিকারী হতবাক ! আলীকে জিজ্ঞাসা করায় আলী উত্তর দিলেন–"তোমরা ছিলে সারা রাত দরজায়, আমি ছিলাম সারা রাত ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে, মহানবী কোথায় গেলেন, কিভাবে গেলেন, সে কথা তো তোমরাই আমাকে বলবে।" চোদ্দজন যুবক হতবাক! সকলেই বিস্মিত। সারা মক্কাতে খবর পড়ে গেল মহানবী নেই। সকলেরই একই জিজ্ঞাসা, কি করে গেলেন, কোথায় গেলেন। সমগ্র কোরেশবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে ছোটাছুটি করতে থাকলো। এদিকে আলী আপন কাজ শেষ করতে থাকলেন। কোরেশদের তিনদিন পর্যন্ত ছোটাছুটি চলতে থাকল, আলী তিনদিন পর্যন্ত মহানবীর নির্দেশমত আপন কাজ সমাধা করলেন। মহানবী যথাসময়ে যথাক্ষণে মদীনার পথে যাত্রা করলেন। মহানবী আবুবকরকে নিয়ে উটের পিঠে চললেন। আলী একাকী অজানা অচেনা পথে পায়ে হেঁটে মদীনার পথে পাড়ি দিলেন। প্রায় এগারো দিন পর একাকী তিনশো মাইল পথ অতিক্রম করে মদীনার নিকটবর্তী কোবাতে মহানবীর নিকট হাজির হলে মহানবী যে কি আনন্দ পেয়েছিলেন, তা বর্ণনা করার কোন ভাষা নেই।

মহানবীর অসমাপ্ত কাজ, সামাজিক দায়দায়িত্ব আলী কোন পরিবেশে, কোন পরিস্থিতিতে সমাধা করলেন, তা চিন্তা করলেও শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এই মহান দায়িত্ব মহানবী যাঁকে দিয়েছিলেন, তিনিই আলী। চোদ্দজন নেকড়ের সম্মুখে যাকে রেখে গিয়েছিলেন, তিনিই আলী। মৃত্যুর নিশ্চিত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি, তিনিই আলী।

কোবা পল্লীতে হযরত আলী (রাঃ)

মহানবী তাঁর হিজরত কালে মদীনা পৌঁছবার পূর্বে মদীনার তিন মাইল দক্ষিণে কোবা নামক পল্লীতে বারো দিনের মত অবস্থান করেন। এখানেই আলী তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। এলাকাটি ছিল পার্বত্য উপত্যকা, প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। তাই মহানবী এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে মহানবী শত্রুমুক্ত হয়ে জামাতে নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। দেখা দিল গৃহ সমস্যা। তখন মহানবী একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। সারা পৃথিবীর বুকে কোবা পল্লীই প্রথম ইসলামের মসজিদকে বুকে ধারণ করার গৌরব ও গর্ব লাভ করল। এই মসজিদ নির্মাণের প্রধান দায়িত্ব যাঁর ওপর পড়ল, তিনিই হযরত আলী। সাত দিনের মধ্যেই তিনি এই মসজিদের কাজ সম্পন্ন করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম ইসলাম জগতের প্রথম মসজিদ নির্মাণে আলীর অবদান।

এই কোবাতেই ইহুদীগণ মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐ মসজিদের কাছাকাছি আর একটি মসজিদ তৈরি করে মহানবীকে আমন্ত্রণ জানায় ওখানে নামাজ আদায় করার জন্য। মহানবীও মনস্থির করলেন সকলকে নিয়ে ওখানে একদিন নামাজ পড়ার জন্য। কিন্তু ইহুদীদের উদ্দেশ্য অসৎ থাকায় স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ মসজিদ আসলে মসজিদ নয়, সুতরাং ওখানে নামাজ পড়া চলবে না। "যারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধন, সত্য প্রত্যাখান (করার জন্য), বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি (করার জন্য), এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে, তারা তাদের গোপন ঘাঁটি স্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করেছে, তারা অবশ্য শপথ করবে, আমরা উত্তম কামনা ব্যতীত এটা করিনি। এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন – "তারা তো মিথ্যাবাদী। তোমরা কখনও ওতে (ঐ মসজিদে নামাজের জন্য) দণ্ডায়মান হয়ো না। যে মসজিদের ভিত্তি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য স্থাপিত এবং সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে দাঁড়ানই সমুচিত।" সূরা তওবা–৯ ঃ ১০৭-১০৮।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সাহাবীগণ অবগত হলেন ইহুদীগণের অপকর্ম সম্পর্কে। যখনই ইহুদীগণ এই কথা জানতে পারলো, তখন তারা আর কালবিলম্ব না করে কোবা ত্যাগ করলো প্রাণভয়ে। তখন মুসলমানগণ ঐ ঘরটিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাকে ভেঙে ফেলার জন্য। হযরত আলী এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেন। ইসলাম জগতের প্রথম মসজিদ মহানবীর নির্দেশে আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলো এবং প্রথম মসজিদে জেরার (অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ) ঐ আলী কর্তৃক চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো। তাই ইসলামের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা আলীরই অবদান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মদীনার মাটিতে মহানবী ও আলী (কঃ)

মদীনার মাটিতে পৌঁছনোর পর মহানবী সর্বপ্রথম একটি মসজিদ তৈরি করলেন। এটাই আজকের জগদ্বিখ্যাত মসজিদে নববী– অর্থাৎ নবীর মসজিদ। এই মসজিদ নির্মাণেও আলীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য অবদান। অতঃপর মহানবী মদীনার আনসার ও মক্কার মহাজেরিনদের সমস্ত উপাধি রহিত করে মুসলমান নামে অভিহিত করেন। এবং প্রতিটি মহাজেরকে এক একটি আনসারের ভাই (বা মিতে) রূপে নির্ধারিত করেন। এইভাবে সমস্ত মোহাজের এক একজন আনসারের সাথে মিলে গেলেন। এই ব্যাপারে আনসারগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তা আজও বিশ্ব ইতিহাসের ত্যাগের অধ্যায়ে দৃষ্টান্তবিহীন ঘটনা। তখনও আলী মহানবীর পরিবারভুক্ত সদস্য। আলী লক্ষ্য করলেন, সকল মোহাজেরই এক একজন আনসার পেলেন, কিন্তু তিনি কেবলমাত্র ব্যতিক্রম থেকে গেলেন। তখন তাঁর মনে নানা কথা উঠতে থাকল। তিনি থাকতে না পেরে মহানবীকে জিজ্ঞাসা করলেন –"সকলেই এক একজন আনসার ভাই পেলেন, আমার কি হবে।" তখন মহানবী মৃদু হেসে উত্তর দিলেন– "আমিই তোমার ভাই, তুমি কি এতে খুশি নও।" মহানবীর কথায় আলী চির ধন্য হলেন। এবং তাঁর পরিবারেই থেকে গেলেন। পরে অবশ্য খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমাকে বিয়ে করার পর পৃথক সংসার গড়ে তোলেন। মহানবী কোনদিনই চাননি, বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত আলী অন্য কোথাও থাক বা যাক।

বদর যুদ্ধে আলী (২য় হিজরী)

মহানবীকে মক্কা হতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্য মক্কার কোরেশগণের কোনদিনই ছিল না। মক্কার কোরেশগণ কোনদিনই মহানবীকে মিথ্যাবাদী বা অসৎ বলেনি। তারা সহ্য করতে পারেনি নবধর্ম ইসলামকে। মহানবী ছিলেন ইসলামের প্রধান প্রবক্তা। বিরোধ বেধেছিল এখানেই। সংঘর্ষ বেধেছিল এখানেই। মহানবীও মক্কার কোরেশগণকে কোনদিনই ঘৃণার চোখে দেখেননি। কেবল অপছন্দ করেছিলেন তাদের জীবনধারাকে, জীবনকে নয়। তাই মক্কা বিজয়ের দিন ঐ জীবনগুলোকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করেছিলেন। আসলে বিবাদ বেধেছিল নীতিতে-নীতিতে। একে অপরের নীতির বিনাশ চেয়েছিল। তবে মহানবীর কথা সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বিশ্বের সমস্ত পাপী-তাপীকে দেখেছিলেন সংশোধনের চোখে, স্নেহের চোখে।

পাপ রে করিয়া ঘৃণা করিও মানা
কভু না করিও যেন পাপীরে ঘৃণা।
তোমার বিশাল বুকে পাপীকে চুমি
শোধিতে সুযোগ দাও পাপীরে তুমি।
তুমি যে পবিত্র ফুল্ল প্রশস্থ হৃদয়
পাপীর পার্শ্বেতে তার হোক পরিচয়।

এই নীতি-নিধনের লড়াইয়ে মক্কার কোরেশগণ ক্ষান্ত হলো না। মহানবী মক্কা হতে বিতাড়িত হলেন, কিন্তু তিনিও তাঁর নীতি প্রচারে বিরত হলেন না। মহানবী তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন শুধুমাত্র নীতির জন্য। মদীনাতে এসে সেই নীতির জয়গান আবার ঘোষণা করলেন– আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।

মক্কার কোরেশগণ বুঝতে পারলো মহানবী মক্কা হতে বিতাড়িত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর নীতি মদীনার মাটিতে সজোরে ঘোষিত হচ্ছে। একে অঙ্কুরে বিনাশ করতে না পারলে একদিন তা আরবের মাটিকে ও মানুষকেও গ্রাস করে ফেলবে। এই আশঙ্কা বুকে নিয়ে তারা মহা প্রস্তুতি আরম্ভ করলো। দল নেতা আবু সুফিয়ানকে সকলে মিলে নগদ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিল সিরিয়া হতে নতুন নতুন অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করে মদীনার বুকে মহানবী ও তাঁর অনুচরবৃন্দকে চিরতরে ধ্বংস করতে। মহানবী তাদের পরিকল্পনাকে মূলত ব্যর্থ করে দেন।

বদর প্রান্তর মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আট মাইল দূরে অবস্থিত। হিজরীর প্রথম সন ৬২২ খ্রীস্টাব্দ, ১৭ রমজান বদর প্রান্তর কেঁপে ওঠল রণ-দামামায়। বিতাড়িত মহানবী আজ প্রধান সেনাপতির আসনে অধিষ্ঠিত। একপক্ষে এক হাজার সেনাবাহিনী, মহানবীর মাত্র ৩১৩ জন। তাও ওরা সশস্ত্র, বলতে গেলে অপরপক্ষ নিরস্ত্র। মহানবী নিজ হাতে সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করলেন। অতঃপর মনোনিবেশ করলেন গভীর প্রার্থনায়।

প্রার্থনা শেষ হলো, যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কোরেশ পক্ষে ওতবা, শোয়েবা ও অলিদ, মহানবীর পক্ষে আইয়ুব, মায়াজ ও আব্দুল্লাহ। এঁরা তিনজনেই ছিলেন মদীনাবাসী। কোরেশ পক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য ভরে ওঁদের বললো— তোমরা যাও মক্কার ঐ কাপুরুষদের পাঠাও। তখন মহানবী বীরবর হামজা, ওবায়দা ও শেরে খোদা আলীকে পাঠালেন। এককথায় এই বদর প্রান্তরে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধে শেরে খোদা আলী যে বীরের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, পৃথিবীর বীরের ইতিহাসে আজও ঐ বীরের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

একটি চির আদর্শ ও বিরল বিবাহ

খাতুনে জান্নাত (২য় হিজরী)

সমগ্র মুসলিম জাহানের নারীজগতের মাথার তাজ মা খাদিজার প্রিয়তম কনিষ্ঠা কন্যা, মহানবীর একান্ত স্নেহের দুহিতা, পরমা সুন্দরী, সর্বগুণে গুণান্বিতা, ইহলোকে ইসলাম জগতের অদ্বিতীয়া তাপসী মহিলা, পরজগতের স্বর্গলোকের সম্রাজ্ঞী খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা। মক্কার মাটিতেই বিবি ফাতেমা ভরা যৌবনে পদার্পণ করেন। মদীনা আগমনের পর বিশিষ্ট সাহাবাগণের মুখে তাঁর বিবাহের কথা নানা প্রসঙ্গে উঠতে থাকলো।

মা খাদিজা ও আবু তালিবের পরলোকগমনের পর মহানবীর মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হয়েছিল, তা বণর্নাতীত। এই অবর্ণনীয় অবস্থাতে বিবি ফাতেমা যেভাবে নবীশ্রেষ্ঠ পিতাকে সেবা-যত্ন করলেন, তাও বর্ণনাতীত। মহানবী ছিলেন নবীশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, ফাতেমা ছিলেন কন্যাশ্রেষ্ঠা, নারীশ্রেষ্ঠা। জগতে এমন কোন রমণী জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি ফাতেমার ন্যায় ইহকাল ও পরকাল দ্বি-কালকে জয় করতে পেরেছিলেন। একদিন স্বয়ং মহানবী বলেছিলেন—"ফাতেমা আমার জননীর আসনে উপবিষ্টা।" আদর্শগত দিক থেকে মহানবীর সমস্ত গুণাবলী কমবেশি বিবি ফাতেমার মধ্যেই সন্নিবেশিত হয়েছিল। এমনকি দেহগত দিক থেকেও মহানবীর শরীরের অপূর্ব সুঘ্রাণও একমাত্র বিবি ফাতেমার মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল। স্বয়ং বিবি আয়েশা বলেন—"মহানবীর ইন্তেকালের পর যখন মন একেবারেই অধীর হয়ে উঠতো, তখন ছুটে যেতাম বিবি ফাতেমার নিকট, শান্তি পেতাম শুধু তাঁকেই দেখে। এই দুনিয়াতে মহানবী বিবি ফাতেমাকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন।"

তাঁর সম্পর্কে বিবি আয়েশা আরো বলেন— "কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি। আমি যদি তোমার দেহের একটি কোষ হয়েও জন্মলাভ করতাম, তাহলেও আমার জীবন ধন্য হতো।" স্বযং মহানবীকে বাদ দিলে তাঁর উম্মতদের মধ্যে দুটি মানুষের মধ্যে ইহজগৎ ও পরজগৎ পূর্ণতা লাভ করেছিল— একজন বিবি ফাতেমা, অন্যজন মহানবীর আপন হাতে গড়া হযরত আলী। তাই বিবি ফাতেমাকে বলা হয়— 'খাতুনে জান্নাত' আর আলীকে বলা হয় 'তাসাউফের জড়'। তাসাউফ ইসলামের প্রাণ এবং শরীয়ত তার দেহ।

সকল ধর্মের প্রাণ সত্য আদি রূপ
শরীয়ত- তরিকত- মারেফাতে তাসাউফ।
যে জন অক্ষম এই তাসাউফ জ্ঞানে
ইসলামের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।

যে জন অক্ষম এই জীবন-জিজ্ঞাসায়
পড়ে না তাহার মন প্রভু-মহিমায়।

একদিন স্বয়ং আবুবকর ফাতেমার বিয়ে প্রসঙ্গে আপন অভিলাষের কথা মহানবীর নিকট ব্যক্ত করলে মহানবী তাঁকে বলেন–"আল্লাহর মর্জির অপেক্ষা কর।" এইভাবে একদিন ওমরও মহানবীর নিকট অনুরূপ আশা ব্যক্ত করলে মহানবী ঐ একই উত্তর দিলেন। অথচ চাবিদিকে বর্ষার স্রোতের মত পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে নানা প্রস্তাব আসছে। মহানবী অবিচলিত। একই উত্তর সর্বত্র। অতঃপর সকলেই বুঝতে পারলেন মহানবীর জীবনে ও পরিবারে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নেই, যা আল্লাহর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতে সমাধা হয়নি। অতঃপর বিশিষ্ট সাহাবী আবুবকর ও ওমর একত্রে বসে আলোচনা করলেন কি হতে পারে। সাধারণ মানুষ যেমন ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে বন্ধু-বান্ধব পাঁচজনের ওপর ভার দেয়, ছেলে দেখুন, মেয়ে দেখুন বলে। মহানবী এখানে তাও করছেন না। তখন তাঁরা দু'জনেই একমত হলেন একটি ব্যাপারে। বিয়েটা আলীর সাথে হতে পারে। এইটাই হয়তো মহান আল্লাহর ইচ্ছা।

অন্য একদিন আবুবকর, ওমর ও সয়িদ তিন সাহাবাই একত্রে একই আলোচনা আরম্ভ করলেন। আলোচনান্তে তাঁরা একমত হলেন–বিয়েটা আলীর সাথে হতে পারে। আবার সন্দেহও জাগলো আলীর তো কিছুই নেই। এমনকি আপন ঘরবাড়িও নেই। তাহলে কি করে মহানবীর স্বনামধন্যা কন্যা রূপবতী-গুণবতী ফাতেমার বিয়ে তাঁর সাথে হতে পারে! চিন্তার শেষ নেই, কথারও শেষ নেই, আলাপ-আলোচনারও শেষ নেই। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তও হচ্ছে না। তবুও তাঁরা আশা-নিরাশার মধ্যেই এক ধাপ এগোতে চাইলেন। তিনজনে আবার একমত হলেন আলীর নিকট যাওয়ার জন্য। এবং তাঁকে বলবেন— তিনি যেন নিজের জন্য মহানবীর নিকট ফাতেমার বিবাহ প্রস্তাব দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনজনই আলীর নিকট যাত্রা করলেন। আলী তখন তাঁর এক বন্ধুর বাগান-সেচের কাজ করছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে হাজির হলেন এবং আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বিবাহ করছেন না কেন। তিনি কেনই বা ফাতেমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন না। তখন আলী বলেন– তাঁর তো কিছুই নেই, তিনি কি করে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন, বা বিয়ে করবেন। তখন ওই তিনজন বুঝতে পারলেন আলীর আর্থিক দৈন্যতাই বিয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক। তখন তাঁরা কথা দিলেন প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য এবং তাঁকে সম্মত করলেন মহানবীর নিকট গিয়ে ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করতে। আলী সম্মত হলেন নম্র ভাষায় কম্প্র বক্ষে। যখন তাঁরা আলীকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, কোন নবীর নিকট আর্থিক সম্পদ বড় নয়, তাঁদের চোখে মানুষই বড়। একথা আলীও বিশেষভাবে জানতেন। তবুও জড়তা কাটিয়ে উঠতে

পারছিলেন না, আজ তাঁদের কথায় মনের ঐ জড়তা অপসারিত হলো। আজ আবার মহানবী সম্পর্কে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন, সুপ্ত চেতনা সর্ব শরীরে বয়ে গেল, শিহরণ জাগল শরীর ও মনে। হে মহানবী—

দেখিয়াছ ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙাগড়া
দেখোনি মানুষ, তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।
এসেছিলে মানুষেরে মনুষ্যত্ব দিতে
মানুসের যাবতীয় 'কু' কেড়ে নিতে।
ধন নয়, জন নয় মনুষ্যত্ব দিয়ে
বিদায় নিয়েছ তুমি 'কু' কেড়ে নিয়ে।

অতঃপর হযরত আলী উন্নত শিরে দাঁড়ালেন। চিন্তা করলেন মহানবী তাঁকে সারা জীবনজুড়ে কি দান করেছেন, কোন দানে আজ আলী আরববিখ্যাত, শুধু কি দৈহিক বলে, তা নয়। আজ আলীর মধ্যে মানবিক বল, মনুষ্যত্বের বল, মানবতার বল আকাশ ছুঁয়েছে। আজ আলী দরিদ্র, তবে আদর্শ মানব, আজ আলী গরিব, তবে সমগ্র আরবের গর্ব; আজ আলী গৃহহীন, তবে তামাম জাহানের গৃহ হতে স্বয়ং আল্লাহর গৃহে আজ তিনি সম্মানীয় অতিথি; আজ আলী বাহ্যিকভাবে সম্পদহীন, তবে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে অন্তরের আত্মিক ধনে করেছেন ধনবান, আজ আলী মদীনার পল্লীতে ধন-জনে অখ্যাত, কিন্তু বিশ্বের দরবারে বিখ্যাত, আজ আলী ধনীর পাশে ম্রিয়মাণ, কিন্তু বিশ্ব-মানুষের পাশে মহীয়ান, বিশ্বজগতের কাছে গরীয়ান। এই মহানবী দত্ত সুপ্ত মানসিকতা যখন তাঁর মধ্যে জেগে উঠল, তখনই তিনি মহানবীর দরবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আজ যেন নতুন আলী মহানবীর দরবারে হাজির হলেন। পাঁচ বছরের আলী আজ প্রায় পঁচিশ বছরের ধাক্কায়। দীর্ঘদিন অতি আদরের স্নেহধন্য সন্তানরূপে লালিত-পালিত। মক্কার মাটিতে কত সুখে, কত দুঃখে, কত বিপদে-আপদে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। সমস্ত কথা আজ এক সাথে তাঁর মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। তখন মহানবী কিছু সংখ্যক মানুষকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, আলী হাজির হলেন। সঙ্গে লজ্জা-শরম-সম্ভ্রম সবকিছু যেন তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য জড়িয়ে ধরলো। শেরে খোদার সেই অমিত তেজ, সেই বীরের বল, সেই সিংহ গর্জন, সেই রণাঙ্গন কাঁপানো তেজদীপ্ত প্রাণ, সব যেন কিছুক্ষণের জন্য শীতল সমীরণে পর্যবসিত হলো। মহানবীর অমিয়বাণী শুনেই যাচ্ছেন। শত চেষ্টায় প্রথম কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো না। এরই নাম সৌজন্যবোধ, শালীনতা জ্ঞান, আদব-কায়দা, আখলাক ও তাহ্‌জীব।

অতঃপর মহানবী তাঁর উপদেশবাণী শেষ করে আলীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন। আলীর জড়তা, নীরবতা, মৌনতা ও বিশেষ আচরণ যেন মহানবীকে জানিয়েই দিলো – আলীর আজ কোন বিশেষ বক্তব্য আছে। তিনি আলীকে পূর্ণ অভয় দিলেন যা কিছু মনের কথা খোলাপ্রাণে বলতে তবুও আলী যেন তাঁর জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। নম্রনেত্রে, কম্প্রবক্ষে আলী যেন আরম্ভ করলেন— "হে মহানবী, পাঁচ বছর বয়স হতে আজ পর্যন্ত যেভাবে আপনি আমাকে লালন-পালন করলেন, তার কোন শেষ নেই। শিশুকাল হতে আপনার নিকট যে স্নেহ পেয়েছি, তার কোন শেষ নেই। জগৎ-বালকের মাঝে চিরদিনের জন্য বালক-আলী ধন্য হয়েছে আপনার দেওয়া দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার পা হতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধন্য হয়েছে আপনার পথে চালিত হয়ে। আজ যদি আমি মনুষ্যত্বের গর্ব, আপনি সেই গর্বের গরীয়ান প্রতিষ্ঠাতা, আজ যদি আমি মানুষের গৌরব, আপনি সেই গৌরবের মহীয়ান নির্মাতা। আমার শরীরের স্নায়ুহীন সমস্ত লোমগুলিও কী আপনার নিকট ঋণ স্বীকারে নত নয়।

হে মহানবী, আমার মত দীন-হীন আলীর মনে বহুবার একটি কথা সাড়া দিয়েছে— ফাতেমার বিবাহ প্রসঙ্গে। উত্থাপন করতে কোনদিনই সাহস হয়নি। যেহেতু আমি দরিদ্র। আপনার দেওয়া সাহসের ভরে এইটুকুই বলতে পারি, যদি উত্থাপন করি, তাহলে এটার কোন পথ আছে। কোন সম্ভবনা থাকলে আপনি দয়া করুন।" মহানবী আলীর বিনীত প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি হয়েই বলে উঠলেন – মারহাবা আহলান – স্বাগতম।

ইসলাম জগতে যিনি যত বড়ই হোন আলীকে কেউই অতিক্রম করতে পারেননি। স্বয়ং মহানবী বলেন –"আমি জ্ঞানের শহর, আলী যার দরজা। আলী আল্লাহর সিংহ। আলী তাসাউফের জড়।" সুতরাং তিনি তাঁর কন্যা-রত্ন ফাতেমার জন্য উপযুক্ত স্বামীই নির্বাচিত করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে আলীকে গরিব মনে হয়েছিল, এখন তিনি অনন্তকালের দৃষ্টিতে কত সুউচ্চ, কত সমুন্নত, কত সুমহান। সবার উর্ধ্বে মহানবী বিবি ফাতেমার বিবাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন। তাই অনেকেই বলে থাকেন বিবি ফাতেমা ও বীর আলীর বিবাহ আল্লাহর আরশেই অনুষ্ঠিত বা উদ্‌যাপিত হয়েছিল। মহানবী সেটাকে ধরার বুকে প্রকাশ করলেন, তুলে ধরলেন। যেমন মহানবী ও জয়নাবের বিবাহ আল্লাহর আরশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোরআন ঃ সূরা আহযব– ৩৩ ঃ ৩৭।

মহানবী ছিলেন আদর্শের মহান ভাণ্ডার, চির ফলবান মহান বৃক্ষ, সুউচ্চ পর্বত, সুবিশাল সাগর। সমগ্র জীবনে কোথাও একটি বারও আদর্শের বাইরে পা দেননি। যদিও তার জন্য সবই সিদ্ধ ও শুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তবুও তিনি সবার সামনে

আদর্শকে তুলে ধরতেন। তিনি সবই জানতেন, তবুও তিনি বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আপন কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন – এই বিবাহে তাঁর মতামত কি। আদর্শ কন্যা আদর্শ পিতার প্রস্তাবকে সানন্দে গ্রহণ করলেন। মহানবী জগৎকে দেখিয়ে গেলেন – কিভাবে বিবাহযোগ্যা কন্যার বিয়ে দিতে হয়।

আদর্শে পেয়েছে আলো জগৎভূমি
মানব সমাজে নবী সূর্য তুমি।

বিবি ফাতেমার সম্মতির পেছনে কোন্ মানসিকতা কাজ করেছিল। অদৃশ্যে ও অলক্ষ্যে দুটি মানসিকতা কাজ করেছিল। প্রথমটি বিবি ফাতেমা ও হযরত আলী অতি শৈশব হতে একই পরিবারে মানুষ। উভয় উভয়কে চেনার ও জানার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। বিবি ফাতেমা আলীকে অতি নিকট হতেই লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাল্যকালে আলীকে তিনি দেখেছেন – কত গুণবান, কত ধৈর্যশীল, কত সত্যবাদী, কত সহিষ্ণু, কত সাহসী; আবার যৌবনে দেখলেন – জ্ঞানবীর, কর্মবীর, সমরে মহাবীর, বদর যুদ্ধের প্রখ্যাত বীর। আবার মহানবীর উম্মত হিসাবে দেখলেন প্রথম সারির প্রথম জন, পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকার ও প্রথম শ্রেণীর প্রবক্তা। একটি মানুষের মধ্যে তার যৌবনেই যদি এত গুণরাশির সমাবেশ দেখা যায়, তাহলে মানুষটি কত বড মাপের, তা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধিমতি ফাতেমার নিকট এ সত্য সহজেই ধরা পড়েছিল। তাই যুবক আলীকে বর হিসাবে বরণে ও মানুষ হিসাবে গ্রহণে তাঁর কোন আপত্তিই ছিল না, বরং আনন্দ ছিল।

অন্য একটি কথা থেকে যায়। আলী ছিলেন দরিদ্র মানুষ। তাঁর ধন-সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, ফাতেমা যাঁর কন্যা, সেই মহান নবী বলেন — 'আল্ ফাকরো ফাখরি' — গরিবী আমার গৌরব। দিনের পর দিন যাঁর বাড়িতে উনুন জ্বলেনি, যে নবী জীবনে একদিনও সব বেলা সমহারে আহার করেননি, একদিন যে নবীর পদতলে ধনদৌলত আছড়িয়ে পড়েছে, তিনি সন্ধ্যার পূর্বেই সমস্ত বিলি করে দিয়েছেন গরিব-দীন-দুঃখীদের মধ্যে। রাত্রি আগমনে বাড়ি ফিরেছেন খালি হাতে। বাড়িতেও কিছু নেই, ঘর শূন্য। এমনও হয়েছে এক টুকরো শুকনো খেজুরও বাড়িতে নেই। নবী মাত্র এক গ্লাস পানি খেয়ে আল্লাহর আরাধনায় রাত কাটিয়ে দিলেন। বাড়ির অন্যান্যদেরও ঐ একই অবস্থা। এই পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে যে সন্তান প্রতিপালিত, যে সন্তানের চরম মানসিকতা গড়ে উঠেছে চরম দারিদ্র্যতার মাঝে, যে সন্তানরা কবির কাব্যকে অন্তরের আরাধনায় পরিণত করতে পেরেছিলেন — 'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান', সেই দারিদ্র্যতা জয়ী, দুঃখ জয়ী, দৈন্য জয়ী, দীনতা জয়ী, বিবি ফাতেমা কি করে আজ

দারিদ্র্যতাকে ভয় করবেন। তাঁর জন্ম লগ্নতেই এ ভয়ের লেশ মাত্রই ছিল না। তিনি ধনবতী মায়ের কন্যা ছিলেন, কিন্তু ধন তো ছিল না; গুণবতী মায়ের কন্যা ছিলেন, গুণ ছিল, রূপবতী মায়ের কন্যা ছিলেন, রূপ ছিল। তাই রূপবতী ও গুণবতী ফাতেমার পক্ষে দরিদ্র আলীকে স্বামী রূপে বরণ করতে কোন সমস্যাই হয়নি। তিনি পিতাকে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন।

সারা মদীনা, সারা মক্কা, সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ল আলী ও ফাতেমার বিবাহের কথা। ইতিমধ্যে মহানবী একদিন আলীকে ডেকে পাঠালেন। এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন – বিবাহে মোহর আদায়ের মত কিছু আছে কিনা। আলী সবিনয়ে উত্তর দিলেন — 'হে নবী, আমার অবস্থা আপনার অপেক্ষা আর কেউই ভাল জানেন না। বদর যুদ্ধে গনিমত হিসাবে পেয়েছি একটি অশ্ব, আমার আছে একটি তরবারি ও একটি বর্ম। মহানবী বললেন – 'অশ্ব ও তরবারিটি তোমার খুবই দরকার, যেহেতু তুমি একজন বীর যোদ্ধা, ও দুটি থাক। কেবলমাত্র বর্মটি হলেই চলবে। এটাকে বিক্রি করে এর মূল্য নিয়ে এসো'।

অতঃপর আলী তাঁর উত্তম বর্মটিকে বিক্রি করার জন্য বহুস্থানে গেলেন। কিন্তু বিক্রি হলো না। অবশেষে হযরত ওসমানের নিকট গিয়ে বিক্রির প্রস্তাব দিলে তিনি ক্রয় করতে সম্মত হয়ে চারশো আশি দিরহামমূল্যে ক্রয় করলেন। দিরহাম মিটিয়ে দিলেন। আলী বুঝে নিলেন, ওসমান বর্ম পেলেন। আলী যখন ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন ওসমানও উঠে দাঁড়ালেন এবং উক্ত বর্মটি আলীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন — 'হে বীর, এই বর্মটি তোমার মত বীরের অঙ্গেই শোভাবর্ধন করবে, আমি তোমাকে এটা উপহার দিলাম। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার এই উপহার গ্রহণ করো। আলী বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বর্মটিকে গ্রহণ করলেন। ফিরে এলেন মহানবীর নিকট।

মহানবীকে দিরহামগুলো দিলেন, এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। মহানবী শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েই ওসমানকে প্রাণভরে দোয়া করলেন। কিছু দিরহাম আবুবকরের হাতে দিলেন বিবাহের জন্য কিছু সামগ্রী কেনার জন্য। সঙ্গে সোলেমান ও বেলালকে দিলেন। তাঁরা একটি মিশর দেশীয় শয্যা, যা উর্ণাপুঞ্জে নির্মিত, একটি চর্মময় গদি, যার ভেতরে ছিল খোর্ম বাল্কলের তন্তু ইত্যাদি। একটি খাবিরের কম্বল, কিছু মাটির জিনিসপত্র ও সিল্কের পর্দা। আবুবকর এগুলো এনে মহানবীর নিকট হাজির করলে তিনি অশ্রুসজল নয়নে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন — 'হে আল্লাহ্ মাটির জিনিসই যাদের প্রিয় সামগ্রী, তুমি তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।' অতঃপর তিনি কিছু প্রয়োজনীয় সুগন্ধি দ্রব্য কেনার জন্য কিছু দিরহামউম্মে সালমার নিকট অর্পণ করলেন। তিনি মহানবীর নির্দেশমত কিছু সুগন্ধি দ্রব্য এনে হাজির করলেন।

সামান্য বাজার করা যখন শেষ হলো, তখন মহানবী একটি শুভক্ষণ লক্ষ্য করে শুভ বিবাহ সম্পাদিত করার জন্য বিশিষ্ট মোহাজের ও আনসার সাহাবাগণকে আমন্ত্রণ জানাতে নির্দেশ দিলেন। সকলে হাজির হলে মহানবী একটি ছোট খোতবা (আল্লাহর প্রশংসা) পাঠ করলেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। শোকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদের জন্য অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত কিছুর মালিক ও সমস্ত কিছুর ওপরে। আসমান ও জমিন তাঁরই। তিনি তাঁর অপূর্ব কুদরত দ্বারা এই বিশ্বকে নানা সৃষ্টিতে সাজিয়ে তুলেছেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকুলকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, এবং মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। আবার এই মানব জাতির জন্য নবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ সকল কিছুকে তার নিয়মের অধীন করেছেন। আমি আল্লাহর নির্দেশেই ফাতেমার সাথে আলীর বিবাহ সম্পন্ন করছি। তোমরা উপস্থিত সকলেই শুনে রাখ আমি চারশো দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) মোহরের পরিবর্তে আলীর সাথে ফাতেমার বিবাহ সম্পন্ন করলাম।" অতঃপর মহানবী নব দম্পতির জন্য আল্লাহর নিকট সকলকে নিয়ে একটি ছোট মোনাজাতও করলেন। মোনাজাতান্তে উপস্থিত সকলের মধ্যে কিছু খেজুর বিলি করলেন। এইভাবে মূল বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হলো।

অতঃপর জামাই-মেয়ে মহানবীর পরিবারেই পূর্বের মত থেকে গেলেন । কেউ বলেন এক মাস, কেউ বলেন দশ মাস। পরে মহানবী আলীকে বললেন একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে। আলী অফুরন্ত চেষ্টা করেও কোন ঘর সংগ্রহ করতে না পেরে সাহাবী হারিস ইবনে নোমানের নিকট মাসিক ভাড়ার পরিবর্তে একটি ছোট বাড়ির ব্যবস্থা করলেন। এই কথা যখন মহানবীর কর্ণগোচর হলো, তখন তিনি আলীকে ডেকে সস্ত্রীক ঐ গৃহে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিনক্ষণও স্থির করে দিলেন। আলী গৃহপ্রবেশের পূর্বে মহানবীর উপদেশমত একটি সাধারণ ওলিমাখানার ব্যবস্থা করেন। এই ওলিমাতে বিশিষ্ট সাহাবী ও আত্মীয়-স্বজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দরিদ্র আলীর ওলিমাতে খাওয়া-দাওয়ার যে ব্যবস্থাপনা হয়েছিল তা একটি খেজুর, একটি রুটির কিছু অংশ, সামান্য পনির এবং যৎসামান্য সুরুয়া।

এই ওলিমা অনুষ্ঠানে মেজবান ও মেহমান উভয়পক্ষই খুবই তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। বহু গণ্যমান্য সাহাবী এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে বলেছিলেন — 'আমরা এর অপেক্ষা উত্তম ওলিমা আর দেখিনি। হযরত আলী যে কোন যুগের যে কোন রাজা-বাদশা, আমীর-উমরা ও নবাব অপেক্ষা যে উত্তম মানুষ, এতে কোন সন্দেহ নেই ; অনুরূপভাবে হযরত ফাতেমারও স্থান তাই। যদি মহানবী একটিবার ইচ্ছা করতেন বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতেন — তাঁর মেয়ে ফাতেমার বিয়েটিকে বেশ একটু

জাঁকজমক আকারে দিতে চান, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর অর্থের অভাব হতো না। তাঁর এমন উম্মতও তখন ছিল, যাঁরা একাই ওটাকে বহন করে চির ধন্য হওয়ার গৌরব অর্জন করতে চাইতেন। কিন্তু মহানবী সে পথে পা দিলেন না। বরং তিনি ঘোষণা করলেন — "ঐ বিবাহ্ আল্লাহর নিকট ততই বরকতের, যে বিবাহে যত কম খরচ হয়।" এখানে আল্লাহর রসুল তাঁর উম্মতদের কোন্ পথে অনুপ্রাণিত করলেন। মুসলিম জাহান কি একটি বারও চিন্তা করে। ইসলাম তো জীবন ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাপনাতেই মুসলিম জাহান আজ ব্যর্থ হলো। এইটাই মুসলিম জাহানের আজ দুর্ভাগ্য।

ওলিমার খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সমাপ্ত হলে মহানবী দাসী উম্মে আইমানকে বললেন – "ফাতেমাকে আলীর গৃহে পৌছিয়ে দিয়ে এসো, এবং বলো আমি আসছি।" মহানবীর নির্দেশমত দাসী ফাতেমাকে আলীর গৃহে পৌছিয়ে দিল। আলী রসুল কন্যা ফাতেমাকে নিয়ে এক সরল পবিত্র পারিবারিক জীবন আরম্ভ করলেন। মহানবী এশার নামাজের পর জামাই-মেয়েরবাড়িতে হাজির । দু'জনের মাঝখানে উপবেশন করলেন, দু'পেয়ালা পানি আনতে বললেন এবং দু'জনকেই অজু করতে বললেন। অতঃপর ঐ পানিতে ফুঁক দিয়ে দু'জনকেই খেতে বললেন।

অতঃপর ফাতেমাকে কয়েকটি কথা বললেন —

১। স্বামীর অধীনে আজ তোমার নতুন জীবন সূচিত হলো।

২। সারা জীবন স্বামীর মন জুগিয়ে চলো।

৩। তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করো।

৪। মনে রেখো স্বামীর পদতলে স্ত্রীর জান্নাত।

৫। এমন কাজ কখনও করো না, যাতে সে মনে কষ্ট পায়।

৬। তুমি নবীর কন্যা মনে করে কখনও স্বামীর সাথে অবজ্ঞাসূচক আচরণ করো না।

৭। সংসারের সমস্ত কাজ নিজ হাতে করো।

৮। স্বামী দরিদ্র বলে অযোগ্য ভেবো না।

৯। জেনে রেখো আলী জ্ঞানে গুণে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, আদর্শে, আচরণে,বীরত্বে, মহত্বে ও বংশশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার সরলতা, আপন ভোলা মন, নিরহঙ্কার চরিত্র, মধুর ব্যবহার দুর্লভ বস্তু। সে জ্ঞানে সাগরতুল্য, বীরত্বে পর্বততুল্য, তুমি তার জন্য গর্ব বোধ করতে পারো।

তারপর জামাতা আলীকে বললেন

১। তুমি চরম ভাগ্যবান। কেননা পত্নী হিসাবে সর্বাপেক্ষা উত্তম নারী খাতুনে

জান্নাতকে লাভ করলে।

২। তার যত্ন করতে ত্রুটি করো না।

৩। তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসো।

৪। তার সাথে সদাই উত্তম ব্যবহার করো।

৫। জেনে রেখো সেই পুরুষ উত্তম, যে তার স্ত্রীর দৃষ্টিতে উত্তম।

৬। তার ওপর সাধ্যাতীত কাজের চাপ দিও না।

৭। তোমরা মিলেমিশে সংসার জীবনযাপন করো।

৮। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য দোয়া করছি।

৯। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।

বিবি ফাতেমা যা নিয়ে তাঁর সংসার জীবন আরম্ভ করলেন তা বড়ই মুষ্টিমেয়। যে কয়েকটি দ্রব্য মহানবী কন্যা ফাতেমাকে বিবাহকালে যৌতুক স্বরূপ দিয়েছিলেন– কয়েকটি মাটির পাত্র, একটি মাত্র শয্যা ও একটি পর্দা। এবং জামাতা আলীকে দিয়েছিলেন – একটি মাত্র জায়নামাজ পাটি। বর্তমানে দুর্ভাগা মুসলিম সমাজ ছেলেমেয়েদের বিবাহে নবীর এই সুন্নত পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বিবাহকালে আলীর বয়স ছিল তেইশ হতে পঁচিশ বছর এবং ফাতেমার ছিল ষোল হতে কুড়ি বছর। যুগলযাত্রা আরম্ভ হলো। খাদিজার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমা স্বহস্তে স্বামীর জন্য রান্নার কাজ আরম্ভ করলেন, জাঁতা পিষতেও আরম্ভ করলেন, সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সমাধা করতে থাকলেন। কোন দাস- দাসী নেই। আলীর সে ক্ষমতাও নেই কোন দাস-দাসী রাখার। যা রোজগার ছিলো কোনরকমে দু'জনের চলে যেতো।কোনদিন কোন অতিথি এসে গেলে তাঁদেরকে প্রায় অর্ধাহারে বা অনাহারে আল্লাহর এবাদতে রাত কাটাতে হতো। এমনি ছিল তাঁদের জীবন। মহানবীর নিকট হতে তাঁরা এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন – জীবন ভোগে নয়, ত্যাগে। জীবন আত্মসচেতন নয়, আত্মবিসর্জনে। তাঁরা তাঁদের অফুরন্ত ত্যাগ দ্বারা ইসলামকে অফুরন্ত ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে আমরা অফুরন্ত ভোগের দ্বারা তাকে বিশ্ব-দরবারে সঙ্কুচিত করলাম। ভোগ কোনদিনই ইসলামের নবীর শিক্ষা নয়। ত্যাগ-তিতিক্ষা দান-দাক্ষিণ্যই তাঁর মূল শিক্ষা।

কিছু মানুষ আলী ও ফাতেমার বিবাহকে আল্লাহর আরশে উদ্‌যাপিত হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু অধিকংশের মতে আল্লাহর ইচ্ছাতে ও ইঙ্গিতেই মহানবী কর্তৃকই এই বিবাহ সমাধা হয়েছিল। আল্লাহর আরশে একটি মাত্র বিবাহ সমাধা হয়েছিল, সেটা মহানবীর সাথে জয়নাবের বিবাহ। কোরআন — ৩৩ ঃ ৩৭। এবং

এটাও হয়েছিল তদানীন্তন সামাজিক বিধিবন্ধনকে ও কু-প্রথাকে রহিত ও বাতিল করার জন্য। এখানে আলী ও ফাতেমার বিবাহে তেমন কোন কারণই ছিল না। যদি আল্লাহ্ নিজেই বিবাহ সমাধা করে দিতেন, তাহলে মহানবী আলীও ফাতেমাকে একত্রিত করতে কালবিলম্ব করতেন না। এবং আবুবকর এবং ওমরের মত সাহাবীগণকে আল্লাহর ইচ্ছার জন্য অপেক্ষা করতেও বলতেন না। কেননা আল্লাহর নির্দেশ কোরআন মারফত যখনই এসে গেছে মহানবী তাকে প্রচার ও প্রয়োগ করতে মুহূর্ত বিলম্ব করেননি। এরূপ ঘটনা বহু আছে। যেমন কেবলা পরিবর্তন, নামাজ, রোজা জাকাত ও হজের প্রবর্তন ইত্যাদি।

সুতরাং অহেতুক হযরত আলী ও ফাতেমার মর্যাদাকে বাড়ানোর জন্য অলীক ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া ঠিক না। কেননা তাঁরা এতই মহান, এতই মর্যাদাসম্পন্ন, এতই মহীয়ান, এতই গরীয়ান, এতই সৌরভময়, এতই উজ্জ্বল, এতই নির্মল কোনকালেও তাঁদেরকে কষ্ট-কল্পনা করে বাড়ানোর কোন প্রয়োজনই নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত আলীর প্রথম সন্তান

(তৃতীয় হিজরী) ৬২৪ খ্রীঃ

দ্বিতীয় হিজরীতে (৬২৩ খ্রী) বিবাহ সম্পন্ন। তৃতীয় হিজরীর ১৫ রমজান বিবি ফাতেমার কোলে এলেন প্রথম ইমাম হাসান। এই সুসংবাদ মহানবীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি আলীর ঐ গরিবখানায় হাজির হলেন। স্নেহের কন্যাবিবি ফাতেমার পুত্রকে কোলে তুলে মহানবী যে কি আনন্দ পেলেন, তা বর্ণনাতীত। সপ্তম দিনে শিশুর আকিকা সম্পন্ন হলো। মাথা মুন্ডন করা হলো, চুলের সম পরিমাণ ওজনের রৌপ্যমুদ্রা গরিব-দীন-দুঃখীদের দেওয়া হলো। অতঃপর আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন পুত্রের নাম রাখা হয়েছে কিনা। আলী উত্তরে জানালেন– নাম রাখা হয়েছে 'হরব'। মহানবী বললেন – না, ঐ নাম নয়। শিশুর নাম রাখা হ্ল 'হাসান'। অতঃপর মহানবী নবজাত শিশুর জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করলেন। পরবর্তীকালে হাসান অতি ধীর, নম্র, শান্ত প্রকৃতির মানুষের পরিচয় দেন। সংসারের ঝুট-ঝামেলা, চপলতা-চাটুকারি, ভাড়ামি-ভন্ডামী, স্বর্থপরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা ইত্যাদি তাঁর চরিত্রকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারেনি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ছলে-বলে-কৌশলে-কায়দায় ইসলামের অগত্যা মুসলমান তদানিন্তন আমির মুয়াবিয়া ও তাঁর চির কুখ্যাত পুত্র ইয়েজিদের গভীর ষড়যন্ত্রে মহানবীর স্নেহের নাতি, হযরত আলী ও বিবি ফাতেমার চোখের মণি সমগ্র মুসলিম জগতের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ইমাম হাসান আপন স্ত্রী জায়েদা কর্তৃক বিষ প্রয়োগে পরলোক গমন করেন।

ওহোদের যুদ্ধে আলী (কঃ)

(৩য় হিজরী) ৬২৪-৬২৫ খ্রীঃ

বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মক্কার কোরেশকুলকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পাগল করে তুলল। কোরেশ দল নেতা আবু সুফিয়ান তার এক বছরের ব্যবসা - বাণিজ্যের সমস্ত লভ্যাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দান করল। তার দেখাদেখি যুদ্ধ ভাণ্ডার পাহাড়ে পরিণত হলো। তিন হাজার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মহা দর্পে আবু সুফিয়ান এগিয়ে চলল। ওহোদ প্রান্তে দু'পক্ষই মুখোমুখি হলো। মুসলমানদের সাতশো মাত্র, অন্য পক্ষে তিন হাজার। যুদ্ধে আল্লাহ্‌র ফজলে হজরত আলীর বিপুল বীরত্বে

মুসলমানদেরই জয় হলো।কোরেশদের বিখ্যাত বীর তালহা তার দেহরক্ষী আপন পুত্র ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে মল্লযুদ্ধের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। ৬২০ খ্রীস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি শনিবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। উভয় পক্ষের রণহুঙ্কারে রণভূমি কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তালহা আলীর হাতে ও ওসমান হামজার হাতে বধ হলো। সারা সমরাঙ্গনে একটি কথা বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ল– 'লা ফাতাহ ইল্লা আলী – আলী ছাড়া জয় নেই।

কল্পনাতীত ভাবে তীরন্দাজগণের মহাভুলে মুসলমানদের বিজয় বিপর্যয়ে পরিণত হলো। স্বয়ং মহানবী ক্ষত-বিক্ষত হলেন। আলী তাঁকে রক্ষা করতে যে সাহস ও বীরের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার কোন ভাষা নেই। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষেই মহিলাগণ যোগদান করেছিলেন। স্বয়ং নবী দুহিতা আলীর স্ত্রী বিবি ফাতেমা এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন মহিলা গোত্রে নেত্রীরূপে।

বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে আয়েশার প্রতি অপবাদ ও আলী (কঃ)

৬২৭ খ্রীঃ

পঞ্চম হিজরীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হজরত আলী এই যুদ্ধের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বহু ধনসম্পদ ও বহু বাঁদী ও বহু দাস লাভ করেছিল। এই যুদ্ধে বনী মুস্তালিক গোত্রের প্রধান হারিসের কন্যা জারিয়াও বন্দিনী ছিলেন। উভয় গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দলনেতা হারিস মহানবীকে অনুরোধ করেন তাঁর মেয়ে জারিয়াকে বিবাহ করতে।মহানবী তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

এই যুদ্ধ হতে মদীনা ফেরার পথে বিবি আয়েশা ভোরের বেলায় হাত মুখ ধুতে গিয়ে ফিরতে দেরি হওয়ায় কাফেলা অজানা অবস্থায় তাঁকে পেছনে রেখেই যাত্রা করেন। বিবি আয়েশা নিরুপায় হয়েই পরে তত্ত্বাবধানকারী সাফওয়ান বিন মুয়াততিল-এর সাথে পরে কাফেলাতে যোগদান করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু লোক মদীনার আকাশ-পাতালকে এক করে ফেলল। মহানবী বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরামর্শ করলেন। হযরত আবুবকর এখানে নীরব রয়ে গেলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন আয়েশার পিতা।মহানবী ওমরকে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ওমর বললেন – ' এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাহিনী। বিপাকে পড়ে আয়েশাকে এভাবে আসতে হয়েছে। ওসমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে

তিনিও একই উত্তর দিলেন। আলীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। অধিকন্তু উত্তরটিকে একটি মূল্যবান কাহিনীর সাথে জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন – "হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি একদা নামাজকালে এক পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। নামাজের পরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আপনি বলেছিলেন যে "ঐ মোজাতে কিছু নোংরা লেগে ছিল। আমাকে ফেরেশতা জীবরাইল সংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে আমি খুলে ফেললাম।" এবার আপনি চিন্তা করুন যে, আপনার মোজাতে সামান্য ময়লা লেগে থাকলেও আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন না, আর আপনার জীবনের এত বড় ঘটনাতে আল্লাহ্ চুপ থাকবেন সেটা হতেই পারে না। আলীর এই অসামান্য যুক্তি ও বিশ্লেষণ মহানবীকে কেবল মাত্র মুগ্ধই করেনি, তিনি যেন এক বিশাল দুশ্চিন্তা হতে মুক্তিও পেয়েছিলেন। এইভাবে চরম ক্ষণে আলীর বুদ্ধিমত্তা কখনও সূক্ষ্মজ্ঞান, কখনও সাহসিকতা, কখনও ন্যায়বিচার, কখনও নিষ্ঠাপনা, কখনও কোমলতা, কখনও কঠোরতা, কখনও ধ্যানী আলী মহানবীকে বারবার মুগ্ধ করেছিলেন।

সর্ব দেশে সর্ব যুগে সর্ব সমাজে কিছু মজা-মারা লোকের অভাব থাকে না। তারা এ ব্যাপারটিকে রসিয়ে তুলেছিল। এমন কী কিছু কিছু আহম্মক ঐতিহাসিক মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ, ফসাদ, মতবিরোধ ইত্যাদি লাগাবার নিমিত্ত আলীর ওপর এই ব্যাপারে কিছু মিথ্যা মন্তব্য জুড়ে দেয়। তাদের কল্পিত মতে মহানবী যখন আলীকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আলী নাকি বলেছিলেন যে, "দুশ্চিন্তার কি আছে, আয়েশা ব্যতীত আর কোন নারী নেই।" অর্থাৎ মহানবী যেন তাকে তালাক দেন ও নতুন আর একটি বিয়ে করেন। আবার কেউ কেউ বলেন – আলী নীরব ছিলেন মজা দেখার জন্য। আস্তাগফেরুল্লাহ। আল্লাহ্ ওদের মাফ করুন। তাঁদের আরো মন্তব্য যে, এই কারণেই বিবি আয়েশা পরবর্তীকালে আলীর বিরুদ্ধে জামালের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই কাহিনীটি একটা কল্পনা মাত্র। তবে সম বয়স্কা বিবি আয়েশার সাথে বিবি ফাতেমার মনের মিল যে একটা খুব ছিল বলে মনে হয় না। কেননা যখনই মহানবী মা খাদিজার কথা তুলতেন কখনও প্রশংসাভরে, কখনও শ্রদ্ধার সাথে, কখনও দূর অতীতের অবিস্মরণীয় স্মৃতির ভরে, তখন আয়েশা বলে উঠতেন, আপনি এখনও ঐ বুড়িটিকে ভুলতে পারছেন না। সত্যিই মহানবী জীবনে কোনদিনই যে কয়েকজন মানুষকে ভুলতে পারেননি, মা খাদিজা ছিলেন তাদের অন্যতমা। আবার বিবি ফাতেমা ছিলেন মা খাদিজার প্রাণের কন্যা। আবার বিবি ফাতেমা যেমন মহানবীর একান্ত প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন, বিবি আয়েশা তেমনি তাঁর ছিলেন প্রিয়তমা ভার্যা। পবিত্র কোরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস হতে স্পষ্ট না হলেও কিছু অস্পষ্ট ভাবে বোঝা

যায়—কোথায় যেন এই 'দুই প্রিয়তমার' মধ্যে একটু অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। তাই বলে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো যাবে না। হযরত আলীকে এইসব ব্যাপারে টেনে আনাও যাবে না। নানা অসত্য ঘটনায় জড়িয়ে দিয়ে মহান আলীকে ছোট করার প্রচেষ্টা হবে পাগলের প্রচেষ্টা। জগৎ যেন মনে রাখে হযরত আলী কেবলমাত্র মহানবীর দেহ রক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন পরামর্শদাতাও। তাই তিনি জ্ঞানের দরজা।

জগৎ জ্ঞানীর মহান সভায়—
তোমারই করি গর্ব হে
মুসলিম আজিও জ্ঞানের রাজা—
মুসলিম নহে খর্ব হে।

আহ্‌যাব বা পরিখার যুদ্ধে হযরত আলী (কঃ)
(৫ম হিজরী, ৬২৭ খ্রীঃ)

পঞ্চম হিজরীর জুলকদ মাসে আবু সুফিয়ান আবার নেচে ওঠলো মদীনা ধূলিসাৎ করার জন্য। একত্রিত করলো আরবের বহু গোত্র ও গোষ্ঠীকে। তাই এ যুদ্ধের নাম আহ্‌যাব অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ দল। মহানবী মদীনাকে রক্ষার্থে মদীনার দক্ষিণদিকে খাল খনন করেছিলেন, তাই এই যুদ্ধকে পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কোরআনে একটি সূরাও অবতীর্ণ হয়। যার নাম 'আহ্‌যাব'। ৩৩ ঃ ১০-১৫।

মহানবী মাত্র তিন হাজারের মত সৈন্য নিয়ে কোরেশদের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করলেন। ঐ সামান্য সৈন্য হতে হাজার খানেকের মত নগর পাহারায় নিযুক্ত করলেন। বাকি পরিখা পাহারায় নিযুক্ত করলেন। পরিখা পাহারা দলের প্রধান ছিলেন স্বয়ং আলী। কোরেশ বাহিনী সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে থাকলো পরিখা অতিক্রমের জন্য। একটি সরু রাস্তা পাওয়া গেল। রাস্তা ধরে সে যুগের আরব-বীর দুর্ধর্ষ আমর অশ্বযোগে পরিখা পার হলো। এবং বারবার রণ-হুঙ্কার দিতে থাকলো। এবার আলী প্রতি-উত্তর দেওয়ার জন্য মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী অপেক্ষা করতে বললেন। কেননা মহানবী জানতেন আমরের বীরত্ব কতখানি, কত ব্যাপক। ওদিকে আমরের হুঙ্কার চলতেই থাকলো। আলী আবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী একই উত্তর দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আলী আবার আমরের দর্পে-অহঙ্কারে, রণ-হুঙ্কারে অস্থির হয়েই মহানবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি এবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কোন মুসলিম বীরই মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করেননি। এটাও হয়তো মহানবী লক্ষ্য করলেন—আর কেউ আমরের মোকাবিলা করার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করে কিনা দেখি, কিন্তু বারবার

এক আলী ব্যতীত আর কেউ এগিয়ে আসেননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলী রণাঙ্গনে হাজির হলেন। তখন আমর অশ্বের ওপর আলীকে দেখা মাত্র ব্যঙ্গভরে বলল – ভাইপো তুমি কেন তুমি তো ছেলেমানুষ, আমি তোমার সাথে লড়তে চাই না। অন্য কোন বিখ্যাত বীরকে পাঠাও। আলী উত্তর দিলেন— হে আল্লাহর দুষমন, আমিই তোমার সাথে লড়তে চাই। ঘোড়া হতে নামো। আরববিখ্যাত বীর আমর ঘোড়া হতে দর্পভরে অবতরণ করলো। ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হলো। দু'দিকের তামাম বাহিনী অধীর আগ্রহে অবিচল নেত্রে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করতে থাকল। দীনের নবী যখন মহান আল্লার দরবারে প্রার্থনায় নিমগ্ন। নবী দুহিতা বিবি ফাতেমা যখন সজল নয়নে আল্লাহর দরবারে বিজয় প্রার্থনা করছেন। মুসলিম কুলরবি শেরেখোদা হযরত আলী তখন দুর্বার গতিতে কোন এক দুর্জয়কে, দুর্লঙঘনীয়কে জয় করার নিমিত্ত নিখিল স্রষ্টার নামে শপথ নিয়ে আল্লাহর দুষমনকে চিরতরে শেষ করার জন্য আমরের নিকট স্বয়ং অজরাইলের রূপ ধারণ করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহানবীর কর্ণগোচর হলো, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত কবে তক্‌বির ধ্বনি— 'আল্লাহু আকবার। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রব উঠে গেল–'লা ফাতাহ্ ইল্লা আলী'। মহানবী বুঝতে পারলেন আমর খতম হয়ে গেছে। বিজয়ী বীর আলী আল্লাহর নামে হায়দারী হাঁকে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুলে মহানবীব নিকট হাজির হলে মহানবী তাঁকে যে বিরোচিত সম্মানে ভূষিত করলেন, তাও ছিল জগৎ বীরের দুর্লভ্য প্রাপ্তি।

আলী কর্তৃক আমর নিধন হওয়ার পর কোরেশ বাহিনীর মল্লযুদ্ধের সাধ মিটল, মদীনা প্রবেশের পিপাসা মিটল, পরিখা অতিক্রমের আশা মিটল। সর্বোপরি কোরেশ-প্রধান আবু সুফিয়ানের সংজ্ঞা ফিরে গেলো। মহাবীর আলী শুধু বীর আমরকেই হত্যা করলেন না, হত্যা করলেন আবু সুফিয়ানের বিশাল বাইশ হাজাব বাহিনীর মনোবলকে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন আবু সুফিয়ানের দর্প ও অহঙ্কারকে। সমগ্র আরব যেন বুঝতে শিখলো আলী যেন কোন অদৃশ্য শক্তি, সত্যিই 'আসাদুল্লাহ'।

মহানবী বলেন ঃ —"আলী কর্তৃক আমর বধ তামাম জ্বিন ও মানুষেব এবাদত অপেক্ষা উত্তম কাজ"। যুদ্ধ চলাকালীন মহানবী বলেন—"আলী পূর্ণ ইমানদার পূর্ণ কাফেরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে। আমরের ভগ্নি বলেন—"আলী কর্তৃক বধ হওয়াটাই একটা গৌরবের কাজ।" কথায় বলে— হিম্মতে আল্লহ্ সহায়। হযরত আলীর হিম্মতে আল্লাহও সহায় হলেন। ৩৩ ঃ ১০-১৫। নেমে এল প্রাকৃতিক ভীষণ দুর্যোগ! নূহের প্লাবন, এ যেন মরুঝড়। দুর্যোগ ছিল এ দুয়েরই মিলিত তাণ্ডব।

বানু কুরাইজা ও হযরত আলী (কঃ)

ইতিমধ্যেই বানু নাজির ও বানু কাইনুকা আপন আপন দুষ্কর্মের জন্য মদীনা হতে বিতাড়িত হযেছে। এবার বানু কুরাইজাদের পালা। বানু কুরাইজারা মহানবীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সেই চুক্তিবলে তারা মদীনাতে থাকার অধিকারী ছিল। কিন্তু হতভাগ্য কুরাইজাগণ পরিখার যুদ্ধে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিল। যখন আবু সুফিয়ান সদলবলে মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত, তখন মহানবী তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন চুক্তির কথা। কিন্তু তারা অন্য পথ ধরল। মুসলমানগণ এই সময়ে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হলেন। কুরাইজাগণ নিশ্চিন্ত রূপে ভেবেছিল কোরাইশগণ এবার মদীনার মুসলামানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাবে। তারা সেই শুভক্ষণের অপেক্ষা করে আনন্দে মুসলমানদের কথা উপভোগ করছিল। নিরুপায় মহানবী আপন সামান্য সংখ্যক লোকদের নিয়েই আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হলেন।

অতঃপর মহানবী কালবিলম্ব না করে বানু কুরাইজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার নির্দেশ দিলেন। এই অভিযানের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শেরে খোদা হযরত আলী। সিংহবিক্রমে আলী হাজির হলেন কুরাইজাদের দ্বারপ্রান্তে। তখন কুরাইজাগণ হতবিহ্বল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তখন তাদের সম্মুখে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় পথ আর ছিল না। তারা মহানবীর নিকট আত্মসমর্পণ করল। এবং প্রার্থনা কবল তাদের বিচার হোক তাদেরই একজনের দ্বারা। মহানবী তাই করলেন। এইভাবে সায়াদ বিন মায়াজেরই বিচারে মদীনা চিরতরে ইহুদীমুক্ত হলো।

বনি সায়াদ ও হযরত আলী (কঃ)
(৬২৮খ্রীঃ)

ষষ্ঠ হিজরী শাবান মাস, মহানবীর কানে পৌঁছিল বনি সায়াদ গোত্রের লোকেরা গোপনে খায়বরের ইহুদীদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। যে কোন সময়, যে কোন স্থানে মুসলমানদের আক্রমণ করতে পারে। মহানবী এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই হযরত আলীকে একশজন সাহাবী-সহ পাঠালেন। আলী পথিমধ্যে জানতে পারলেন তাঁদের অধিকাংশ লড়াকু বীর ফদক নামক স্থানে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। আলী সোজা ফদকে হাজির হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন। সায়াদ গোত্রের মানুষও ছাড়ার লোক ছিল না। তারাও ভীষণভাবে লড়ে গেল। কিন্তু মহাবীর আলীর ধোপে কেউই টিকতে পারলো না। অবশেষে রণাঙ্গন ত্যাগ করল। পড়ে থাকল তাদেব নানা উপকরণ, জীব-জন্তুগুলো।

মহাবীর আলী যত পারলেন সঙ্গে নিলেন। বিশেষ করে দু'হাজার ছাগল ও পাঁচশো উট লাভ করলেন। মসহুর নেতা হিসাবে বীর আলীর প্রাপ্য ছিল সিংহভাগ, কিন্তু তিনি অতি সাধারণ সেনার মত অংশ নিলেন, যদিও মহান আলী গরিব মানুষ ছিলেন। এখানেই আলীর সাথে অন্যান্যদের দুস্তর ব্যবধান। আলী দেহ-মনে দু'দিক দিয়েই ছিলেন মহাবীর।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও হযরত আলী (কঃ)

ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধির মত ঘটনা খুবই কম আছে। এই সন্ধির মাহাত্ম্য বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। এই সন্ধির কথা বা প্রসঙ্গ পবিত্র কোরআনেও স্থান পেয়েছে। ৪৮ ঃ ১। এ সন্ধিপত্রের লেখক ছিলেন হযরত আলী। বহু বাদানুবাদের পর সন্ধিটি লেখা হলো। লেখার পর কোরেশ পক্ষের সোহায়েল - 'আল্লাহর রসুল মহম্মদ কথায় আপত্তি তুলল। তার কথা – 'আল্লাহর রসুল' শব্দটা মেনে নিলে তো সব ঝামেলা মিটেই গেল। আমরা ওটা মানব না। ওখানে লেখা হোক আব্দুল্লাহর পুত্র মহম্মদ। তখন মহানবী বললেন দুটোই সত্য। মহানবী লেখক আলীকে নির্দেশ দিলেন ওটা কেটে দিতে। কিন্তু আলী বললেন – তাঁর পক্ষে ও-কাজ সম্ভব নয়। তখন মহানবী বললেন – 'তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি কেটে দিচ্ছি। তখন আলী দেখিয়ে দিলেন, মহানবী ঐ স্থানটি কেটে দিলেন। অতঃপর সন্ধিপত্র লেখা সমাপ্ত হলো। যতদিন ইসলাম আছে, ততদিন হুদাইবিয়ার কথা চলতে থাকবে। বিস্তারিত মহানবী গ্রন্থ (দ্রঃ)।

খায়বর বিজয় ও হযরত আলী (কঃ)
(৬২৯ খ্রীঃ)

ইহুদীগণ আপন কর্মদোষে একে একে বিতাড়িত হয়ে খায়বর নামক স্থানে একত্রিত হয়। এখানে সাতটি দুর্গ ছিল – সুলালিম, ওয়াতি, নায়াত, নায়িম, সাদ, কামুস, জুবাইর। সপ্তম হিজরীতে মহানবী খায়বর অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি যখন হুদাইবিয়া প্রান্তরে কোরেশদের সাথে খুবই ব্যস্ত, তখনই খায়বরের ইহুদীগণ মহানবী বিপদ গ্রস্ত ভেবে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহানবী মদীনায় এসে ক্ষণকাল বিশ্রাম না করেই খায়বর অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলেন। এবং খায়বরের নিকটস্থ রজি নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। প্রথম দিন হযরত আবুবকরকে নেতা রূপে পাঠালেন, কোন ফল হলো না। দ্বিতীয় দিন ওমরকে পাঠালেন, তৃতীয় দিনেও ওমরকে পাঠালেন, কিন্তু জয় পরাজয় সূচিত হলো না। তখন আলী মারাত্মক ভাবে চোখের অসুখে অসুস্থ। মহানবী ঘোষণা করলেন – আগামী দিন এমন একজনকে পাঠাবো, যে আল্লাহর ফজলে জয়ী হবে।

মহানবী আলীকে ডাক দিলেন। সাহাবী সালাম বিন আকাবা আলীর হাত ধরে মহানবীর নিকট হাজির করলেন। মহানবী আপন মুখের লালা আলীর চোখে লাগিয়ে দেওয়া মাত্র তিনি যথেষ্ট আরামবোধ করলেন। মহানবী আলীর হাতে দিলেন 'জুলফিক্কার' নামক বিখ্যাত তরবারি। এবং বললেন যাও আল্লাহর ফজলে দুর্গ জয় করো। আলী জিজ্ঞাসা করলেন - আমি কি ওদের মুসলমান বানাবো। মহানবী বলেন - না। তুমি ওদের ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের দিকে আহ্বান করবে, আকর্ষণ করবে।

আলী যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হওয়া মাত্রই ইহুদী দলনেতা হারেস মল্লযুদ্ধে হাজির হলো। দ্বৈরথ যুদ্ধে হারেস প্রথম আক্রমণ করলে আলী প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইহুদী-বীর বধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার ভ্রাতা মহাবীর মারহাব মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ শুরু করলো। যেন রণভূমি থরথর বেগে কেঁপে উঠল। এ যেন যুদ্ধ নয়, ভূমিকম্প। মহাবীর আলী কিছুক্ষণের মধ্যে ভূমিকম্প থামিয়ে দিলেন মারহাবকে ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে। এইভাবে একের পর এক সাতজন ইহুদী-বীর একা আলীর সাথে লড়ে প্রাণ হারালো। তখন আর কোন ইহুদী-বীর আর একাকী যুদ্ধ নামার সাহস পেলো না।

আরম্ভ হলো উভয়পক্ষের সমবেত যুদ্ধ। আলী যেভাবে যুদ্ধ করছিলেন তা দেখে মনে হয়নি কোন মানব সন্তান কোন দানবের সাথে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি, ক্ষিপ্রতা-তীব্রতা সমস্ত কিছুই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল। হযরত আলী ঐ মহাগতিতে ছিলেন মহাবেগবান। তিনি যেন সাগরগামিনী খরস্রোত নদীর ন্যায় সকল বাধা-বিপত্তি ও শত বন্ধনকে অবলীলায় অতিক্রম করে সাগরাভিমুখে ছুটছিলেন বেগবান গতিতে। হঠাৎ হাতের ঢালটি ভেঙে খানখান হয়ে যায়। তখনই হাতের কাছে কামুস দুর্গের একটি লৌহ কপাটকে হাতে তুলে নিয়ে ঢালরূপে ব্যবহার করতে থাকেন। সন্ধ্যার আগেই খায়বর বিজয় হলো। তিনি ফেরার পথে ঐ ঢালটিকে ওখানেই ফেলে দেন। পরবর্তী সময়ে ঐ ঢালটিকে যেটি তিনি বাঁ-হাতে ধরে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন সারাদিন, সেইটিকে আবার তুলে তার পূর্ব স্থানে বসাতে বাহাত্তর জন বীরের প্রয়োজন হয়েছিল। এখানেই পরিমাপ করা যায় হযরত আলী কত বড় ও কোন মাপের বীর ছিলেন। খায়বর বিজয়ের পর স্বয়ং মহানবী আলীকে 'আল্লাহর সিংহ' (আসাদুল্লাহ)উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই যুদ্ধে হযরত হারুনের বংশধর বিবি সাফিয়া বন্দী হন, যিনি পরে মুসলমান হয়ে মহানবীর পত্নিত্বের গৌরব লাভ করেন। (বিস্তারিত মহানবী দ্রঃ)

মক্কা বিজয় ও হযরত আলী (কঃ)
(৬৩০ খ্রীঃ)

অষ্টম হিজরী। মক্কার কোরেশগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির কালি শুকনোর পূর্বেই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করলো। মহানবী তৈরি হলেন উত্তর দিতে। তাঁর এই প্রস্তুতির কথা হাতীব নামক এক সাহাবী মক্কায় ফেলে আসা স্নেহের ছেলেমেয়েদের তাগিদে মক্কার কোরেশদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য গোপনে এক ক্রীতদাসীকে মক্কায় পাঠিয়ে দিল। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এই গোপন চিঠির কথা জানিয়ে দিলে মহানবী সঙ্গে সঙ্গে আলীকে ডাক দিলেন। এবং নির্দেশ দিলেন পথিমধ্যেই ঐ ক্রীতদাসীকে ধরে ঐ পত্র উদ্ধার করে আনো। সঙ্গে দিলেন অন্য দুই সাহাবীকে জুবাইর ও মিকদাদ। মহানবী আলীকে একথাও জানিয়ে দিলেন - তোমরা তাকে পথিমধ্যে 'খাখ' নামক বাগিচায় বিশ্রামরতা অবস্থায় পাবে। তবে রাগবশত তাকে প্রহার করো না। পত্রটি কেবল উদ্ধার করবে। এখানেই মহানবী দয়ার দূত।

আলী পত্রটি উদ্ধার করে সোজাসুজি ছুটে সদলবলে মহানবীর নিকট হাজির হলে মহানবী হাতিবকে ডাক করালেন। হাতিব অকৃত্রিম অন্তরের ভাষায় মহানবীকে সব সত্য কথা বলায় মহানবী তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু কড়া মেজাজি ওমর তাকে হত্যা করার জন্য বারবার বলতে থাকলে মহানবী বলেন— হাতিব বদর যুদ্ধের মুজাহিদ। তখন ওমর ক্ষান্ত হলেন। ২১ ঃ ১০৭।

মহানবীর দশ হাজার মুসলিম সেনার পতাকা ছিল সাদ বিন এবাদার হাতে। সাদ বারবার ঘোষণা করছিলেন-"আজ ভীষণ যুদ্ধ, আজ হরম শরীফে রক্তপাত অসঙ্গত হবে না।" একথা মহানবীর কর্ণগোচর হলে মহানবী আলীকে নির্দেশ দিলেন সাদের নিকট হতে পতাকা নিয়ে মক্কা নগরে প্রবেশ করতে। আলী মহানবীর নির্দেশিত কোদা নামক স্থানের ওপর দিয়ে মক্কায় প্রবেশ কবলেন। বাকি সকলেই সদলবলে মক্কাতে প্রবেশ করলেন। মহানবী কাবাগৃহে প্রবেশ করে আপন হাতে সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেললেন। বাকি থাকল একটি মাত্র। সেটি ছিল লৌহনির্মিত এক উচ্চ বেদীর ওপর তাম্র মূর্তি। মহানবী আলীকে তাঁর কাঁধে উঠে ঐ মূর্তিটি ভাঙার নির্দেশ দিলে আলী সেই ভাবে তাঁর কাঁধে চেপে মূর্তিটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

বীর খালিদ বিন জাযিমা গোত্রের কিছু মানুষকে বিদ্রোহ করার জন্য হত্যা করলে মহানবী আলীকে পাঠান তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে শান্ত করতে। আলী মহানবীর নির্দেশমত সেই কাজ সমাধা করলেন। আলী শুধু বীর ছিলেন না, বিজ্ঞও ছিলেন, আলী শুধু বীর ছিলেন না, ধীরও ছিলেন, আলী শুধু বীর ছিলেন না, উদারও ছিলেন, আলী শুধু বীর ছিলেন না, ক্ষমাশীল-দয়াবানও ছিলেন, আলী শুধু বীর ছিলেন না, অমায়িকও ছিলেন। এই বীর জগতের ইতিহাসে বিরল, তুলনাহীন (বিস্তারিত মহানবী দ্রঃ)।

হোনায়েনের যুদ্ধ ও তায়েফ জয়ে আলী (কঃ)

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে হোনায়েনের অবস্থান এখানে বাস করত দুর্ধর্ষ হাওয়াজিন ও শকীফ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা। ওদের কাছাকাছি বসবাস করত বনি সায়াদ গোত্র। মা হালিমা এই গোত্রের গরিব ভদ্রমহিলা ছিলেন। এখানকার লোকগুলো যুদ্ধবিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিলো। তাদের একটা অহঙ্কারও ছিল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী যখন শান্তভাবে আপন মনে সদলবলে মদীনা ফেরার জন্য প্রস্তুত, তখনই ওদের আশঙ্কা হলো। তারা অহেতুকভাবে চিন্তা করতে থাকলো — হয়তো মহানবী এবার আমাদের আক্রমণ করবেন। তাঁর মদীনা যাত্রাকে তারা ভুল ভেবে নিজেরাই মহানবীকে আক্রমণ করার জন্য পথে পা দিল। এ সংবাদ মহানবীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি তাঁর গতি হোনাযেনের দিকে ফেরালেন। হোনায়েনের যুদ্ধে প্রথম দিকে বিরোধী পক্ষের তীব্র তীরের আক্রমণে মুসলমানগণ একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পডেছিলেন। হেনকালে আলী যে ভূমিকা পালন কবেছিলেন তা শুধু একজন বীরের ভূমিকাই নয়, মনে হয়েছিল তখন একটি মানুষ সাহসে-শক্তিতে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, জ্ঞানে-গরিমায়, ভক্তিতে-ভালবাসায় যেন ফেরেশতার রূপ ধারণ করেছিলেন, হোনায়েন যুদ্ধ ও তায়েফ জয়েও আলী চিব অমর।

তাবুক অভিযানকালে মদীনার রক্ষণাবেক্ষণে আলী (কঃ)
(৬৩১ খ্রীঃ)

মুতা যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের গ্লানি রোম সম্রাট কোনদিনই ভুলতে পারেননি। তিনি আরবদের একেবারেই শেষ করার জন্য বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। মহানবীও এই কথা জানতে পেরে আপন প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কোনদিনই মহানবীর কোন বাঁধাধরা সেনাবাহিনী ছিল না, কোন কোষাগারও ছিল না। যখন যেটির প্রয়োজন হতো মুসলমানদের বলতেন। তাঁরা তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। তাবুক অভিযানকালেও ঐভাবে প্রস্তুত হলেন। অভিযান কালে আলীকে ডাকলেন — 'তুমি মদীনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখানে থেকে যাও। কেননা আমি অভিযানের সাথেই থাকছি। প্রথমদিকে বীর আলী একটু ক্ষুন্ন হলেন। অতঃপর মহানবী যখন আলীকে বললেন— তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নবী মুসার সাথে হারুনের মত। তখন আলী সন্তুষ্ট হলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি — মহানবী আলীকে কত উচ্চে স্থান দিতেন।

মহানবীর বিশেষ দূত রূপে আলী (কঃ)
(৬৩১ খ্রীঃ)

নবম হিজরী। ইসলামের পূর্বেও মক্কাতে হজ প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু সেটা অনৈসলামিক ভাবে অনুষ্ঠিত হতো। মহানবী আবুবকরকে নির্দেশ দিলেন— মক্কাতে গিয়ে ইসলামের বিধিমত সকলকে হজ শিক্ষা দিতে। তাঁর নির্দেশমত আবুবকর তিনশো হজযাত্রী-সহ মক্কা গমন করলেন। এই দলে ছিলেন— বিশিষ্ট সাহাবা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং আবু হোরাইরা প্রমুখ।

তাদের যাত্রার পর কোরআন শরীফের একটি নতুন সূরা অবতীর্ণ হলো— সূরা বারায়াত (তওবা)। ওতে হজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু নির্দেশবলী ছিল। কিছু সাহাবা মহানবীকে অনুরোধ করলেন— এই নবাগত সূরাটি আবুবকরের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো। মহানবী বললেন — না। পাঠিয়ে দিলেই শুধু চলবে না। এমন একজন মানুষকে পাঠাতে হবে, যে এ-বিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি। সে নিজেই সকলকে শোনাবে। অতঃপর মহানবী একটি নির্দেশনামা লেখালেন। এবং আলীকে ডাক দিলেন ও বললেন — তুমি আবুবকরেব পশ্চাদ্‌গামী হও। এবং হজের দিন সকলকে এই সূরা (তওবা) পাঠ করে শোনাবে। ও আমার দেওয়া নির্দেশটিও ঘোষণা করবে।

অতঃপর আলী মহানবীর আজবা নামক দ্রুতগামী উটেব ওপর আরোহণ কবে 'আজু' নামক স্থানে আবুবকরের সাথে মিলিত হলেন। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হলো। মক্কায় পৌছিয়ে সকলে হজ আদায় করলেন। আবুবকরের হজেব নিয়ম-কানুন বিস্তারিত ভাবে সকলকেই বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর একটি ভাষণও দিলেন। সবশেষে আলী দাঁড়ালেন এবং সকলকে সূরা 'তওবা' পড়ে শোনালেন। তারপর ঐ নির্দেশটি ঘোষণা করলেন—

১। পৌত্তলিকগণ কাবায় আর হজ করতে পারবেন না।

২। উলঙ্গ অবস্থায় কাবা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা চলবে না।

৩। বিধর্মীগণ চার মাসের মধ্যে আপন আপন স্থানে গমন করবে। অতঃপর মুসলমানদের সাথে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৪। মুসলমানদের (ঈমান-সহ) স্বর্গ প্রবেশ অবধারিত।

এখানে আমরা বুঝতে পারছি — আলী মহানবীর অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। কেবল মাত্র সমরেই নয়, সে আস্থা ছিল— সংসারের নানা ব্যাপারে, জীবনের নানা প্রাঙ্গণে। মহানবীর জীবনের সর্ব অধ্যায়েই আলীকে আমরা একান্ত জন, আপন জন ও সুযোগ্য জন হিসাবে পেলাম।

ইসলামের প্রচারে আলী (কঃ)
(৬৩২ খ্রীঃ)

হযরত আলী যেমন অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি অতুলনীয় বাগ্মীও ছিলেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর ছিলেন। অভাবনীয় বক্তাও ছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে একেবারেই ধ্যানস্থ ও ধ্যানময় হয়ে পড়তেন, এবং শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যেও তন্ময়তার সৃষ্টি করতে পারতেন। তাঁর ভাষণ ছিল এমনই মর্মস্পর্শী। এ-সম্পর্কে মহানবী বলেন — "অন্তরের কথা অন্তরকে স্পর্শ করে। মুখের কথা কানকে শব্দ রূপে স্পর্শ করে।" তাই আলী ছিলেন মানুষের অন্তরজয়ী বিরল বক্তা ও বিশুদ্ধ বাগ্মী।

দশম হিজরীতে মহানবী বিভিন্ন স্থানে ইসলামের প্রচারের জন্য প্রতিনিধি পাঠান। ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদকে। তিনি দু'মাস চেষ্টা করেও ভাল ফল লাভ না করায় মহানবী আলীকে ইয়ামেনে পাঠাতে মনস্থ করলেন। মহানবী আলীকে প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই আলীর মনে একটু দ্বিধার ভাব এলো,— তিনি কি কৃতকার্য হতে পারবেন। তখন মহানবী আলীর ভাবনার কারণ বুঝতে পেরে বললেন—" হে আলী তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ তোমাকে সফলকাম করবেন। অতঃপর মহানবী আলীর বক্ষে হাত রেখে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলীর অন্তরের আলো যেন শত গুণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অতঃপর মহানবী স্বহস্তে আলীর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন, হাতে দিলেন একটি কালো পতাকা, সঙ্গে দিলেন তিনশো সাহাবা। কর্মবীর আজ মহান ধর্মবীরে পরিণত হলেন।

অতঃপর মহানবী আলীকে কিছু উপদেশ বা নির্দেশ দিলেন—

১। তুমি শুধু ধর্ম প্রচারক,

২। আক্রান্ত না হলে ইসলামে আক্রমণ নিষিদ্ধ।

৩। সহজভাবে ইসলামের বিধিবিধান বুঝিয়ে বলবে।

৪। যাকাত বা যা কিছু পাবে, গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দেবে।

৫। তোমর আচরণই হবে বড় প্রচার।

দেখিতে উৎসুক আমি বিজয়-কারণ
তোমার সৈনিক নয় তব আচরণ।

অতঃপর আলী মহানবীর প্রাণভরা দোয়া মাথায় নিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে বের হলেন। ইয়ামেনের বিখ্যাত গোষ্ঠী ছিল হামদান। তারা সকলেই ইসলাম কবুল করার পর দলে দলে ইয়ামেনবাসী ইসলাম কবুল করলো। আলী বিপুল বিজয়ে ভূষিত হলেন। মহানবীর আশা-আকাঙ্খা ও দোয়া ব্যর্থ যায়নি।

সাগর জলধি-সিন্ধু সে জল শুকায়।
মহানবীর ক্ষুদ্র বাণীও ব্যর্থ নাহি যায়।"

হযরত আলীর মত মহানবীর এত ঘনিষ্ঠতা, এত সান্নিধ্য, এত সহচার্য, এত নিকটতম জীবনযাত্রা এ জগতের আর কোন দ্বিতীয় জন (পুরুষ) পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। এই কারণেই আলী এত গুণে গুণান্বিত। মহানবীর নাম — মহম্মদ (দঃ) অর্থাৎ প্রশংসিত, আল্লাহর সমূহ গুণ মহানবীর মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তাই তিনি চির প্রশংসিত। এবং আলীর মধ্যে মহানবীর যাবতীয় গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, তাই তিনি আলী অর্থাৎ সমুন্নত।

বিদায় হজে আলী (কঃ) (৬৩২ খ্রীঃ)

ঘনিয়ে এলো বিদায় হজ। প্রায় লক্ষাধিক হজযাত্রী মহানবীর সাথী হওয়ার সুযোগ পেলেন। সেখানে আলী ছিলেন নিকটতম সাথী। খেতে, উঠতে, বসতে আলী ছিলেন মহানবীর ডানে-বাঁয়ে। আলী মহানবীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মহানবী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রাণের সাড়া পেয়েছিলেন আলীর নিকট হতে। আলী পেয়েছিলেন মহানবীর চরম নৈকট্য ও নিবিড় ভালবাসা।

মহানবীর অন্তিম শয়নে আলী (৬৩২ খ্রীঃ)

মহাজীবনের মহামরণ মহাপ্রস্থান আগতপ্রায়। তাবুক অভিযান হতে ফেরার পর মহানবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখনও রোমানগণ সিরিয়া প্রান্তে সন্ধিভঙ্গ করে অশান্তির সৃষ্টি করছিল। তাই তাঁকে সিরিয়া প্রান্তে অভিযানে পাঠাতে হলো। এই অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন ক্রীতদাস পুত্র উসামাকে। যে অভিযানে বহু বিশিষ্ট সাহাবীগণও ছিলেন — যেমন আবুবকর, ওমর, ওসমান প্রমুখ ব্যক্তিগণ। হযরত আলীকে নিজ কাছে রাখলেন সেবা-শুশ্রূষার জন্য। একদিকে ফাতেমা ও অন্যদিকে আলী রয়ে গেলেন। রবিবার তাঁর অবস্থা ভাল না থাকায় উসামা যাত্রা বন্ধ করলেন। সোমবার তাঁর অবস্থার উন্নতি দেখা দেওয়ায় উসামা আবার যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন তাঁর মাতা উম্মে আরমান সংবাদ দিলেন— মহানবীর অবস্থা ভাল নয়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন সকলেই। যাত্রা বন্ধ হলো।

হযরত আব্বাস, আলীকে ডাকলেন— "আমি আব্দুল মুত্তালিবর খানদানের বহু ব্যক্তির মৃত্যুকালীন চেহারা লক্ষ্য করেছি। আমাকে ভাল লাগছে না। চলো আমরা মহানবীর নিকট গিয়ে আরজ করি, তিনি যেন খেলাফতের জন্য অছিয়ত করে যান। আলী উত্তর দিলেন — ওটা আমি পারবো না।

সোমবার অপরাহ্নে তাঁর অবস্থা অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হতে থাকলে মহানবী আলীকে কাছে ডেকে নিলেন। এবং বললেন — আমার অন্তিম সময়

আসন্নপ্রায়। ঐ ইহুদীর আমার নিকট কিছু পাওনা আছে। তুমি পরিশোধ করে দিও। আমার পর তোমার ওপর বিপদ আসবে, তুমি ধৈর্য ধারণ করো। ডাক দিলেন — ইমাম হাসান ও হোসেনকে, স্নেহভরে মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন। অতঃপর আলীকে সম্বোধন করে বললেন — সাবধান নামাজ, নামাজ, নামাজ সাবধান — গরিব মানুষ, গরিব মানুষ, গরিব মানুষ।" একথার পরই মহাজীবনের মহাপ্রস্থান হলো।

এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম — মহানবীর নবুয়ত জীবনের শুভলগ্ন হতে জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত আলীর মত এত সান্নিধ্যলাভ আর কারোর ভাগ্যেই জোটেনি। সুতরাং আলী মহানবীর নিকট কত প্রিয় ছিলেন, তার পরিমাপ এখানেই।

মহানবীর কাফন দাফনে আলী (কঃ)

প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা পিতার তিরোধানে যে ব্যথা পেয়েছিলেন, সেই বিচ্ছেদ-ব্যথা তিনি জীবনে আর সহ্য করতে পারলেন না, দিন দিন ক্ষীণ হতে আরও ক্ষীণ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর মাত্র ছয়মাস কাল পরই জান্নাত লোকে সেই মহান পিতার সকাশে গমন করলেন। হযরত আলী মহানবীকে গোসল করালেন এবং কাফন পরালেন। যখন আলী এই সমস্ত কাজে ব্যস্ত তখন কিছু মানুষ ভাবী খেলাফত নিয়ে ব্যস্ত। আলী যখন একবারও চিন্তা করছেন না দুনিয়ার লাভ-লোকসান নিয়ে, তখন অনেকেই ঐটিতেই বিভোর। এখানেই প্রতীয়মান হয় এক অপরের প্রতি সম্পন্ন কত সুধামাখা, কত স্নেহমাখা, কত শ্রদ্ধামাখা এবং কত স্বর্গীয় ছিল (বিস্তারিত মহানবী দ্রঃ)।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খেলাফত বিতর্কে হযরত আলী ও বিবি ফাতেমা

মহানবীর তিরোধানের পর কিভাবে ইসলামজগতে খেলাফত প্রথার প্রবর্তন হলো, সে কথা আমরা সবিস্তারে আবুবকরের জীবনপঞ্জীতে বর্ণনা করেছি। আবার সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা ঠিক হবে না। বিষয়টিকে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো নতুন দিক থেকে।

১। মহানবী ইন্তেকাল করলেন। তাঁর দাফন করার আগেই খেলাফতের প্রশ্নটা কি ওঠা ঠিক হয়েছিল ? প্রশ্ন জাগে মনে।

২। সফিফায়ে বণি সায়াদায় যেখানে এই বিরাট ব্যাপারটি আলোচিত হলো, সেখানে বনি হাশিম গোত্রের কেউই তো ছিলেন না। এবং তাঁরা থাকবেনই বা কি করে, মহানবীর লাশ ফেলে রেখে তাঁরা কি রাজনীতি করতে যাবেন রাজ্যপাট দখল করার জন্য। সেটা তো সম্ভব না আপনজনদের জন্য।

৩। ওখানে আনসারগণ তাদের খেলাফতের দাবিকে তুলে ধরেন। কারণ দেখালেন — তাঁরা ইসলামের নবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং ইসলামের শিশু বৃক্ষটিকে মহীরুহতে পরিণত করেন। তাদের যুক্তিটাও খুব একটা অযৌক্তিক ছিল না।

৪। মোহাজেরগণ সকলকে বোঝালেন —তাঁরা মহানবীর খুবই নিকটবর্তী। সুতরাং খেলাফত তাঁদেরই প্রাপ্য। কোরেশ বংশের বাইরে খেলাফত যাওয়া ঠিক হবে না। এঁদের যুক্তিও দুর্বল না।

৫। মোহাজেরগণ যে যুক্তি বলে খেলাফত দাবি করলেন, আলী সেই যুক্তিতেই সর্বাপেক্ষা দাবিদার নন কি। এটাও চিন্তার বিষয় নিরপেক্ষভাবে কথা বললে।

এই সমস্ত নানা কারণে বিবি ফাতেমা ও অন্যান্য হাশেমীগণ আবুবকরের খেলাফতের তীব্র বিরোধিতা করলেন। এমনকি বিবি ফাতেমা যখন বক্তব্য বলে গেলেন, তখন তো আনসারগণের অভিমত থেকে এটাই বোঝা গেল, সময়ে অর্থাৎ আবুবকরের হাতে খেলাফতের বয়াৎ নেওয়ার পূর্বেই যদি তাঁরা এসব জানতে পারতেন, তাহলে আলীকেই খলিফা নির্বাচন করতেন। দূর অতীতের এইসব ঘটনা থেকে মনে হয় — ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক কিছু একটা ঘটেছিল। তাই বিবি ফাতেমা যে কয়েক মাস জীবিত ছিলেন, খলিফা আবুবকরকে খলিফা বলে কোনদিনই স্বীকৃতি দেননি। এমনকি ভালো চোখেও দেখেননি। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় যা বোঝা যায়, খলিফা আবুবকরের হাতে বয়াৎ

হতে আলীর কোন ব্যক্তিগত বাধা বা আপত্তি না থাকলেও বিবি ফাতেমার জন্যই তাঁর জীবিতকালে তিনি বয়াৎ হতে পারেননি। এইটাই ঘটনা।

তবে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে — আবুবকর বয়সে, জ্ঞানে ও গুণে খুবই উপযুক্ত মানুষ ছিলেন। তা না হলে মহানবী কেন তাঁকে ইমামতির ভার দিয়েছিলেন। তবে একথার অর্থ এও নয় যে, কাউকে কোন ভার দিলে, তাকেই সেই পদে বসাতে হবে এমন নয়। যেমন অনেক প্রধানমন্ত্রী তাঁর অবর্তমানে অন্য মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়ে যান, তার অর্থ এই নয় যে, তাঁকেই পরে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। যাই হোক, সবাইকে নিয়ে মিলে-জুলে খাতুনে জান্নাতসহ ব্যাপারটা মিটলে কতই না ভাল হতো।

হযরত আলীর স্ত্রী বিয়োগ

মহানবীর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা কন্যা আলীর স্ত্রী ফাতেমা যে নিদারুণভাবে বেদনাহত হয়েছিলেন, সমগ্র আরবে তার কোন নজির ছিল না। আলীও জীবনে যাঁকে পিতার উর্ধ্বে দেখতেন, সেই মহানবী আজ আর নেই, সেই দিক থেকে তিনিও কম ব্যথিত নন। অধিকন্তু স্ত্রী ফাতেমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাঁকে দারুণভাবে বিব্রত করে তুলেছিল। আবার পাশে ছিল চারটি নাবালক পুত্র-কন্যা। এবং পরিবারে ছিল ভীষণ অভাব-অভিযোগ। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে আলী দাঁড়িয়েছিলেন।

মহানবীর ইন্তেকালের পর একটানা তিন সপ্তাহ বিবি ফাতেমা না খেয়ে, না শুয়ে অনাহার, অনিদ্রায় তাঁর মাজার শরীফে সদাই পড়ে থাকতেন। ফলে তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেললেন। মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলো। এই মাথা ঘোরা আর বন্ধ হয়নি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। ফলে রওজা শরীফে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় পরলোকগত পিতার একটি চাদরকে সদাই মাথাতে ও হাতে রাখতেন। তিনি কোনক্রমেই পিতৃশোককে ভুলতে পারেননি। যদিও আলী যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে, প্রবোধ দিতে।

কিছুদিন অতিবাহিত হলে বিবি ফাতেমা আর থাকতে না পেরে স্বামীকে অনুরোধ করলেন — তাঁকে একবার মাজার শরীফে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আলী তাই করলেন। বিবি ফাতেমা মাজারে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবার স্বামীর সাথে বাড়ি ফিরলেন। শত দুঃখ, শত শোক, সবকিছু সত্ত্বেও, তিনি কোনদিনই মৃত্যু কামনা করেননি, যেহেতু ওটা ছিল অনৈসলামিক কাজ। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনদীপ নিভতে আব বেশি দেরি নেই।

এরই মধ্যে আলী একদিন কোন বিশেষ কাজ উপলক্ষে বাইরে গেছেন। বিবি ফাতেমা তাঁর চরম দুর্বলতাকে উপেক্ষা করেই একটি পাত্রে কিছু মাটি গুলেছেন, (তদানীন্তন দেশীয় রেওয়াজ) এবং স্বামী ও বাচ্চাদের কাপড়গুলো নিজ হাতে ধুয়েছেন। ওগুলো দড়িতে শুকাচ্ছে। ঐ জরাজীর্ণ শরীরে নিজ হাতে যাঁতা ঘুরিয়ে কিছু আটা তৈরি করছেন। হেনকালে স্বামী বাড়ি ফিরে অতি দুর্বল ফাতেমার এসব কাজ দেখে হতভম্ভ হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন — ফাতেমা, এসব কি করেছো এবং কেন এই অবস্থায় যাঁতা ঘোরাচ্ছো।

স্বামীর এই প্রশ্নে বিবি ফাতেমা কিছুক্ষণ একেবারেই নীরবতা পালন করে মুখ খুললেন — "গতকাল রাতে আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি। মনে হলো তিনি যেন কার অপেক্ষায় আছেন। আমি তাঁকে বললাম — আপনার বিয়োগ ব্যথা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তিনি বললেন — "আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি ওঠো এবং ছেলেমেয়েদের আল্লাহর হাত অর্পণ করো। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু অতীব নিকটবর্তী। তাই আমি আমার জীবনের শেষবারের মত ছেলেমেয়েদের গোসল করাবার জন্য মাটি গুলেছি, তাদের কাপড়গুলো ধুয়েছি তাদের শেষবারের মত পরাবার জন্য, আপনারও কাপড় ধুয়েছি জীবনের মত, আর কোনদিন ধোবো না। আটা পিষেছি, ছেলেমেয়েদের ও আপনাকে জীবনের মত একবার নিজ হাতে খাওয়াবার জন্য"। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহাবীর আলীরও শরীর একেবারেই অবশ হয়ে পড়লো। বীরের বক্ষ আজ প্রকম্পিত হলো, চক্ষু হলো অশ্রুসিক্ত।

অতঃপর বিবি ফাতেমা পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও হোসেনকে অত্যন্ত স্নেহভরে জড়িয়ে ধরে বললেন — বাছা তোমরা তোমাদের নানাজানের মাজার শরীফে গিয়ে জিয়ারত করো, এবং আমার জন্য মাগফিরাত চাও।" পুত্রদ্বয় মায়ের কথানুযায়ী মাজার শরীফে যাওয়া মাত্র শুনতে পেলেন — "হে হাসান-হোসেন, তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, তোমাদের মা আর বেশিক্ষণ দুনিয়াতে থাকবে না। তোমরা তার পাশে থাকো।" এই গায়েবী কথা উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাই-ই বাড়ি ফিরলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন — "এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন।" তখন উত্তরে তাঁরা ঐ ঘটনার কথা বললেন। তখন মা বুঝতে পারলেন — জীবনদীপ নির্বাণলাভ করতে আর বেশি দেরি নেই। গরীয়ান পিতার সাথে গরীয়সী কন্যার মিলন এখন কাছাকাছি।

এরপর আপন স্বামীকে ডেকে বললেন— "হে শিশুজীবনের খেলার সাথী, বাল্যকালের বন্ধু, যৌবনের স্বামী, আমার জীবনসন্ধ্যা আগতপ্রায়। আমি বিদায় বেলায় আপনাকে তিনটি কথা বলে যাচ্ছি — ১। আমার সমস্ত ভুলত্রুটি মার্জনা

করে দেবেন। ২। আমার দাফন রাত্রিকালেই শেষ করবেন। আমার দেহ অন্যলোক যেন স্পর্শ না করে। ৩। আমার বাচ্চাদের প্রতি নজর রাখবেন, কেননা আজ তারা মা হারা হবে। আর কোন দিন পাবেনা তারা মায়ের স্নেহ, মায়ের বুকভরা দরদ, মায়ের প্রাণভরা ভালবাসা, মায়ের প্রাণ উজাড় করা সোহাগ, আজ হারাবে তারা মায়ের কোল, মায়ের চুম্বন, মায়ের আহ্লাদ, মায়ের আদর, মায়ের প্রাণজুড়ানো কত শত, কত কি"। হযরত আলী এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর সরল প্রাণ শিশুর মত কেঁদে উঠলো। তিনিও স্বীকার করলেন ফাতেমাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছে। ফাতেমার বহু গুণরাশির জন্য তিনি অকপট চিত্তে বারবার তাঁর প্রশংসা করে আপন দুর্বলতা ও আপন অক্ষমতা ও আপন গরিবীর জন্য বারবার মাফ চাইলেন। এইরূপই ছিল মহাসাধক ও মহাসাধ্বী জীবন-যুগলের মহাজীবনের শেষলগ্ন।

অতঃপর বিবি ফাতেমা স্বামী আলীকে বললেন — "আপনি ছেলেদের নিয়ে আব্বাজানের রওজা শরীফে যান। আমার জন্য দোয়া করুন। স্ত্রীর কথামত স্বামী বাচ্চাদের নিয়ে মহানবীর রওজা মুবারকে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে বিবি ফাতেমা অজু ও গোসল সমাধা করে কাপড় পাল্টালেন। অতঃপর তিনি বিবি আসমা ও অন্যান্য মহিলাদের বললেন — "আমার স্বামী ফিরে এলে তোমরা তাঁকে বলো — আমাকে এই অবস্থাতেই দাফন করবেন। কোন সময়ই আমার দেহ যেন কাপড়শূন্য না হয়।" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সকলকে ঘরের বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন। সকলেই ঘরের বাইরে গেলেন। নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে সকলেরই যেন কানে আসতে থাকলো — বিবি ফাতেমা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কি যেন বলছেন— অতি ধীর কণ্ঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ মধুর গুঞ্জন ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। একের পর এক সকলেই অতি সন্তর্পণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন — খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা জান্নাতে পৌঁছে গেছেন। "ইন্নালিল্লাহ-অ-ইন্না-ইলাইহে রাজেউন।" এই দিনটি ছিল একাদশ হিজরী, ৬৩৩ খ্রীঃ, ৩ রমজান, মঙ্গলবার, দিবাগত সন্ধ্যা, বাদ্ মাগরিব।

হযরত আলী রওজা শরীফ হতে বাচ্চাদের নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রী খাতুনে জান্নাত জান্নাতেই প্রস্থান করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ রাত্রেই একান্ত আপন কয়েকজনকে নিয়ে জান্নাতুল বাকিতে (সমাধিক্ষেত্র) সমাধিস্থ করলেন। খলিফা আবুবকরও জানতে পারলেন না। প্রভাতে বাতাসের সাথে সাথেই সংবাদ সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ দলে দলে জান্নাতুল বাকিতে কবর জিয়ারতের জন্য হাজির হতে থাকলেন। সকলেই হাহাকার করতে থাকলেন। এতদিন নবী ছিলেন না। নবীর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমা ছিলেন। আজ তিনিও

যেন ক্ষোভভরে শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে মদীনা হতে চির বিদায় নিলেন। সকলেই যেন বুঝতে পারল – মা ফাতেমা মনের ক্ষোভ মরণেও জানিয়ে গেলেন, ইসলামের খেলাফত সুখী হবে কি করে!

মহাজীবন, মহামরণ, একে কি মরণ বলা যাবে ! এ যেন পিতা ও কন্যা এপার-ওপার থেকে পরামর্শ করেই একটি কাজ সমাধা করা হলো। বাচ্ছাদের পাঠালেন নবীজীর রওজা শরীফে, সেখান থেকে তাঁদের বলা হলো – 'তাড়াতাড়ি মায়ের নিকট যাও।' বিবি ফাতেমা স্বামীকে পাঠালেন মাজার শরীফে, বলে দিলেন এসে আমাকে দাফন করো, সত্বর কাফন পরবার দরকার নেই। তিনি পবিত্র কাপড়ে, পবিত্র দেহেই মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যাবেন। আমরা যেমন একটি ভ্রমণ ব্যবস্থা করি – বিভিন্ন শহর থেকে শহরে, এ যেন ঐ রূপ। খাতুনে জান্নাতের নিকট ইহকাল-পরকাল সবই এক ও একাকার হয়ে গিয়েছিল। খাতুনে জান্নাতের জীবনে কবির কথা সত্য হয়েছিল জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে, ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে।

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মূহুর্তে আনন্দ পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

হযরত আবুবকরের খেলাফত ও আলী (কঃ)

বিবি ফাতেমার জীবিতকাল পর্যন্ত হযরত আলী আবুবকরের হাতে বয়াৎ হননি। মহানবীর তিরোধানের ছয় মাসের মধ্যে বিবি ফাতেমা পরলোকগমন করলে আলী বয়েৎ গ্রহণ করেন। মহানবীর সময় তিনি প্রধানত ছিলেন যোদ্ধা, কিন্তু তাঁর সুপ্ত রূপ ছিল সাধক আলী। মহানবী ও বিবি ফাতেমার তিরোধানের পর তিনি প্রধানত তাঁর সাধক জীবনেই ফিরে গেলেন। তবে যখনই খলিফার প্রয়োজন পড়ত, তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকে সাড়া দিতেন। বিদ্রোহী-মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ও নানা কারণে আবুবকরের খেলাফতে ইসলামের তরী যখন ডুবুডুবু, তখন কিন্তু মহাবীর আলী তাঁর হায়দরী রূপ ধারণ করেছিলেন। এবং খলিফাকে চারিদিক থেকে সাহায্য করে যেমন চিন্তামুক্ত করেছিলেন, ইসলামকে ঠিক তেমনিভাবে করেছিলেন বিপদমুক্ত।

হযরত আলী বয়সে আবুবকর অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। তাই আবুবকর তাঁর পরামর্শকে ভীষণভাবে মূল্য দিতেন। সিরিয়া অভিযান প্রেরণে অনেকে যখন অনেক মতামত দিতে থাকলেন, তখন আবুবকর আলীর মতামত চাইলেন। আলী সিরিয়া অভিযানে মত দিলে আবুবকর আর দেরি করেননি।

আবুবকর শরীয়তে মাছয়ালা ব্যাপারে সমস্ত জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হতো, তাদের

মীমাংসা করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবীগণকে নিয়ে একটি ফতোয়া পরিষদ গঠন করেন। এবং আলীকে ঐ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করেন। সুতরাং সকল ব্যাপারেই আলী ছিলেন খলিফার পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা (বিস্তারিত লেখকের আবুবকর গ্রন্থ দ্রঃ)।

ওমরের খেলাফতকালে আলী (কঃ)

আবুবকরের জীবনসন্ধ্যাও ঘনিয়ে এলো। তিনি মাত্র দু'বছর (৬৩২-৬৩৪খ্রীঃ) খেলাফত পরিচালনা করেন। অন্তিম শয়নে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে ভাবী খলিফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও করলেন। তিনি সকলকেই ওমর সম্পর্কে তাঁর মতামত জানালেন। কেউ বা হ্যাঁ করলেন, কেউ বা না করলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিনি একবারও আলীকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না। অথচ অন্যান্য ব্যাপারে আলীই ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে না জিজ্ঞাসা করাটা খুবই অসঙ্গত বলে মনে হলো অনেকেরই। অনেকের মনে সেই অতীতের কথা জেগে উঠল, যখন ওমর আলীকে ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করছিলেন আবুবকরের হাতে বয়াৎ করার জন্য, তখন আলী বলেছিলেন —"ওমর তুমি আবুবকরকে খলিফা নির্বাচিত করে ভাবী খেলাফতে তোমার পথ পরিষ্কার রাখতে চাইছো।" আবুবকর আলীর ন্যায় ব্যক্তিকে না ডেকে, কোন পরামর্শ না করে, আলী অপেক্ষা অধস্তন বহু মানুষের সাথে পরামর্শ করে যখন আগালেন, তখন আলীর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের ইতিহাসে চিরন্তনভাবে স্থান লাভ করলো। যাই হোক খলিফা ওমরও আলীকেই প্রধান উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আলীও মনেপ্রাণে সাড়া দিয়েছিলেন।

প্রথমবার অস্থায়ী খলিফা

একবার পারস্য অভিযানকালে ওমর নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হলেন। সব প্রস্তুতি শেষ। খলিফা আলীকে ডেকে তাঁর হস্তে খেলাফতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। মদীনা হতে তিন মাইল দূরে সাবার নামক এক ঝরনার তীরে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন। এমন সময় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী খলিফাকে অনুরোধ করলেন — আপনার সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করাটা উচিত হবে না। কেননা খোদা না করুন, যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, তখন কি হবে। যদিও মহানবী বহু যুদ্ধক্ষেত্রেই হাজির ছিলেন। কিন্তু খলিফা ওমর তো মহানবী নন। তিনি মহানবীর খলিফা মাত্র। সকলের কথা বিবেচনা করেই ওমর আলীর পরামর্শ চাইলেন। আলীও তাঁদের কথা সমর্থন করাতে তিনি ফিরে এলেন

ও আলীকে সেনাপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আলী অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন তখন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো।

দ্বিতীয়বার অস্থায়ী খলিফা

৬৩৮ খ্রীঃ, ১৬ হিজরী, সেনাপতি আমর ইবনুল আস্ বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলো অধিকার করে বাইতুল মোকাদ্দাস অবরোধ করেন। ইতিমধ্যে সেনাপতি আবু ওবয়দা সিরিয়া জয় সমাপ্ত করে আমরের সাথে যোগদান করলে তখনকার খ্রীস্টানগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। এবং তাঁরা অনুরোধ করেন — স্বয়ং খলিফা এসে সন্ধিপত্র তৈরি করলে ভাল হয়। একথা খলিফার কর্ণগোচর করা হলে খলিফা আলীর পরামর্শনুসারে তথায় যেতে সম্মত হয়ে আলীকে অনুরোধ করলেন — অস্থায়ীভাবে খেলাফত পরিচালনা করতে। আলী খলিফার অনুরোধ রক্ষা করেই অস্থায়ী খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে আমরা সবাই বুঝতে পারছি– আলী কত দায়িত্বশীল ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শুধু একটি ব্যাপারেই কোন যোগ্যতা ছিল না, সেটি লোভ লালসা, পদমোহ, কপটতা, ভণ্ডামি, চতুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা ও অসহযোগিতা ইত্যাদি। তিনি ছিলেন এই জগতের মায়া-মমতা, সরলতা ও ত্যাগের সম্রাট, ন্যায়পরায়ণতা-বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সম্রাট, জ্ঞান ও বিদ্যার ছিলেন সাগর।

জামাতা ওমর

খলিফা ওমরের বহুদিনের একটি প্রগাঢ় ইচ্ছা ছিল মহানবীর বংশের মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু বহুদিন ধরে তেমন কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। পরে একটি সুযোগ পেলেন। তখন হযরত আলীর ঔরসজাত ও বিবি ফাতেমার গর্ভজাত দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমের বয়স বারো বছর মাত্র। খলিফা ওমর তখন ৫৬ বছরের একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি । তিনি তাঁর মনের সাধ মিটানোর জন্য উম্মে কুলসুমের সাথে বিবাহ বন্ধনের উদ্দেশ্যে আলীর নিকট প্রস্তাব দিলেন। আলী ওমরের বয়সের দিক চিন্তা করে প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। ওমর নিরাশ না হয়ে বারবার আলীকে অনুরোধ করতে থাকেন। পরিশেষে আলী ওমরের একান্ত অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধে সাড়া দিলেন। এবং হিজরীর সতেরো সনে (৬৩৯ খ্রীঃ) চল্লিশ হাজার দিরহাম দেনা-মোহরের বিনিময়ে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। খলিফা ওমর বাইশ হিজরীতে (৬৪৪ খ্রীঃ) আততায়ীর হস্তে শহীদ হন। তখন উম্মে কুলসুম সতেরো বছর বয়সে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জননী হয়ে বিধবা হন। তবে তাঁর আবার বিবাহ হয়। এইভাবে পরবর্তীকালে ওমর ও আলীর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপ নিয়েছিল (বিস্তারিত ওমর দ্রঃ)।

হযরত ওসমানের খেলাফতকালে আলী (কঃ)

কেন আলী বঞ্চিত হলেন খেলাফতে। একে কি ভাগ্যের খেলা বলবো, না মানুষের খেলা বলবো। আলীর অতি নির্মল ও অতি নির্ভীক চরিত্র হয়তো বা এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। এই প্রসঙ্গে মহানবীর একটি হাদিস মনে পড়ে –"এই দুনিয়া প্রতারণার স্থল, একে প্রতারণা ব্যতীত জয় করা যায় না"। তবে একথাও আমরা বলতে চাই না কোন মতেই কোন খলিফা সম্পর্কেই। তবে হয়তো কোথাও একটু-আধটু কৌশল কাজ করেছে বলে মনে হয়। মহান আলী এ সবেরও ধার ধারতেন না। তাই দু'দিনের দুনিয়া তাঁকে অন্য চোখে দেখলো, তিনিও দুনিয়াকে অন্য চোখে দেখলেন। দুনিয়া তাঁকে বশ করতে পারেনি। বরং তিনিই দুনিয়াকে দাসে পরিণত করেছিলেন।

বহু কিছুর পর হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ মহানবীর দেওয়া পাগড়ি মাথায় বেঁধে মসজিদ নববীতে হাজির হয়ে সোজাসুজি মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং একটি মোনাজাত করলেন। অতঃপর হযরত আলীকে নিকটে ডেকে তাঁর হাত ধরে বললেন –"আপনি কেতাব, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী দু'জন খলিফার মোতাবেকে আমার হাতে বয়াত করতে প্রস্তুত আছেন কি? হযরত আলী তাঁর কথার পূর্ণ তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে জবাবে বললেন – 'না'। অতঃপর তিনি একই ভাবে হযরত ওসমানকে একই কথা বললেন, এবং ওসমান সঙ্গে সঙ্গে বললেন 'হ্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করে দিলেন —'ওসমান খলিফা'। সেদিন ছিল চব্বিশ হিজরীর ৪ মহরম (৬৪৪ খ্রীঃ)। এখানে হযরত আলী কোনরূপ আপত্তি না করে বিনা দ্বিধায় ওসমানের হাতে বয়াত হলেন। ব্যাপারটি এইভাবে সম্পন্ন হলো। জানি না এর মধ্যে ভাগ্যের কোন পরিহাস লুকিয়ে ছিল কিনা।

আরম্ভ হলো খলিফা ওসমানের বরো বছরের খেলাফত। ছ'বছর ভালভাবেই কাটল। বাকি ছ'বছরে যত গোলযোগ দেখা দিল। কয়েকজন চতুর লোকের হাতে চলে গিয়েছিল এই ছ'বছরের ইসলামের খেলাফত। খালিফা তাঁর অতি বার্ধক্যতাবশত তাদের ওপরেই নির্ভর করেছিলেন বেশি। যাদের দ্বারা খলিফা কর্তৃক অপমানিত হল সে যুগের কয়েকজন সাধারণ মানুষ — আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবুযর গিফারী, আম্মার ইবনে ইয়াসির আরো বহু জন। স্বয়ং মহানবী যাদের ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন, এমন কি যাদের মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ। এই শ্রেণীর মানুষগুলো একদিন খলিফার পরামর্শদাতা হয়ে উঠলো, এমনকি কেউ কেউ (আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ) কৌশল করে গভর্নরও হলো। প্রকৃত হক কথা বলতে গেলে মুয়াবিয়া, মারওয়ান প্রমুখ ব্যক্তিগণ ওসমানের খেলাফতকালে তাঁরা তাঁদের আপন আপন খেয়াল ও খুশির খেলাফত চালাতে আরম্ভ করলেন। এইখানেই মহান আলীর সাথে বাধল দ্বন্দ্ব। এটা ছিল ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব (বিস্তারিত খলিফা ওসমান দ্রঃ)।

পঞ্চম অধ্যায়

শেরে খোদা হযরত আলীর খেলাফত

প্রকৃত মুজাহিদ

মহানবী নবুয়তলাভের পর তেইশ বছর বেঁচেছিলেন। আজ আবার তাঁর তিরোধানের পরও সুদীর্ঘ তেইশ বছর কালগর্ভে কেটে গেছে। মহানবীর প্রভাবধন্য পরিবেশ ও মানুষগুলো প্রায় সব চলে গেছেন। মহানবীর প্রভাবের উষ্ণতা ও তাপ হতে দেশও বহু দূরে সরে গেছে। মহানবীর জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত মানুষগুলোর যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেঁচেছিলেন, তাঁরাও আজ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন জীবনের বেলাভূমিতে। নেই সেই আহ্বান, নেই সেই উত্তর, নেই সেই মহামানব, নেই সেই মনীষীর দল। যে দু'-একজন ছিলেন তাঁরা যেন ওপারের ডাকে সাড়া দিতে ব্যস্ত। নতুন প্রজন্ম এসে গেছে।

হযরত ওসমানের খেলাফতের দ্বিতীয়ার্ধে ইসলামি খেলাফত বলতে কি কিছু ছিল আর! তাই যদি থাকবে আবুযর গিফারীর মত ফেরেস্তা মানুষ কোন কোন কারণে মরুভূমিতে নির্বাসনদন্ড লাভ করলেন।যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী বলেছিলেন —"এই দুনিয়ায় আবুযর অপেক্ষা সৎলোক কেউই নেই।" চোর ধরলেন, চোরেব শাস্তি হলো না, যিনি ধরলেন সেই মহানবীর আজীবন স্নেহধন্য মহান সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের শাস্তি হলো, চাকরি গেল। এটা কোন খেলাফত চলছিল! দেশের অবস্থা যখন দুর্বারভাবে দুর্নিবার গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে, স্বয়ং হযরত আলী তখন বারবার ইসলামের খাতিরে খলিফার দরবারে গিয়ে আপন হতে অযাচিতভাবে বহু সতর্ক বাণী, সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এমন কি বারবার হাদিস পবিত্র কোরআনের কথাও উল্লেখ করেছিলেন– "সেইদিনই সত্য, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের আশ্রয় নিক। নিশ্চয় আমি তোমাদের আসন্ন (জাগতিক) শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম।" সুরা নাবা ৭৮ ঃ ৩৯। এর উত্তরে আলীকে মাঝে মাঝে নরম গরম ভর্ৎসনাই শুনতে হয়েছে। খলিফা তখন নিছক দু'-একজন স্তাবকের হাতে উঠছেন ও বসছেন। আলী তিতিবিরক্ত হয়েই বসে গেলেন। জ্ঞানসাধক আলী আবার নিজ জ্ঞানসাধনায় ও জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

একে তো নতুন প্রজন্ম, সেখানে সহ্য, ধৈর্য, দয়া-মায়া-ক্ষমা সকল কিছুই যেন তার মান হারিয়েছে। ছ'বছর ধরে যে উচ্ছৃঙ্খল, যে অনাচার, যে অবিচার, যে অত্যাচার তাঁর খেলাফতে মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পেল, যে পরিবেশ তিনি আপন জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তৈবি করলেন কয়েকজন স্তাবককে আশ্রয় দিয়ে তাঁর

আপন হাতে তৈরি ঐ পরিবেশের স্বাদ তো তাঁকে আস্বাদন করতেই হবে। অনেক সময় অতি সাধু ব্যক্তিরাও পাকে-প্রকারে পড়ে যান জালে। এটাও যেন তাই হলো।

হযরত আবুবকর অন্তিম শয়নে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে নিজ হাতেই একটা সুরাহা করে গিয়েছিলেন। হযরত ওমর অতটা সুরাহা করতে না পারলেও ছ'জনের হাতে ভাবী খেলাফত গঠনের ভার দিয়ে যান। আজ ঐ ছ'জনের মাত্র তিন জন জীবিত– আলী, তালহা, যুবাইর। দীর্ঘ বারো বছর খেলাফত পরিচালনার পর হযরত ওসমান ধর্মভীরু খলিফা কোরআন পাঠরত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হলেন। কি দুর্ভাগ্য, কি নির্মম পরিহাস, স্বয়ং খলিফার লাশ তিনদিন একই অবস্থায় পড়ে রইলো। সারা মদীনায় বিদ্রোহীদের চরম দাপটে মদীনাবাসীগণ মুখ খোলা দূরের কথা, ঘর থেকে বেরোতেও ভয় পাচ্ছেন। স্বয়ং খলিফার বাড়িতে শ্মশানের রাজত্ব বিরাজমান। সমস্ত লোক প্রায় ঘরছাড়া, বাড়িছাড়া, মদীনাছাড়া, তখন একমাত্র হযরত আলী এগিয়ে এলেন তালহা ও যুবাইরকে সাথে নিয়ে। এবং অতি গোপনে রাত্রিবেলায় খলিফার কাফন দাফন শেষ করলেন। অতঃপর আলী আবার নীরব হলেন।

তখন বিদ্রোহীগণ বুঝতে পারলো–এই অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে সারা দেশে ভয়াবহ রূপ দেখা দেবে। সুতরাং সত্বর একজন খলিফা নির্বাচিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। তারা মদীনাবাসীকে অনুরোধ করলো - 'আপনারা এবার নতুন খলিফা নির্বাচিত করুন'। মদীনাবাসীগণ একে অপরের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সবার মুখে একই কথা – "আলী ছাড়া আর কেউই খেলাফতের উপযুক্ত নন। আলীই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে আমরা খলিফা নির্বাচন করতে পারি। আজকের দিনে আলীই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম মানুষ, আলীকে অনুরোধ করা হোক এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে।"

অতঃপর কিছু সংখ্যক বিশেষ মানুষ যখন আলীকে অনুরোধ জানালেন, তখন আলী পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিলেন – তিনি সম্মত নন। তিনি তাঁর জ্ঞানচর্চায় বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবেন। তখন কিছু মানুষ তালহা-যুবাইর ও অন্যান্য ব্যক্তিদেরকেও খেলাফতের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলে, তাঁরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করেই এক কথাতে জবাব দিলেন এবং প্রস্তাব দিলেন আলীর জন্য। তখন আবার বহু সংখ্যক মানুষ আলীর নিকট গমন করলেন তাঁকে সম্মত করার জন্য। এবার আলী তালহা ও যুবাইরকে পর পর অনুরোধ করলেন খলিফা হওয়ার জন্য। তাঁরা দু'জনেই বিনীত কণ্ঠে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন আলী বললেন, 'আপনারা একটি সাধারণসভা ডাকুন, আমাকে খলিফা করার জন্য নয়, বরং কোন সাহাবী যদি রাজি থাকেন, তাহলে তাঁকে এই গুরুদায়িত্ব

দেওয়ার জন্য'। সভা ডাকা হলো, অনেকে এলেন, আবার অনেকেই এলেন না। সভার কাজ শেষ করে, যখন সভামাঝে কাউকেই খলিফা পদের জন্য পাওয়া গেল না, তখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে যাওয়ার জন্য আলী প্রস্তাব দিলেন। এবং তাও-ও করা হলো। কিন্তু কোন লোক পাওয়া গেল না।

পরদিন সভা ডাকা হলো। তালহা ও যুবাইর সভাতে এলেন না। সভাতে কথা উঠলো তাঁদের মতামত জানা হোক। সেইমত কয়েকজন তাঁদের বাড়িতে গেলেন এবং বললেন —"আপনারা খলিফা হোন, যদি তা না হোন, তাহলে খলিফা নির্বাচন করুন, এভাবে বেশিদিন একটি বিশাল সাম্রাজ্য চলতে পারে না। তাতে ইসলামের ও মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি হবে।" তাঁরা এক বাক্যে বললেন — সকলে যা করবেন, তাঁদের মতও তাই। অতঃপর প্রতিনিধিদল সভাতে ফিরে এসে তাঁদের বক্তব্য বললেন। তখন হযরত আলী আবার বললেন —"আপনারা যে সভাতে খলিফা নির্বাচন করবেন, সেখানে তালহা, যুবাইর প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপস্থিতি প্রয়োজন।" এই কথাতে মালিক আশতার ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সভামাঝে হাজির করলেন।

অতঃপর হযরত আলী সভার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রথম বললেন — "আমি খেলাফত গ্রহণে অনিচ্ছুক এবং আপনাদের মধ্যে যিনি খেলাফত গ্রহণে ইচ্ছুক, আমি নির্দ্বিধায় তাঁর হাতে বয়াত হবো।" তখন সমবেত জনতা সকলকে বললেন —"আপনারা কে খেলাফত গ্রহণে ইচ্ছুক, এগিয়ে আসুন।" কেউই এগিয়ে এলেন না। তখন জনগণ বিশেষ করে যুবাইর ও তালহাকে অনুরোধ করলেন —"হযরত আলী যেখানে খেলাফত গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, তখন আপনাদের একজন তা গ্রহণ করুন।" উত্তরে দু'জনই আপন আপন অসম্মতি ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। সর্বশেষে জনগণ আলীকে জড়িয়ে ধরলেন। আলী সকলের আবেদন-নিবেদন ইসলামের খাতিরে উপেক্ষা করতে না পেরেই হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং সকলেই তাঁর হাতে বয়াত হলেন।

পরদিন হযরত আলী আবার মসজিদে নববীতে হাজির হলেন। এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। এবং কয়েকটি কথাও বললেন —"আমি শুনছি কুফাবাসীরা যুবাইরকে খলিফা করতে চায়, বসরাবাসীরা তালহাকে, সিরিয়াবাসীরা মুয়াবিয়াকে, মক্কা-মদীনাবাসীরা আলীকে।" এই পরিস্থিতিতে কি করা যাবে, আপনারাই বলুন। সেখানে তালহা ও যুবাইর উপস্থিতও ছিলেন। সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলেন —" আপনি সর্বসম্মত খলিফা" এবং বাকি সকলে তাঁর হাতে বয়াত হলেন। এইভাবে ওসমান হত্যার সাতদিন পর পঁয়ত্রিশ হিজরীর পঁচিশে যিলহজ হযরত আলী খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি, হযরত ওসমান তাঁর খেলাফতের সময় চরম দুর্যোগ-দূষিত আবহাওয়া অশান্তি-অরাজকতা বিক্ষোভ ও ঝঞ্ঝার মধ্যে কুচক্রী-দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা শহীদ হলেন। সেই ঝঞ্ঝাতাড়িত উত্তাল সমুদ্রের চরম তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত তরীকে বহু মানুষের অনুরোধে জ্ঞানচর্চা বিরত করে মহান আলী কাণ্ডারী রূপে হাতে নিলেন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐ তরীর যাত্রীগণের বহুজন নিজেরাই চেয়েছিলেন ইসলামের গণতন্ত্রের তরীটি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অতল জলে ডুবে যাক। একে তো বাইরের বিদ্রোহ ঝঞ্ঝা ও ঝড়, তার ওপর অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা তরীকে ঠিক তীরে আসতে দিল না। আবহাওয়া মোটেই অনুকূল হলো না। পরিশেষে কাণ্ডারীর একাকী প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মহান আলীর শাহাদতের সঙ্গে সঙ্গে চরম শয়তানি ও ষড়যন্ত্রে ইসলামের গণতন্ত্রের তরীটি মিথ্যার নির্জলা বাতাবরণে লোভ ও লালাসার অতল জলে তলিয়ে গেল। দেশজোড়া দূষিত আবহাওয়াতে একজন, তিনি যত বড়ই হোন, কি করতে পারেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে —

তাল্ —তেঁতুল—বাবলা—
কি করবে দুধু মুখী একলা। —মওলবী মোঃ ইউনুস্।

অনেকেই বলে থাকেন, হযরত আলী খেলাফত পরিচালনায় বিফল ও ব্যর্থ হলেন। যাঁরা হযরত আলীকে ও তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীকে চেনেন ও জানেন, তাঁরা আশা করি একথা বলবেন না। আলীর জীবনের দুটি দিক ছিল— একদিকে তিনি জ্ঞানবীর এবং অন্যদিকে তিনি সাহসী যোদ্ধা প্রকৃত মুজাহিদ। প্রকৃত মুজাহিদ তিনিই যিনি আজীবন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। সেই অর্থে আলী একজন নিখুঁত মুজাহিদ। যতদিন মহানবী হায়াতে ছিলেন, ততদিন তিনি প্রকৃত অর্থে একজন মুজাহিদই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিল গভীর জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানানুশীলন। তাই স্বয়ং মহানবী তাঁকে 'জ্ঞানের দরজা' উপাধিতে ভূষিত করলেন। এরূপ ভাগ্য ইসলাম জগতে আর কারো হয়নি।

যেদিনই মহানবী ইহলোক ত্যাগ করলেন, সেদিন হতেই হযরত আলীর তরবারি খাপবদ্ধ হলো বিশেষ ঘটনা ব্যতীত। খুলে দিলেন জ্ঞানের খাপ, জ্ঞানের কলম, জ্ঞানের কালি। একটানা মহানবীর 'নবুয়তের' সুদীর্ঘ তেইশ বছর মূলত ছিলেন মুজাহিদ। আবার তাঁর তিরোধানের পর সেই একটানা তেইশ বছর হলেন জ্ঞানসাধক।

মহাজীবনের প্রান্তভাগে শেষে আবার দেখা দিল মুজাহিদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। আমরা সকলেই জানি, তিনি যে খেলাফতে আসীন হয়েছিলেন সেটা কি কোন ফুলশয্যা ছিল! মোটেই না। সেটা ছিল দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার,

ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, গোপন আঘাত ইত্যাদির আখড়া। লোক জানতো আলী খলিফা রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু স্বয়ং আলী জানতেন — তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মুজাহিদের ধর্ম পালন করছেন। তাই কোন হতাশা তাঁকে কোনদিনই জয় করতে পারেনি, কোন নিরাশা তাঁকে কোনদিন হতোদ্যম করতেও পারেনি। হযরত আলী জীবনে কোনদিনই কোন অসত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেননি, কোন মিথ্যা ও কুটিলতার নিকট কোনদিনই মাথা নত করেননি। চিরদিনই ইসলামের মাহাত্ম্য ও মহানবীর নবুয়তের পূর্ণ মর্যাদাকে মনেপ্রাণে রক্ষা করার জন্য জীবনের প্রথম দিন হতে শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন একনিষ্ঠ মুজাহিদ। তিনি বলতেন মানুষ সত্য ও সুন্দরের পথে সংগ্রাম করুক, ফল আল্লাহ্‌র হাতে। স্বয়ং মহানবী বলতেন—"চেষ্টা আমার নিকট হতে, ফল আল্লাহর হাতে ।" স্বয়ং আল্লাহ্ মহানবীকে কি বলে সান্ত্বনা দিলেন — যখন তিনি খুব বিব্রত বোধ করতেন। আল্লাহ্ নবীকে জানিয়ে দিলেন — নবীর কাজ শুধু প্রচার করা, কে তা গ্রহণ করবে এবং কে গ্রহণ করবে না, সেটা তাঁর দায়িত্ব নয়। তিনি প্রচারক মাত্র। ৪ ঃ ৮০, ১৭ ঃ ৫৪, ৮৮ ঃ ২২।

ঐ অর্থেই দেখতে হবে হযরত আলীর জীবনসাধনাকে। তিনি কতখানি নিজেকে সংগ্রামে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন। তিনি কি কোথাও মিথ্যা বা অনাচারের নিকট কোনদিন আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি কি কোনদিন কোন চাটুকারের সাথে সন্ধি করেছিলেন, তিনি কি কোনদিন কাউকে প্রলোভন দেখিয়ে আপন দলে টানতে চেয়েছিলেন, তিনি কি কোনদিন কোন অসৎ মানুষকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, এক কথায় বলা যাবে — 'না'। এইখানেই তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা ও কৃতকার্যতা। ঐভাবে দেখতে গেলে তো অনেকেই একদিন বলে বসবেন, "স্বয়ং মহানবীর কৃতকার্যতা নিয়ে নানা কথা। কেননা পবিত্র কোরআন বারবার ঘোষণা করেছে — মহানবী সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য প্রেরিত রসুল।" ৪ ঃ ৭৯, ৭ ঃ ১৫৮, ৩৪ ঃ ২৮। এবার যদি কেউ বলেন, সমগ্র মানবমন্ডলী তো মুসলমান হয়নি। এর উত্তরে বলা হবে, তিনি তো সমগ্র মানবন্ডলীকে মুসলমান করার জন্য আসেননি, সমগ্র মানমন্ডলীর মধ্যে কোরআন প্রচার করতে এসেছিলেন। এবং তা চরম কৃতকার্যতার সাথেই করে গেছেন। সেইরূপ ভাবে সংগ্রামরত মহান আলী অতর্কিতে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন ইসলামের খেলাফতকে ইসলামি পথে প্রতিষ্ঠিত করতে কত বড় মুজাহিদ ছিলেন। ভন্ড-চতুর-চাটুকারদের সাথে সন্ধি করেননি, স্বার্থান্বেষী শিবিরে কোনদিন মাথা নত করেননি, সম্মুখ সমরে সংগ্রাম করেছেন, শেষে কাপুরুষ আততায়ীর হাতে অতর্কিতে জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন।২ ঃ ১৫৪, ৪ ঃ ৬৯।

খেলাফতের প্রথম দিন ঃ

এমনই এক পরিবেশে, এমনই এক পরিস্থিতিতে হযরত আলী খেলাফতে এলেন, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁর জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না। তাঁর জীবনের দুটো বিশেষ দিক ছিল — বীর যোদ্ধা ও মহানসাধক। যুদ্ধতে অদ্বিতীয়, সাধনাতে অতুলনীয়। এই মহামানবটিকে এক দুর্যোগময় নোংরা দুর্গন্ধময় পরিবেশে নামিয়ে দেওয়া হলো। পরিবেশ ও পরিস্থিতি কত নিচে নেমেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়, যখন দেখা যায় একটি দেশের কর্ণধার ধর্ম প্রাণ খলিফা তাঁরই বাসভবনে প্রকাশ্য দিবালোকে বিদ্রোহীদের দ্বারা শহীদ হলেন। মুসলমানদের দ্বারা রক্তপাতে নিহত খলিফা ওসমানই প্রথম। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এ-ঘটনা খুবই কম লক্ষ্য করা যায়।

মহান আলী প্রথম দিনের খোতবায় বা ধর্মীয় বক্তৃতায় যা বলেছিলেন —"নবীজীর নীতিকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য খেলাফতের ভার নিইনি, বরং তাকে প্রয়োগ করার জন্যই নিয়েছি। দুর্নীতির সাথে আপস ও সন্ধি করার জন্য আসিনি, দুর্নীতি দূর করতে এসেছি। অসৎ মানুষকে প্রশ্রয় দিতে আসিনি, সৎ-কে আশ্রয় দিতে এসেছি। জালেমকে শাস্তি দিতে হবে, মজলুমকে রক্ষা করতে হবে। আমানতের খেয়ানত করা চলবে না, অপব্যয় বন্ধ করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ — সকল মুসলমান যেন ভাই-ভাই রূপে জীবন যাপন করে। যার কথা ও কাজ দ্বারা কেউ আঘাত না পায়, সেই তো প্রকৃত মুসলমান। আল্লাহকে ভয় করে অন্যের সাথে ব্যবহার করো, এমনকি পশু-পক্ষীদের সাথে মানুষের যে ব্যবহার, তারও হিসাব থাকবে আল্লাহর নিকট। সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্। সৎকাজ করো, অসৎ কাজ থেকে দূরে থাক।"

খেলাফতের দ্বিতীয় দিন ঃ

কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এইটুকুই বলা যায়-"চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। দ্বিতীয় দিনে তালহা ও যুবাইর খলিফার নিকট এসে দাবি করলেন --ওসমান হত্যাকারীদের শাস্তির বিধান করতে হবে। খুবই আশ্চর্য লাগে যখন কয়েক দিন ধরে ওসমানের ঘর বিদ্রোহীরা অবরুদ্ধ করে রেখেছে, যখন খলিফা একবিন্দু পানিও পাচ্ছেন না, তখন আলী ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তিরাও মদীনাতেই ছিলেন। খলিফা শতবার ডাক দিয়েও আলী ব্যতীত কারো দেখা পাননি। আজ তাঁরাই শহীদ খলিফার দরদী হয়ে পড়েছেন। খলিফা তাঁদের বললেন— "আপনারা আমাকে বলুন, আর নাই বলুন, আমি ন্যায়বিচার করতে দৃঢ় সঙ্কল্প। তবে দোষীদের খুঁজে বের করতে হবে। কিছু সময় লাগবে।

খলিফা হত্যার তদন্তে প্রথম মারওয়ানকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন খলিফা নিজেই বিবি নায়লার নিকট গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি বধকারীদের কাউকে চেনেন কিনা। তিনি দু'জনের মাত্র সামান্য চেহারার পরিচয় দিতে পারলেন। কিন্তু নাম বলতে পারলেন না। তখন খলিফা আবার মহম্মদবিনআবুবকর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বিবি নায়লা বললেন—'তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু হত্যার পূর্বেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন খলিফা আবার জনসম্মুখে ঘোষণা করলেন—"বাকি কেউ যদি ওসমান হত্যাকারীদের জানেন ও চেনেন, তাহলে তিনি যেন অতি সত্বর খলিফাকে অবগত করান। এর জন্য তাঁকে কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না।" অন্যদিকে সমস্ত পাপের মূল, নষ্টের কীট মারওয়ান খলিফার ডাকে সাড়া না দিয়ে কতিপয় সহচরকে নিয়ে বিবি নায়লার কাটা অঙ্গুলি ও খলিফার রক্তাক্ত জামা-সহ স্বয়ং খলিফা আলীকে সায়েস্তা বা বরখাস্ত করার নিমিত্ত সিরিয়া দামেস্কে আমির মুয়াবিয়ার নিকট হাজির হলেন। মুয়াবিয়া সুযোগের সন্ধানে ছিলেন, যাওয়া মাত্রই সানন্দে বরণ করলেন।

খেলাফতের তৃতীয় দিন ঃ

খলিফা মদীনাকে ধীর ও শান্ত করার জন্য যে সমস্ত মানুষ কুফা, বসরা ও মিশর প্রভৃতি স্থান হতে দলে দলে মদীনাতে এসে ভিড় জমিয়েছিল, তাদের নির্দেশ দিলেন আপন আপন দেশে ফেরার জন্য। খলিফার উদ্দেশ্য ছিল মদীনা শান্ত হলে তিনি একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে আবার বিদ্রোহমুক্ত করবেন। দোষীদের শাস্তি বিধান করবেন। সবার ওপর অধঃপতিত ইসলামি আইন-কানুনের পুনঃ প্রবর্তন করবেন। এইরূপ নানা চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। যে বিদ্রোহীগণ একদিন আলীকে খেলাফত গ্রহণ করার জন্য উত্যক্ত করে তুলেছিল, তারাই আজ আবার খলিফার নির্দেশ প্রথম প্রত্যাখ্যান করলো। তারা মদীনা ত্যাগ করতে রাজি নয়। কেননা তারা মদীনা ত্যাগ করলে মদীনা যত তাড়াতাড়ি শান্ত হবে, দোষীগণ তত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে। এই আশঙ্কা বিদ্রোহীগণকে পেয়ে বসেছিল। তাই তাদের বিদ্রোহী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তার দলবল-সহ খলিফার নির্দেশ অমান্য করলো। খলিফা একেবারেই হতবাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন পরিস্থিতি কত মেঘাচ্ছন্ন, পরিবেশ কত পঙ্কিলময়। খলিফার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও যুদ্ধবিরোধী মানুষ ছিলেন। তিনি এই সমস্ত নানা দিক লক্ষ্য করলেন। বদমাইশ বিদ্রোহীগণ তখনই এক বলে, আবার পরক্ষণেই আর এক বলে। কারো কোন চরিত্র বলে কিছুই নেই। এমনকি তালহা যুবাইয়ের মত মানুষগুলোও ঝড়ের সাথে সাথে বাঁশের মত একবার এদিকে, একবার ওদিকে দোল খাচ্ছে। একমাত্র

হযরত আলী তাঁর আপন নীতিতে তাল গাছের মত একাকী দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছেন। এইসব দেখেশুনে ইমাম হাসান মহান পিতাকে পরামর্শ দিলেন —খিলাফত ত্যাগ করতে। আলী উত্তর দিলেন "বাবা দেশের এই দুঃসময়ে খেলাফত ত্যাগ করা কি উচিত কাজ হবে। চেষ্টা করতে দাও। আমাকে আমার বিবেককে মুক্ত হতে দাও।

খেলাফতের চতুর্থ দিন, গভর্নর রদবদল ঃ

খলিফা আলী খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মূল রোগটা কোথায়। দেশে কেন বিদ্রোহ দেখা দিল। সারা দেশে কেন অসন্তোষ দানা বাঁধল। কাদের পাপে কে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এ সমস্ত কিছুর মূলে আছেন অমিতব্যয়ী, অপচয়কারী, আমানতে খিয়ানতকারী প্রাদেশিক গভর্নরগণ। তাঁদের বরখাস্তটাই আগে দরকার।তাহলে দেশ শান্ত হবে, দশ শান্তি পাবে। এই সাধু চিন্তা নিয়েই খলিফা প্রাদেশিক গভর্নরগণের রদবদল করতে প্রস্তুত হলেন।

প্রদেশ	পুরাতন গভর্নর	নতুন গভর্নর
মিশর	আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ আবি সোরাহ	কায়েস বিনসাদআনসারী
বসরা	আব্দুল্লাহ ইবনে আমর	ওসমান ইবনে হানিফ
কুফা	আবু মুসা আশারী	আমর ইবনে হাসান
সিরিয়া	মুয়াবিয়া	সহল বিন হানিফ
ইয়ামেন	লয়ালী বিনমায়েনা	আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

খলিফা এই নতুন ফরমান জারি করেই নবনিযুক্তি গভর্নরগণকে আপন আপন এলাকায় গমনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর এই ফরমান জারি হওয়ার পরই বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ মুগিরাহ ইবনে শোবাদ্রুত খলিফার দরবারে এলেন। এবং খলিফাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন — "সর্বপ্রথম সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।"

আপনার খেলাফত সকলেই মেনে নিক, বিশাল দেশে ঘরে ঘরে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত হোক, বিশাল সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তের প্রদেশগুলোতেও মানুষ আপনার খেলাফতে আস্থাভাজন হোক, অতঃপর শাসনতন্ত্রের রদবদলে হাত দেবেন । তখন আপনার হাত শক্ত থাকবে। শত্রুপক্ষ আপনার শক্ত হাতকে আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু খলিফা আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, অতঃপর মুগিরা ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেলেন মক্কায়।

হজ্জ থেকে ফিরে এলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তিনিও খলিফাকে একই ভাবে বোঝালেন। বললেন —"মুয়াবিয়া সিরিয়াতে অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাকে ওসমান নিযুক্ত করেননি, স্বয়ং ওমর নিযুক্ত করেছিলেন। এই বিশেষ ক্ষণে, অসময়ে তাকে

ঘাঁটাবেন না, তাঁর গায়ে হাত দেবেন না। হিতে বিপরীত হবে। সর্বপ্রথম নিজেকে সামলিয়ে নিন। তারপরও সকলকে একসাথে ধরবেন না।"কিন্তু খলিফা তাঁর মতও গ্রহণ করতে পারলেন না।তিনি বললেন – "আমি মুয়াবিয়াকে আর একদিনও সিরিয়াতে রাখতে চাই না"। বিজ্ঞ আব্দুল্লাহ বললেন– "ও কাজ ভাল হবে না। আপনি মুয়াবিয়াকে সিরিয়াতেই অক্ষুণ্ণ অক্ষত ভাবে থাকতে দিন। তাহলে তিনি আর আপনার খেলাফত নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ইতিমধ্যে আপনি আপনার ঘর সামলিয়ে নিন। নচেৎ তিনি ও সিরিয়াবাসীগণ আপনার খেলাফত নিয়েই ঝামেলা পাকাবে। তখন আপনি কোন দিক সামলাবেন। সুতরাং আগে নিজ খেলাফতকে মজবুত করুন, অতঃপর মুয়াবিয়ার গায়ে হাত দিন। তখন অতি সহজেই অনায়াসে তাঁকে বরখাস্ত করতে পারবেন।

তখন খলিফা বললেন– "মুয়াবিয়ার স্থানে আমি আপনাকেই আমির করতে চাই। আপনি গিয়ে শাসন ভার গ্রহণ করুন। আব্দুল্লাহ বললেন– "আমি ওখানে যেতে পারবো না। আমি আমার মাথাটা হারাতে চাই না। চারিদিকে গোলমাল। চরম বিশৃঙ্খলা। এর মাঝে মুয়াবিয়াকে খুঁচিয়ে লাভ হবে না। লোকসানই হবে। তিনি জনগণকে সত্য মিথ্যা, নানা কথা বলে বিভ্রান্ত করবে । আপনি তো জানেন মুয়াবিয়া চরিত্র কি হেন বস্তু। তিনি কু-পথে, সু-পথে, তাঁর কর্মসিদ্ধির জন্য পারেন না এমন কোন কাজই নেই। যে মানুষের কোন নীতির বালাই নেই, চরিত্রের বালাই নেই। তাঁর সাথে কাজ করতে হলে একটু বুঝে সতর্ক ভাবেই করা দরকার।"

খলিফা বললেন– "কপট, চতুর, চাটুকার মানুষের সাথে নীতি অবলম্বনে কোন কাজ হবে না। তাকে তরবারী দ্বারা দমাতে হবে।" আব্দুল্লাহ বলেন – "মাননীয়, আপনি বীরযোদ্ধা, তবু এ সময় যুদ্ধটা এড়িয়ে চলাই ভাল। আলী— তোমার কথা স্বীকার করি। মহাজ্ঞানী আলী একটা জিনিস ভালোই বুঝেছিলেন, কিন্তু অন্যটি ধরতে পারলেন না। তাঁর প্রথমটি খলিফা ওসমানের চারিপাশে যতসব ধান্দাবাজ ধোঁকাবাজ লোকগুলো আপন আপন স্বার্থ নিয়ে জড় হয়েছিল, সমস্ত গোলযোগের মূল তারাই। দেশের আপামর জনসাধাণের অসন্তোষ বিদ্রোহ ও বুকফাটাক্ষোভের জন্য একমাত্র দায়ী ছিল উমাইয়া বংশের কতকগুলো অসৎ ও উচ্চাভিলাষীগণ। একমাত্র ঐ সমস্ত লোকগুলোই বৃদ্ধ খলিফার বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার ও আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে গেছে। বড় বড় পদ অলঙ্কৃত করেছে এবং অপব্যবহার করেছে আপন আপন ক্ষমতার। তখন দেশের চোখে ছোটি হয়েছেন সৎ-সজ্জন খলিফা। এই পর্যন্ত মহাজ্ঞানী আলী ঠিকই বুঝলেন।

কিন্তু যখনই চিন্তা নিলেন ঐ সমস্ত বদ-দুরাচারস্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীনদের সবার আগে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশকে রাহুমুক্ত করবেন সর্বপ্রথম। কিন্তু তাঁর পদক্ষেপে

ভুল হলো এখানেই। আপন হাতে ক্ষমতা ঠিকমত পাওয়ার পূর্বেই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে গেলেন। পরিস্থিতি পরিবেশ এমনি জটিল ছিল, তিনি ধীর ব্যক্তি হয়েও ধীরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন না। ফলে হিতে বিপরীতই হলো। এরই নাম হয়তো নিয়তি। যা মানুষের হাতের বাইরে থাকে চিরদিন।

নতুন গভর্নর ও নতুন পরিস্থিতি ঃ

কোন মানসিকতাতে মহামানব আলী কয়েকটি নতুন গভর্নর নিযুক্ত করলেন ও কয়েকজনকে বাতিল করলেন। সেই মানসিকতার সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করতে না পারলে হযরত আলীর মত অতুলনীয় ব্যক্তির প্রতি অবিচার করা হবে। সত্য-সূর্য সেখানে ভাষ্য মেঘের আবরণে আচ্ছন্ন হয়েই থাকবে। আমরা সকলেই জানি, হযরত আলী বারবার খলিফা ওসমানকে সতর্ক ও সাবধান করেছিলেন কয়েকজন অসৎ গভর্নর সম্পর্কে। এ নিয়ে মাঝে মাঝে খলিফার সাথে তাঁর বাকবিতণ্ডাও বেধে যেত। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত খলিফা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় খলিফা হযরত আলীর কথায় সম্মতও হতেন, কিন্তু পরক্ষণেই আলীর প্রস্থানের পর তাঁর পারিষদবর্গ তাঁকে আপনাদের কক্ষপথে এনে হাজির করতেন। অধিকন্তু আলী সম্পর্কে নানা সত্যমিথ্যার জাল বুনতেন এবং সেই জাল হতে খলিফা আর মুক্তি পাননি। এই জালে প্রথম বন্দী হলেন, পরে গৃহ বন্দী।

হযরত আলী যখন খেলাফতে এলেন, তখন তাঁর প্রথম কর্তব্য বলে মনে করলেন যে-কথা তিনি বারবার, একাধিক বার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর খলিফা ওসমানোর কানে তুলেছিলেন সেই কথাটিই, তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করে বিবেকের দংশন হতে মুক্তি পেতে চান। যে গভর্নরদের অন্যায় আচরণে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলো, যার ফলে স্বয়ং খলিফা প্রাণ হারালেন। সবার উর্ধ্বে সরল অন্তঃকরণে সেই সমস্ত অসৎ গভর্নরদের অপসারণ করাটাকে তিনি তাঁর প্রথম দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন। বিবেকের তাড়নায় এ দায়িত্বটাকে ফরজ মনেও করেছিলেন। তাই গভর্নর অপসারণের মূলে হযরত আলীর মনে কোন কুটিল রাজনীতি দানা বাঁধতে পারেনি। এতটা দূর্বল মন তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধমানব। কিন্তু তাঁর এই প্রবল সদিচ্ছা দেশ ও জাতির কল্যাণে গেল না, মাত্র কয়েক জনের কুচক্রে এবং পরে তারাই ইসলামের ন্যায়পরায়ণ খলিফা ও গণতন্ত্রকে একের পর এক উভয়কেই বধ করল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই কুচক্রী দলকে কাফের বলতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর কথায় – 'তারা যে শুধু ইসলামের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেই ছেড়েছে তাই নয়, ওটাও কোরআনের দৃষ্টিতে কুফরি বৈ নয়'। 'যে সত্যের

মৃত্যু নেই ; আখতার ফারুক ; অনুবাদ।

১। হামদান ঃ তখন হামদানের গভর্নর ছিলেন জাবির বিন আব্দুল্লাহ। খলিফা তাঁকে বললেন– "তুমি হামদানের মানুষের নিকট আমার নামে বয়াত করিয়ে আমার নিকট মদীনায় ফিরে এসো।" গভর্নর খলিফার কথামত কাজ করলেন।

২। ইয়ামেন ঃ সেখানকার গভর্নর ছিলেন লয়ালী বিন মায়েনা। তিনি খলিফা আলী কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর নিকট পৌছাবার পূর্বেই তিনি মক্কায় চলে আসেন। আব্দুল্লাহ সেখানে হাজির হয়ে খলিফার নামে বয়াত গ্রহণ করেন। জনগণ সানন্দে তাঁকে বরন করলেন।

৩। মিশর ঃ তখন মিশরে গভর্নর ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ। যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেছিলেন। মক্কার মাটিতে যারা মহানবীকে লাঞ্ছনা করেছিল। অতীব মর্মান্তিক ভাবে তাঁর পবিত্র জীবনকে একেবারেই অতিষ্ট করে তুলেছিল। এই নরাধম আব্দুল্লাহ ছিল তাদের অন্যতম। নতুন গভর্নর কায়েস বিন সাদ মিশরের কার্যভার গ্রহণ করলেন। জনগণকে খলিফা আলীর নামে বয়াত করালেন। কায়েস বিন সাদ নিজেও একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।

৪। বসরা ঃ পূর্ব গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর নতুন গভর্নর ওসমান ইবনে হানিফের আগমনের পূর্বেই প্রস্থান করেন। নতুন গভর্নর শাসনভার গ্রহণ করার পর খলিফা আলীর নামে জনগণের বয়াত গ্রহণ করেন।

৫। কুফা ঃ ওখানে গভর্নর ছিলেন আবু মুসা আশয়ারী। নতুন গভর্নর আমর ইবনে হাসান খলিফার নির্দেশে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তালহা বিন খুরশিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে খুরশিদ তঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— তিনি কোথায় যাচ্ছেন, এবং কোন উদ্দেশ্যে। উত্তরে তিনি বললেন তাঁর বক্তব্য। তখন খুরশীদ বললেন বাড়ি ফিরে যান। কুফাবাসীরা আশয়ারীকে বাদ দিয়ে আপনাকে গভর্নর করবে না বা মানবে না। তখন আমর পরিস্থিতি বুঝতে পেরে মদীনায় ফিরে এলেন।

৬। সিরিয়া ঃ তখন গভর্নর মুয়াবিয়া। নতুন গভর্নর সহল বিন হানিফ সিরিয়ার পথে রওনা হলেন। পথিমধ্যে কিছু অশ্বারোহীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা সহলকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন ও কেন। সহল উত্তর দিলে তারা বললেন— "আমরা ওসমানের নিযুক্ত গভর্নর ব্যতীত কাউকে গভর্নর বলে স্বীকার করি না। আপনি এগোতে চাইলে আমরা বাঁধা দেবো।" তখন নিরুপায় সহল মদীনায় ফিরে এলেন।

অতঃপর খলিফা আলী কুফার গভর্নর আশয়ারীর নিকট মাবাদ আসলামিকে

দূত রূপে পাঠালেন। আশয়ারী খলিফা আলীকে জানিয়ে দিলেন— কুফার অধিকংশ মানুষই আপনাকে খলিফা বলে মেনে নিয়েছে। বাকিরাও মেনে নেবে। এখানে খলিফা নিশ্চিন্ত হলেন।

অতঃপর খলিফা জাবির বিন আবদুল্লাহকে আনুগত্যের নির্দেশপত্র-সহ সিরিয়ার গর্ভনরের নিকট পাঠালেন। মুয়াবিয়া, দীর্ঘদিন খলিফার দূতকে আপন দরবারে রেখে দিলেন। পরিশেষে নিজের দূত-সহ ঐ দূতকে একটি পত্র-সহ খলিফার নিকট পাঠালেন। মুয়াবিয়ার দূত খলিফার নিকট পত্রখানি হাজির করে দিলেন। দূত পত্রখানি খলিফার নিকট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের সম্মুখেই দরবারেই পত্রটি খুললেন।

দেখলেন— খামের মধ্যে কোন চিঠি নেই। অথচ খামের ওপরে লেখা আছে— "মুয়াবিয়ার তরফ হতে হযরত আলীর নিকট"। দরবারেসকলেই এমনকি মুয়াবিয়ার আপন দূতও দেখলেন মুয়াবিয়ার কাণ্ডকারখানা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, ধৃষ্টতা, কপটতা, চতুরতা, চাটুকারিতা, সবার ঊর্ধ্বে অমানবিকতা। খলিফা আলী যথেষ্ট বিরক্ত হলেন । এবং দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন সিরিয়ার অবস্থা সম্পর্কে। দূত তাঁর মুখস্থ কথাগুলো বলে গেলেন— "সিরিয়ার কেউই আপনার আনুগত্য স্বীকার করবে না। তারা রাতদিন খলিফা ওসমানের জন্য কাঁদছে। পঞ্চাশ হাজার সবল মানুষ খলিফা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। তারা শপথ নিয়েছে ঐ শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের তরবারি কোষবদ্ধ করবে না।"

ঐ দরবারে উপবিষ্ট একজন বিশিষ্ট সাহাবী দূতের ঐ বাগাড়ম্বরে ঠিক থাকতে না পেরে বলে উঠলেন "হে সিরীয় দূত। তুমি কি তোমাদের সৈন্যবাহিনীর আস্ফালন করে আমাদের ভয় দেখাতে চাও ? তোমরা জেনে রেখো খলিফা ওসমানের রক্তমাখা জামা হযরত ইউসুফের জামা নয়। আর কপট মুয়াবিয়ার শোকও পুত্রহারা ইয়াকুব নবীর শোকও নয়। আরো জেনে রেখো — সিরিয়ায় যদি হযরত ওসমানের জন্য শোক করার লোক থাকে, তাহলে ইরাক ও সারা দেশে তাঁর নিন্দা করার লোকেরও অভাব নেই।"

তখন মুয়াবিয়ার দূত ভয়ে কেঁপে উঠলেন —তিনি বুঝতে পারলেন তাঁদের ছল-চাতুরি সকল কিছুই ধরা পড়েছে। তাই প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং আর্জি করলেন খলিফার নিকট — "দূত সর্বক্ষেত্রেই অবধ্য।" খলিফা বললেন — হক কথাই। তোমাকে মুক্তি দিলাম। তবে জেনে রেখো—"আল্লাহ্‌র কৌশল সকল কৌশলকারীর সকল কৌশলের ওপরে।" ৩ ঃ ৫৪, ৮ ঃ ৩০, ১৪ ঃ ৪৬, ৮৬ ঃ ১৫-১৭। তখনও বিদ্রোহী অনেকেই মদীনাতেই ছিল। তারা মুয়াবিয়ার দূতকে হত্যা করতে উদ্যত হলে খলিফা তাকে রক্ষা করেন। এমনকি খলিফা তাকে

নির্বিঘ্নে সিরিয়াতে পৌঁছাবারও ব্যবস্থা করেন এবং পৌঁছিয়ে দেন। হযরত আলীর মানবতা ছিল এমনি উচ্চমার্গের। খলিফা এখন বুঝতে পারলেন কপট মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সেখানে আল্লাহ্‌, রসুল, কোরআন, হাদিসের কোন মূল্যই নেই, যেখানে যে কোন মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবতা, বিবেক ও বিবেচনা ষড়রিপুতে রাহুগ্রস্ত, যেখানে মানুষ পশুর ক্ষুধায় ধাবমান, যেখানে মানুষ জ্ঞানচক্ষুর মাথা খেয়ে জ্ঞানান্ধের গতিতে বেগবান, যেখানে বিবেকবান মানুষ বিবেকের মাথা খেয়ে বর্বরের ভূমিকায় পাষণ্ডের পাঠ করে, সেখানে হযরত আলী তো দূরের কথা আল্লাহর কথাও অবান্তর হয়।

মহান আলীর খেলাফত আরম্ভ হলো ভীষণ দ্বন্দ্বে, এবং দ্বন্দ্বেই পরিসমাপ্তি, মৃত্যুর বিভীষিকাময় দ্বারেও মহান আলী ছিলেন — সত্য ও ন্যায়ের চির আপসহীন চিরনির্ভীক চির সংগ্রামী সার্থক মুজাহিদ।

মদীনার অবস্থা ঃ

খলিফা আলী ও আমির মুয়াবিয়ার মধ্যে যে পত্র চালাচালি হচ্ছিল মদীনাবাসীগণ সকলেই তা জানতেন। শুধু যে জানতেন তাই নয়, দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের যে দারুণ অবনতি ঘটেছে তাও জানতেন। অর্থাৎ মানসিকতার দিক থেকে মদীনাবাসীগণ এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে বাস করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করছিলেন যখন যাবতীয় মোহাজেরিন ও আনসারগণ আলীর হাতে বয়াত করার পরও মুয়াবিয়া বয়াত করলেন না, অধিকন্তু পত্র দ্বারা যেভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন, সেখানে আলীর পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই। ঠিক এই পরিস্থিতিতে হযরত আলীকে মুয়াবিয়া বাধ্য করলেন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে।

মদীনাতে তখন মোটামুটি তিন শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাই। প্রথমত, অধিকাংশ মানুষই ছিল আলীর পক্ষে ও মুয়াবিয়ার বিপক্ষে, দ্বিতীয়ত, অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ নীরব ছিল। এরূপ মানুষ সর্বকালে সর্বসমাজে চিরকালই থাকে, যারা কোন একটা ঝুটঝামেলায় যেতে চায় না। তৃতীয়ত, কিছু সামান্য মানুষ ছিল, যারা বিগত খলিফার পারিষদবর্গের নিকট হতে সময়ে অসময়ে পরিত্যক্ত মাংসহীন হাড় চোষার সুযোগ পেতো, তারা ওসমান হত্যার প্রতিশোধের নামে মনে মনে মারওয়ান তথা মুয়াবিয়াকে সমর্থন করতো।

তালহা ও যুবাইর ঃ

ঐ তিনটি দলকে বাদ দিলে মদীনার তামাম লোকের মধ্যে দুটি বিশেষ লোক ছিলেন — তালহা ও যুবাইর। যাঁরা মাছ ধরতে চাইলেন, কিন্তু কাদা মাখতে চাইলেন না। খেলাফত গ্রহণ করার জন্য তাঁদের দু'জনকেই সকলে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজ যখন সমস্যা চারিদিকে ঘনীভূত রূপ নিয়েছে, তখন তাঁরা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" এমন গোছের নীতি গ্রহণ করলেন। তাঁরা খলিফা আলীর নিকট পূর্বেই অনুমতি চেয়েছিলেন বসরা-কুফা প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার জন্য। তখন আলী অনুমতি না দেওয়ায় তাঁরা যেতে পারেননি। এবার ধর্মীয় ছলনা বলে পার পেলেন। 'উমরাহ' পালন করার জন্য মক্কা যাওয়ার অনুমতি পেলেন। এবার আমরা লক্ষ্য করবো তাঁরা 'উমরাহ' পালন করার ছদ্মবেশে ও নামে কি পালন করলেন। মদীনাতে হযরত আলীর হাতে বয়াত হয়ে গেলেন এবং মক্কাতে গিয়ে বয়াতের মূল্য কতখানি রাখলেন। কি ভীষণ পরিতাপ।

মহানবীর এই দুই বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী যদি ঐ সময় একনিষ্ঠভাবে আন্তরিকতার সাথে অবতীর্ণ হতেন, তাহলে পরিস্থিতি এইরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করতো না। এই দু'জন বয়স্ক সাহাবী সেদিনের ভয়াবহ অবস্থাকে আয়ত্তে আনার পরিবর্তে ভিতরে ভিতরে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খলিফা হওয়া যায় কিনা তা আন্দাজ করছিলেন বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। তাঁরা যেন ভুলে গিয়েছিলেন মহানবীর সেই মহামূল্য বাণী —"কার্যাবলী উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিকৃত ঘটনা প্রকৃত ইতিহাস

বিবি আয়েশা মক্কায় ঃ

যখন মদীনাতে খলিফা ওসমান শহীদ হন, তখন বিবি আয়েশা হজ্জ উপলক্ষে মক্কাতে ছিলেন। এখনকার দিনের মত তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত না থাকায় দেশের এক প্রান্তের ভয়াবহ সংবাদও অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে বেশ সময় লাগতো। এর সুফলও যেমন ছিল, কুফলও তেমন ছিল। যাই হোক বিবি আয়েশা মক্কা হতে মদীনা আসার পথে জানতে পারলেন দুটি সংবাদ। একটি খলিফা ওসমান হত্যা ও অন্যটি হযরত আলীর খলিফা হওয়া। এই ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে বিবি আয়েশা বিলক্ষণ মদীনা প্রত্যাবর্তন না করে আবার মক্কাতেই ফিরে গেলেন। ঐদিন কিন্তু বিবি আয়েশা যদি মক্কা প্রত্যাবর্তন না করে মদীনা প্রত্যাবর্তনই করতেন, তাহলে ইসলামের ইতিহাস অন্যরূপে লেখা হতো। কেননা তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা বাস্তব রূপ নিতো মদীনাতেই। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্রোহীগণ শাস্তি পাক। কিন্তু যখনই আবার মক্কাতে ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধু উদ্দেশ্য কতকগুলো অসাধু মানুষ দ্বারা ঘোরপাক খেয়ে গেল।

বিবি আয়েশা মক্কাতে ফিরেই বললেন – "এ জঘন্যতম কাজ করেছে বিদ্রোহীগণ ও মদীনার ক্রীতদাসগণ। তাদের বক্তব্য ছিল – খলিফা যাঁদের প্রাদেশিক গভর্নর করেছেন, তাঁরা একেবারেই অসৎ মানুষ। আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত হারাম করেছেন, তারা তাই করলো। যে নগরীতে আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে হিজরত করালেন, তারা সেখানে রক্তপাত করলো। যে পবিত্র মাসে রক্তপাত ও হত্যা নিষিদ্ধ, তারা সেই মাসে তাই করলো। লুটপাট করা মহা অন্যায়, তারা তাও করলো। খলিফা ওসমানের একটি অঙ্গুলি তামাম বিদ্রোহীগণ অপেক্ষা উত্তম। তোমরা সকলে মজলুম খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ইসলামে ন্যায়ের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করো।"

বিবি আয়েশা যে বক্তব্য রাখলেন, তা খুবই সত্য। কিন্তু যে পথ ধরলেন, তা তাঁকে তাঁর সঠিক গন্তব্যস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করল না। তাতে ইসলামের আরো অধিক ক্ষতি হলো। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাজারে হাজারে মানুষ তাঁর পাশে একত্রিত হলো। একে তো খুনের বিষয়, তাতে আবার স্বয়ং খলিফা খুনের বিষয়, যেখানে বক্তা স্বয়ং বিবি আয়েশা। মাছির মত মানুষ জড়ো হলো। স্বয়ং মক্কার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হজরমী বলে উঠলেন – আমিই প্রতিশোধ গ্রহণের প্রথম ব্যক্তি।" ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন সদ্য মদীনা হতে প্রত্যাগত উমাইয়াগণ। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মক্কার শাসনকর্তার সাথে মিলে

গেলেন। এঁদের সাথে যোগ দিলেন আরো দু'জন সদ্য পদচ্যুত অসৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তা – বসরার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং ইয়ামেনের লয়ালী বিন মায়েনা। এঁরা বর্তমান খলিফা হযরত আলীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি-সহই মক্কায় এসেছিলেন। এক একজন অতি অন্যায়ভাবেই সরকারী বাইতুলমাল হতে ছ'শো উট ও দু লক্ষ দিনার ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে মক্কাতে পালিয়ে যান। এঁরা বিবি আয়েশার দলে যোগদান করলেন, ওসমান হত্যার প্রতিশোধের নামে খলিফা আলীর বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম চালাতে। যেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ল। এরা ছিল দুই অসৎ পদচ্যুত গভর্নর।

ঠিক এই সময়েই খলিফা আলীর নিকট হতে হজের 'উমরাহ' করার জন্য মক্কায় পৌঁছালেন প্রবীণ সাহাবী তালহা ও যুবাইর। বিবি আয়েশা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন – "আপনারা এখন মক্কা এলেন কেন ?" তাঁরা উত্তরে বললেন – "মদীনা বর্তমানে ভদ্র ও ধার্মিক লোকের জন্য বসবাস উপযুক্ত নয়, ওখানে বিদ্রোহী প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই আমরা ভয়ে পালিয়ে এলাম।" একবারও দু'জনের মধ্যে একজনেরও মুখ দিয়ে 'উমরাহ' বা সত্য কথা বের হলো না। এইভাবেই আমরা লক্ষ্য করছি ঘটনাস্রোতে ঘটতে থাকলো এক, এবং রটনা হতে থাকল অন্য এক। তখন বিবি আয়েশা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন – "আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারিণী, আপনারা কি আমার সাথে যোগ দেবেন ? তাঁরা সানন্দে উত্তর দিলেন – হ্যাঁ।

এই ব্যাপারটিতে বিবি আয়েশা ছিলেন তালমিছরীর ভিয়েনে যেন এক খী সুতো স্বরূপ। তালহা ও যুবাইর তাঁর সাথে জড়িত হওয়ার পর মক্কার সাধারণ ও অসাধারণ সকল মানুষই যেন ভাবতে থাকল – তাঁদের মত মদীনার প্রবীণ সাহাবী যখন মা আয়েশার সাথে যোগদান করলেন, তাঁরাই বা করবেন না কেন। অতঃপর বিবি আয়েশা তালহা ও যুবাইরকে এবং ঐ দুই প্রাক্তন অসৎ গভর্নরকে সৈন্য পরিচালনার জন্য অভিযানের ভার দিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় – ঐ দুই প্রবীণ সাহাবী একবারও বিবি আয়েশাকে বললেন না যে, আপনি প্রথম একবার বর্তমান খলিফা আলীর সাথে বসুন। এই প্রথমাবস্থায় একবার যদি বিবি আয়েশাকে কেউ খলিফা আলীর সাথে বসার ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলে আর যাই হোক এত খুনোখুনি হতো না।

জানি না তালহা, যুবাইর ও বিবি আয়েশার মনের কোণে যে কোনদিক থেকেই হযরত আলী সম্পর্কে কোন দুর্বলতা ও জটিলতা বা Reservation ছিল কিনা।

বিবি আয়েশার অভিযান ঃ

বিবি আয়েশার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীদের দমন করা। তিনিই ছিলেন অভিযানের প্রাণপুরুষ না বললেও প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। পরিচালনা করছিলেন চারজন – তালহা, যুবাইর, লয়ালী বিন মায়েনা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর। বিবি আয়েশার ইচ্ছা ছিল বিদ্রোহীগণ শাস্তি পাক। বাকি দু'জনের সুপ্ত আকাঙ্খা ছিল – খেলাফত পেলে ভাল হয়, শেষ দু'জনের বাসনা ছিল – গভর্নরশিপ ফেরত পাওয়া।

অভিযান কোন পথে পরিচালিত হবে – তা নিয়ে এক একজন এক একরকম ফাতোয়া দিতে থাকলেন। একজন বললেন মক্কা হতে মদীনা, তারপর সিরিয়া গমন, "বসরার পদচ্যুত গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবন আমর বললেন সিরিয়াতে আমাদের আমির মুয়াবিয়া আছেন, সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের বসরা যাওয়া উচিত। সেখানে আমার বহু বন্ধু-বান্ধব আছে, অধিকন্তু তালহার অনেক ভক্তবৃন্দ আছে, ওখানে গেলেই আমরা সহজেই সফলতা লাভ করবো।" অন্যজন বললেন – "আমরা মক্কাতে থেকেই বিদ্রোহীগণের মোকাবিলা করতে পারি।" তখন আবার আব্দুল্লাহ বললেন – "মক্কাবাসীগণ তো আমাদের সাথেই আছে, তারা বিদ্রোহীগণকে একাকী ঠেকাতে পারবে না, আমাদের উচিত বসরা যাওয়া এবং তাদেরকে সঙ্গে নেওয়া। তাহলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আমরা সফল হবো।" এঁর কথা সবার মনঃপূত হলো। অতঃপর বসরা অভিযানের প্রস্তুতি জোরকদমে চলতে থাকলো।

এই সময় আব্দুল্লাহ বিন ওমর মক্কাতেই ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন – "আমি মদীনাবাসীদের সঙ্গেই আছি ও থাকবো।" বসরা অভিযানেব প্রস্তুতি একেবারেই সম্পূর্ণ। বিবি আয়েশার সাথে অন্যান্য নবী-পত্নীগণও মক্কাতে ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর তাঁর ভগিনী ও মহানবীর পত্নী বিবি হাফশাকে বসরা যেতে নিষেধ করায় তিনি বিবি আয়েশাকে জানিয়ে দিলেন তাঁর বসরা যাওয়ার অক্ষমতা। বিবি আয়েশা জানতেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর সমগ্র আরবের মধ্যে একজন সৎ ও সাধু পুরুষ। তিনি কেন বসরা অভিযানে যোগদান করলেন না, এই জিজ্ঞাসা বিবি আয়েশাকে বারবার আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত করতে থাকলো। কিন্তু তিনি বহু দুষ্টজনের চাপে পড়ে আবার মনস্থির করলেন বসরা অভিযানে। ব্যর্থ হলেন বিবেকের ডাকে।

বিকৃত ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস এবার শুরু হলো। বসরা অভিযানে আরবের মহান চরিত্র আব্দুল্লাহ যোগদান করলেন না, কিন্তু অন্য একজন গোপনে যোগদান করলেন। যিনি ছিলেন হযরত ওসমান হত্যার মূল কারণ, যিনি ছিলেন নাটের গুরু,

নষ্টের কীট। তাঁর নাম মারওয়ান। বৃদ্ধ খলিফাকে বিপথগামী করার পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন তিনিই। মদীনা যখন অস্থির, আকাশে-বাতাসে যখন বিদ্রোহের তরঙ্গ প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত, তখন তিনি গোপনে মদীনা ত্যাগ করে মক্কা গমন করে আত্মগোপন করেন। সুযোগ বুঝে বসরা অভিযানের সঙ্গী হলেন। এই দলের ঐ দুই পদচ্যুত গভর্নর ছিলেন তাঁরই ইঙ্গিতবাহী দাসানুদাস। তিনিই একদিন বৃদ্ধ খলিফাকে ভুল বুঝিয়ে এই সমস্ত অসৎ অপদার্থগুলোকে নিযুক্ত করিয়েছিলেন। সেই খলিফা দরবারের ভাঁড় ও কুচক্রের সারথি মারওয়ানের কুটচালকে অনুধাবন করা ও তার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মত শক্তি ঐ অভিযানের কারো ছিলো না। সুতরাং অভিযানের মূল উদ্দেশ্য সকলেরই অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে পাক খেয়ে গেল, পরিবর্তিত হলো। মারওয়ান জীবন-মরণপণ করে আত্মনিয়োগ করলেন এই মহা সুযোগকে, এই অভিযানকে আঁপন স্বার্থে কাজে লাগাতে। মদীনাতে খলিফা আলীর নিকট কক্ষে না পেয়ে এই অভিযান আরো একজন যোগদান করলেন মুগিরা বিন শোবা।

এককথায় খলিফা ওসমানের আমলের পদচ্যুত অসৎ গভর্নরগণ ও খলিফার অসৎ পরামর্শদাতাগণ ও তাঁর তথাকথিত করে খাওয়া পারিষদবর্গ বিবি আয়েশার নেতৃত্বে এই অভিযানটিকে একটি মহা সুযোগ রূপে গ্রহণ করলো। তাঁরা বিবি আয়েশার ছত্রচ্ছায়ায় আপন আপন অভিসন্ধি ও দুরভিসন্ধিকে কাজে লাগাবার জন্য অভিযানকে প্রাণপণে সাহায্য করলেন। কয়েকজন পদচ্যুত গভর্নর বিদায়কালে বহু অবৈধ ধন-রত্ন সঙ্গে এনেছিলেন। অভিযানের কলেবর বৃদ্ধিকল্পে সেগুলো জনসাধারণের মধ্যে দরাজ হস্তে বিতরণ করলেন। অথচ বিবি আয়েশাকে বোঝানো হলো তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব দিয়ে বিবির অভিযানকে সার্থক করতে চলেছেন। কেননা তারা জানতো বিবি আয়েশাকে বাদ দিলে এ অভিযানের কোন মূল্যই নেই। তাঁরা ফলাও করে জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করলে বিবি আয়েশা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে অভিযান পরিচালনা করছেন, জনগণ দলে দলে যোগদান করো। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দিলো ধন-রত্ন, টাকা-পয়সা। তখন আর কাকেরও অভাব হলো না। এই সময় ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মক্কা আসেন। আরো কিছু মানুষ। তাঁরা লক্ষ্য করলেন কি নির্জলা ধাপ্পাবাজি চলছে। তখন অসহ্য হয়ে আব্দুল্লাহ বিস্তারিত জানিয়ে মদীনাতে খলিফা আলীর নিকট একটি পত্র দিলেন। তাও গোপনে।

আপন আপন স্বরূপ প্রকাশ ঃ

মক্কা হতে অভিযান বেশ কিছুদূর আসার পর নামাজের সময় হলে মারওয়ান আযান দিলো। এবং সুন্নত পড়ার পর তালহা ও যুবাইরকে জিজ্ঞাসা করলো— আপনাদের কে ইমামতি করবেন। তখন যুবাইরের পুত্র বলল – 'আমার পিতা'।

তড়াক করে তালহার পুত্র বলে উঠল — সে কি ! আমার পিতাই ইমামতি করবেন। আরম্ভ হয়ে গেল ভাবী খলিফা পদের অন্তর্নিহিত বাকযুদ্ধ। প্রকৃত স্বরূপ প্রথম উদঘাটিত হলো। এমনকি কেউই আপন দাবি ছাড়লেন না। ইমামতি পেতেই হবে (ইমামতির জন্যই অভিযান)। এমনকি বিবদমান দলের বিবাদের ঝড় বিবি আয়েশার কর্ণগোচরও হলো। তিনি হতবাক হলেন, বিরোধের এই সর্বনিম্ন পর্যায়েই তিনি বিস্ময়বোধ করলেন। তাঁকেই হস্তক্ষেপ করতে হলো। যুবাইর ইমামতির ভার পেলেন। তখন তালহা নানা অজুহাতে একাকী নামাজ পড়লেন। তবুও যুবাইরকে ইমামরূপে মেনে নিলেন না। বিবি আয়েশাও এতে কম বিব্রত বোধ করেন নি।

এবার স্বরূপের দ্বিতীয় কথা। প্রবাদ আছে — চুলোর মুখ দিয়ে ছাই ছাড়া কিছুই বের হয় না, মনের কথা অনেক সময় আপনা-আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। নাটের গুরু মারওয়ান হঠাৎ এঁদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমরা যদি যুদ্ধে জিতি, তাহলে আপনাদের মধ্যে কে খলিফা হবেন ? যুবাইর বলেন — "বিবি আয়েশা যা বলবেন' (অর্থাৎ তিনি আমাকেই বলবেন)। সঙ্গে সঙ্গে তালহা বলেন — 'না না, জনগণ যাঁকে চাইবে'। এইসব কথা কাটাকাটি অনেকেই শুনলেন। বহু মানুষ বিরক্ত হলেন। বহুজন বলতে থাকলেন— 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, কি জন্য যাচ্ছি। আমাদের কি বলে আনা হয়েছে। আর এখন কি আলোচনা চলছে।" প্রথম সাঈদ বিন আস মুখ খুললেন — "আপনাদের উদ্দেশ্য আমরা বুঝে ফেলেছি। এ অভিযান খেলাফত দখলের জন্য, অন্য কিছু না। আর আমি আপনাদের সাথে এই মিথ্যা অভিযানে এক পাও যাবো না। তখন মুগিরা বিন শোবা ও আব্দুল্লাহ বিন খালিদও ঐ একই কথা বলে বিদায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বনি সকীফের বহু ব্যক্তি দল হতে বের হয়ে পালিয়ে এলেন। তখন মহানবীর পত্নীগণ, যাঁরা বিবি আয়েশার নেতৃত্বে অভিযানে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরাও বিবি আয়েশাকে জানিয়ে দিলেন — "আমরা আর আপনার সাথে সহগামিনী হতে রাজি নই। আমরা বুঝতে পারলাম এটা প্রতিশোধ গ্রহণের অভিযান নয়, অভিনয় মাত্র, ষড়যন্ত্রের অভিযান"। যাঁরা বিবি আয়েশাকে ত্যাগ করলেন — তাঁরা বারবার বললেন — "আমরা তো খেলাফতের ব্যাপারে কোথাও যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি প্রতিশোধ গ্রহণে। বিদ্রোহীদের দমন করতে। কিন্তু এই অভিযান আমাদের প্রতারণা করেছে।" এই সত্য অনুধাবন করার পর মহানবীর পত্নীগণ শিশুর মত সকলেই ক্রন্দন করে উঠলেন। কিন্তু বিজ্ঞ বিবি আয়েশা নিজে একজন অসাধারণ হয়েও সাধারণের চোখেও উদ্ভাসিত সত্য কেন যে অনুধাবন করতে পারলেন না, সেইটাই চির রহস্য রয়ে গেল।

অতঃপর বাকি সেনাদল আবার সম্মুখে এগিয়ে চলল। যখন তারা 'হোয়াব'

নামক একটি ঝরনার নিকট হাজির হলো হঠাৎ সেখানকার কুকুরগুলো ভীষণ ভাবে চিৎকার আরম্ভ করলো। বিবি আয়েশা অস্থির হয়ে উঠলেন, সকলকে অনুরোধ করলেন তাঁকে এখনই এখান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হোক। নিজ উটকে তিনি সজোরে চেষ্টা করলেন অন্যদিকে চালনা করার জন্য। তখন বিশেষ কয়েকজন বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন — "আপনি এখান হতে এখনই অন্যদিকে যেতে চাচ্ছেন কেন। তখন তিনি বললেন — "আমি ও নবীজীর অন্যান্য পত্নীগণ একবার এই (হোয়াব) স্থানে তাঁর সঙ্গে এসেছিলাম। তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তোমরা কোন এক সময় সদলবলে এখানে পৌঁছবে, তখন তোমাদের মধ্যে একজনকে দেখে এখানকার কুকুরগুলো অত্যন্ত চিৎকার করতে থাকবে। তোমরা সতর্ক হয়ো তখন। আমি আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে রাজি নই। তোমরা আমাকে অন্যত্র যেতে দাও।" নিজ উটকে সজোরে আঘাত করলেন, এবং নিজেও কাঁদতে থাকলেন।

অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠলে অভিযানের বা মূল অভিসন্ধির কর্তাগণ প্রমাদ গুনলেন। কেননা বিবি আয়েশাকে বাদ দিয়ে এ অভিযানের কোন মূল্যই নেই। সেটা তাঁরা সকলেই জানতেন। তাঁরা সকলেই একত্রিত ভাবে পরামর্শ করলেন যে কোন ভাবেই ছলে-বলে-কৌশলে বিবি আয়েশাকে সম্মত করতেই হবে। সেই ভাবে তাঁরা তাঁর নিকট হাজির হয়ে তাঁকে বোঝালেন – এটা ঐ রাস্তাই নয়, যে রাস্তাতে হোয়াব নামক ঝরনাটি পড়ে। সকলেই তাঁকে বারবার বোঝাতে থাকলেন। এমনকি ধুরন্ধর মারওয়ান স্থানীয় কয়েকজনকে অর্থের বদলে শিখিয়ে-পড়িয়ে জাল অভিনয়টি ভালভাবেই করিয়ে দিলেন। বিবি আয়েশার সম্মতিও পেয়ে গেলেন। এ সবেই ছিল মারওয়ান সিদ্ধহস্ত। এটাই ছিল মারওয়ান চাল। এই চালেই একদিন খলিফা ওসমান শহীদ হলেন। নচেৎ মিশর পথে যখন খলিফার সিলমোহর করা পত্র ধরা পড়লো, এবং পরে দেখা গেল বা প্রমাণ হলো—দূত খলিফার, উট খলিফার, সিলমোহর খলিফার, কিন্তু খামের ভিতর পত্রটি খলিফার নয়। পত্রটি ছিল সব চক্রান্তের গুরু মারওয়ানের। তখন ঐ একজন পাপীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিলেই তো সারা দেশ রক্ষা পেতো, এবং খলিফাও প্রাণে বেঁচে যেতেন। কিন্তু খলিফা যে কোন কারণেই হোক চক্রান্তের মূল স্রোতটি নির্মূল করলেন না। ফলে একদিন চক্রান্তের নদী সারা দেশকে প্লাবিত করে তুললো মহাচক্রান্তের নোংরা পানিতে।

যাই হোক মহানবীর পত্নী বিবি আয়েশা ঐ মহাচক্রান্ত থেকে বের হতে পারলেন না। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী বিবি আয়েশার জীবনেও ব্যর্থ হলো। কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করল। বসরার কাছাকাছি একটি স্থানে অভিযান দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর

বিবি আয়েশা বসরার পদচ্যুত গভর্নর আব্দুল্লাহকে পত্র-সহ বসরা পাঠালেন। জানতে চাইলেন তাঁদের বক্তব্য। তখন বসরায় ছিলেন হযরত আলী নিযুক্ত গভর্নর ওসমান বিন হানিফ। তিনি বসরার কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষকে বিবি আয়েশার নিকট প্রেরণ করে তাঁর আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। বিবি আয়েশা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন হযরত ওসমান হত্যার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। আমি তাকে পুনরুদ্ধার করতে চাই, বিদ্রোহীদের বা হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে চাই। অতঃপর তাঁরা তালহা ও যুবাইরের নিকট হাজির হয়ে তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। তাঁরা হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বললেন। এবং সাথে সাথে এমন কিছু বললেন— যা শুনে তাঁরা প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন, আপনারা কি হযরত আলীর হাতে বয়াত করেননি। তখন তাঁরা বললেন সে তো জোরপূর্বক ঘটনা। বসরার নেতৃবৃন্দ তালহা ও যুবাইরের অন্তরের গুপ্ত কামনা ও ছলনা বুঝতে পেরে প্রস্থান করলেন। অতঃপর তাঁরা ফিরে গিয়ে গভর্নর ওসমানকে সব কথা খুলে বললে তিনি হতবাক হয়ে বলে উঠলেন এটা একটা পূর্ণ ষড়যন্ত্র, অভিসন্ধি খলিফা আলীর বিরুদ্ধে।

অতঃপর তিনি গভর্নর হিসাবে আপন দায়িত্ব পালন করার জন্য বসরার বিশেষ মানুষদের সাথে আলোচনার জন্য তাঁদের ডাক দিলেন। সমবেত জনতাকে তিনি সব কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন— এখন আমাদের কর্তব্য কি। অধিকাংশ মানুষ ঝামেলাতে জড়াতে না চেয়ে বললেন—' আমরা নীরব ও নিরপেক্ষ থাকবো। তখন গভর্নর বললেন আমি একটি দায়িত্বশীল পদে আছি, আমি তো নীরব ও নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। আমি খলিফা আলীর আগমন বা বার্তা না পাওয়া পর্যন্ত ওদের বসরা প্রবেশে অনুমতি দিতে পারি না, বরং বাধাই দেবো।" অতঃপর জনগণ চলে গেল।

অতঃপর গভর্নর বসরাবাসীগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য মসজিদে একত্রিত হতে বললেন। তাঁদের গভর্নর ওসমান বললেন— "হে জনগণ ! আমরা ঐ অভিযানকারীদের নিকট গিয়েছিলাম। বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছি— তাঁর আগমনের হেতু কি। তাঁর উত্তর সংক্ষেপে খলিফা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ঐক্যকে ফিরিয়ে আনা। আমরা তাঁকে বলেছি—"বসরাতে হত্যাকারীদের নাম নিশানা নেই। সুতরাং আপনি যা চান. তার জন্য বসরা অভিযান নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর প্রবীণ সাহাবী তালহা ও যুবাইরকে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা বলেছেন— তাঁদের উদ্দেশ্য হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষা, যেহেতু মদীনা এখন সন্ত্রাসময় হয়ে উঠেছে। তাদেরও ঐ একই কথা বলেছি, এবং আরো জানিয়ে দিয়েছি— বর্তমানে মক্কা পশুপক্ষীর জন্যও নিরাপদ

স্থান নয়। সুতরাং নিরাপদ স্থানের সন্ধানে মক্কা হতে বসরা আসা অর্থহীন। এ যেন ফল ফেলে ঘাস খাওয়া। অতএব আমরা মনে করি— ঐ অভিযানে যে যেখান থেকে এসেছেন, তাঁকে সেখানেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কায়সের এই কথা শোনা মাত্র যুবাইরের এক ভক্ত বলে উঠলেন— তারা এখানে আসতে চাইছেন, আমাদের কাউকে হত্যাকারী মনে করে নয়, বরং তাঁরা এখানে আসতে চাইছেন আমাদের সাহায্য পেতে হত্যাকারীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। এই কথা শোনার পর জনগণ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

ঘটনা যখন মুখোমুখি হলো ঃ

ঘটনা এবার মুখোমুখি হলো। নব রক্তপাতের নতুন সূচনা দেখা দিল। গভর্নর ওসমান একটি ছোট্ট বাহিনী তৈরি করলেন কেবল মাত্র আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। বিবি আয়েশা বিপুল বাহিনী-সহ নদীর নামক স্থানে আস্তানা গাড়লেন। গভর্নর ওসমান তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বিবি আয়েশার বিশাল বাহিনীর গতিপথে দাঁড়ালেন। অসম বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে নয়, একটা মীমাংসার পথ ধরাই ছিল তাঁর একান্ত বাসনা। যার জন্য তিনি প্রসিদ্ধা এক তাপসী মহিলা জারিয়াকে বিবি আয়েশার নিকট প্রেরণ করলেন। তাপসী জারিয়া সমস্ত কথা বিজ্ঞ বিবি আয়েশাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করে কিছু করা যায় কিনা। উত্তরে আয়েশা বললেন— কখনও না। তখন তিনি পবিত্র কোরআনের ঐ স্থানটি তুলে ধরলেন, যেখানে মহিলাদের পর্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ২৪ : ৩০, ৩১ : ৩২, ৩৩ : ৫৩-৫৫। বিবি আয়েশা অন্তরে কিছুটা অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর মহীয়সী জারিয়া তাঁকে শতবার অনুরোধ করতে থাকলেন— আপনি যদি সৎ উদ্দেশ্যে যাত্রা করে থাকেন, তাহলে একবার দয়া করে মদীনায় যান, সেখানে খলিফা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় আছেন, তিনি আপনাকে একবার পেলে সব বুঝিয়ে দেবেন, আপনিও বুঝে যাবেন। এসব রেখে আপনি দয়া করে একবার মদীনা যান। মহীয়সী জারিয়া তালহা ও যুবাইরের মূল উদ্দেশ্যও তুলে ধরেছিলেন বিবি আয়েশার নিকট। এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মহানবীর ঐ বিখ্যাত বাণী— 'কার্যাবলী উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।'

কি জঘন্যতম ঘটনা। কি নিদারুণ পরিহাস। যখন বিবি আয়েশা ও জারিয়ার মধ্যে এইসব কথোপকথন নিবিড়ভাবে চলছিল, ঠিক সেই সময় মারওয়ানের গভীর প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর ডান দিক থেকে এগিয়ে এলেন তালহা। আল্লাহ্ ও রসুলের প্রশংসা করে খলিফা ওসমানের গুণকীর্তন করে যুদ্ধের আহ্বান দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর বাম দিক থেকে যুবাইর তাঁকে সমর্থন জানালেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। বিবি আয়েশা অবাক। কিছুটা যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী হোয়াব ঝরনার কথা মনকে কিছুক্ষণের জন্য আবার আলোড়িত করলো, দেহ ও মন দুই যেন আন্দোলিত হলো। দু'দিন যুদ্ধ চলল। হার-জিত হলো না। তখন বিবি আয়েশা যুদ্ধ থামিয়ে যুবাইর ও তালহা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য মদীনাতে দূতরূপে পাঠালেন বসরার প্রধান বিচারপতিকে। জানতে চাইলেন এই দুই প্রধান সাহাবী খলিফার হাতে স্বেচ্ছায় বয়াত করেছেন কিনা। এখানে একটি কথা ভীষণভাবে আমাদের বিবেককে নাড়া দিল। প্রবীণ তালহা ও যুবাইর বিবি আয়েশার ডানে ও বামে বসে, অথচ তাদেরই কথা জানতে মদীনাতে লোক পাঠাতে হলো। কেননা বিবি আয়েশা তখন তাঁদের প্রতি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। এহেন দু'জন প্রবীণ সাহাবীর জীবনে এর চেয়ে অধঃপতন আর বেশি কি হতে পারে।

বিচারপতি-দূত মদীনা হতে বসরাতে ফিরে এসে জানালেন, "খলিফা আলী বারবার তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন খেলাফত গ্রহণ করার জন্য, তাঁরা কেউই রাজি হননি। বরং আলীকে অনুরোধ করেছিলেন, প্রস্তাব দিয়েছিলেন খেলাফত গ্রহণে এবং তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় তাঁরা বয়াত করেন। অতঃপর তাঁদের মনে কি বাসনা ছিল, সে সম্পর্কে সেখানকার জনগণ দ্বিধাবিভক্ত। এখানে একটি কথা আবার পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, বিবি আয়েশার নেতৃত্বে যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তা ছিল প্রতিশোধ, একেবারেই প্রতিশোধ গ্রহণের, খেলাফত নির্ণয়ের জন্য মোটেই নয়। স্বাভাবিক ভাবে প্রাণে সাড়া জাগে—আজ এই বাতুল কথা কেন উঠল, এবং কে তুলল। তালহা আর যুবাইর বারবার বসরার গভর্নর ওসমানকে পদত্যাগ করার জন্য তাগিদ দিতে থাকলেন। ওসমান সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন—"খলিফার নির্দেশ ব্যতীত আমি কিছুই করতে পারি না। তিনি সকলকেই খলিফার প্রেরিত হুকুমনামা পড়িয়ে শুনিয়ে দিলেন।

অতঃপর তালহা ও যুবাইর একটু থিতিয়ে গেলেন, দমে গেলেন। দুই বৃদ্ধ যেন বুঝতে পারলেন, চালে ভুল হয়ে গেল। তখন এক নাটের গুরু মারওয়ান ও দুই কূটনীতিবিদ পদচ্যুত গভর্নর লযালী ও আব্দুল্লাহ হাল ধরলেন। এশার নামাজে যোগদান করলেন এই তিন সারথি তাদের দলবল-সহ। রাত্রিটি ছিল বৃষ্টিবাদল ও ঝঞ্ঝার। নামাজ শেষ হলে তারা সকলেই তেলায়াতের (উপাসনা) নামে মসজিদে আত্মগোপন করল। সমস্ত লোক চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁরা গভর্নর ওসমানের প্রাসাদ আক্রমণ ও অবরোধ করলো। গভর্নর ওসমানকে তারা রাত্রিবেলায় তস্করের ন্যায় তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করে বন্দী করলো। প্রভাতে দু'পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

তেজস্বিনী ভাষায় বিবি আয়েশা বক্তৃতা দিলেন। মারওয়ান সকলকে সমসুরে উত্তেজিত করছে, দুই পদচ্যুত গভর্নর বাহিনীকে উৎসাহিত করছে। দুই প্রধান সাহাবী সকলের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছেন, অন্যপক্ষে একজনই ছিলেন নেতা, তিনি অতর্কিতে বন্দী হয়েছেন। নেতাহীন যুদ্ধে, দুরভিসন্ধিমূলক যুদ্ধে খলিফা আলীর সমর্থক ও গভর্নর বন্দী ওসমান পরাজিত হলেন। খলিফা ওসমান হত্যার নাম করে বহু নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদন্ড হলো। শহরে দারুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি হলো। আলীর পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হলো। গভর্নর ওসমানকে বিবি আয়েশার হস্তক্ষেপে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো না। কিন্তু তা অপেক্ষাও গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। দুই পদচ্যুত গভর্নর, দুই প্রবীণ সাহাবী ও মারওয়ান এই পাঁচজন একমত হয়েই ওসমানকে অমানবিক দণ্ড দিলেন। তার মাথার চুল ন্যাড়া করা হলো, সুন্নতে-রসুল দাড়ি কেটে দেওয়া হলো, নানা রঙে সজ্জিত করে চিড়িয়াখানার জানোয়ার রূপে ছেড়ে দেওয়া হলো। হতভাগ্য গভর্নর ঐ অবস্থায় আলীর নিকট ফিরে গেলেন।

অতঃপর বীরপুরুষগণ সারা দেশে বিজয়বার্তা পাঠালো। তারপর বিভালের পনির ভাগ পর্বটি আরম্ভ হলো। বসরা ছলে-বলে-কৌশলে হাতে এলো। এখন কে বসরার খলিফা বা নেতা বা ইমাম হবেন। কাকে জনগণ মেনে নেবেন। তালহা ও যুবাইর ঠিক করলেন— তাঁদের দু'জনের পুত্রই, পালাক্রমে মসজিদে ইমামতি করবেন। মহানবী ইমাম হওয়ার জন্য যে নিয়ম বা ধারা বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাঁরা বেমালুম ভুলে গেলেন। স্বার্থ এমনই জিনিস। হযরত আবুবকরের খেলাফত নির্বাচন কালে প্রস্তাব উঠেছিলো একজন মোহাজের থেকে ও অন্যজন আনসার থেকে খলিফা নির্বাচিত হোন। তখন হযরত ওমর ফারুক এই দ্বিত্বের প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করে বলেছিলেন একই পদে দুই নেতা অসম্ভব। তখন তাঁর কথা সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। আজ সেই মান্যকারীরাই এমন কাজ করলেন, যেখানে বলার কিছু থাকলো না। সংকীর্ণতা স্বার্থ এমনি বস্তু। অতঃপর তালহা ও যুবাইর খলিফা আলীর বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়ে একেবারেই ব্যর্থ হলেন। তখন নৈরাশ্যজনক এক পরিবেশ বসরার আকাশ বাতাসকে আন্দোলিত করতে থাকলো।

হযরত আলী কুফা ও বসরার পথে ঃ

বসরায় যা ঘটল সে সংবাদ তখনও হযরত আলীর নিকট পৌঁছয়নি। বসরার গভর্নর তখনও মদীনার পথে। ইতিমধ্যে আলী খবর পেলেন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়ার দুরভিসন্ধির কথা। তিনি তখন মদীনাবাসীগণকে জানিয়ে দিলেন সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার কথা। প্রস্তুতি আরম্ভ হলো। এই প্রস্তুতিপর্ব শেষ

হওয়ার পূর্বেই আলী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চিঠি মারফত মক্কাতে কি হলো, কি ঘটল সবিস্তারে জানতে পারলেন। বিবি আয়েশা কেন মক্কা ফিরে গেলেন, তালহা-যুবাইর সেখানে কি করলেন, দুই পদচ্যুত গভর্নর কিভাবে তাঁদের সাথে যোগ দিলেন, মারওয়ান কি করে ঐ আলীর বিরুদ্ধে চরম জটলাতে জুটল, কার কি উদ্দেশ্য, কে কোন উদ্দেশ্যে আলীনিধন যজ্ঞে যোগ দিল, কিভাবে অভিযান পথে পা দিল ইত্যাদি সকল কিছু এক পলকে খলিফা আলী জানতে পারলেন। হযরত আলী আগে ভেবেছিলেন—শত্রুসংখ্যা সীমিত মারওয়ান-মূয়াবিয়াতে । এখন বুঝলেন খুদে মারওয়ান ও দুঁদে মূয়াবিয়ার অভাব নেই। এই পত্র পাঠ করার পর মহান আলী অত্যন্ত বেদনা, ব্যথা, দুঃখ ও গভীর মনোকষ্ট পেয়েছিলেন কেবলমাত্র বিজ্ঞ বিবি আয়েশা সম্পর্কে। তিনি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে সমস্ত মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন — "বিবি আয়েশা যদি কুফা বা বসরার পথে যাত্রা না করে মদীনার পথে যাত্রা করতেন, কতই না ভাল হতো। সকল সমস্যারই সমাধান সহজেই হয়ে যেতো। এখন আপনারা আমাকে বলুন আমি কোন্ পথ ধরবো। সকলেই এক সুরে বলে উঠলেন— "হে খলিফা, আমাদের কারো ইচ্ছা ছিল না মা আয়েশা, তালহা ও যুবাইরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, কিন্তু দুঃখ, তাঁরা আমাদের ঐ কাজে বাধ্য করলেন। আমরা আপনার সাথে। একে একে কিছু বিশিষ্ট সাহাবী বক্তব্য রাখলেন। যেমন আম্মার ইবনে ইয়াসের, আবু কাতাদা, আবুল হাশিম বদরী, জোযিমা প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন— হে আমিরুল মোমেনিন, আপনি মদীনাতেই থাকুন, আমরা এগিয়ে যাই। তখন তিনি বললেন— আপনাদের কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত কিন্তু আমি সরাসরি আপনাদের সাথে সেখানে হাজির না থাকলে আপনাদের অন্য বিপদ আসতে পারে। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন– স্বয়ং খলিফার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। এবং খলিফার সাথে একমত হলেন।

৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ, ৩৬ হিজরী। খলিফা আলী মদীনাবাসীগণ-সহ কুফা ও বসরা যাত্রা করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হতেই একজন প্রবীণ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি খলিফার উটের রশি ধরে কাঁদতে লাগলেন, এবং অনুরোধ করলেন মদীনা ত্যাগ না করতে। কেননা পরিণতি অশুভ হবে। সকলেই তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনিও তখন বসরাভিমুখী খলিফার সাথী হলেন। পথিমধ্যে রবযা নামক স্থানে কয়েকজন পথিকের নিকট হতে শুনতে পেলেন যে, যুবাইর ও তালহা বসরা পৌঁছিয়ে গেছেন। এবং বসরার অধিকাংশ মানুষকে কবজা করেছেন। তখন তিনি বিষয়টির ওপর আরো গুরুত্ব আরোপ করে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। এবং সেখানে হতে মহম্মদ বিন আবুবকর ও মহম্মদ বিন জাফরকে

কুফা প্রেরণ করলেন আরো সৈন্য সংগ্রহ করতে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশেও লোক পাঠালেন। বসরার চারিদিকের প্রতিবেশীদেরও অবগত করালেন বিষয়টির গুরুত্ব। মদীনা হতে আরো দ্রব্যসম্ভার আনালেন।

সমস্ত দিক যখন পূর্ণ হলো, তখন খলিফা সকলের মাঝে একটি জরুরী ঘোষণা করলেন — "আমরা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন আক্রমণ চালাবো না। আমরা সকলকে সত্য জিনিসটি বোঝাবার চেষ্টা করবো, যুদ্ধ এড়ানোই হবে আমাদের মূল নীতি। তবে কোন অসত্যের নিকট, দুর্নীতির নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করবো না।" খলিফার এই সামান্য কয়েকটি কথায় সকলেরই খলিফার মূল লক্ষ্যকে বুঝতে আর অসুবিধে হলো না। সকলেই খুব খুশিই হলেন।

আবার যাত্রা শুরু হলো। যবদা নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, তখন ছাঈকবিলা হতে একদল পেশাদার যোদ্ধা খলিফার সাথে যোগ দিলেন। খলিফা ওমর ইবনে আবরাহকে তাঁদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। পথিমধ্যে ফিদ্ নামক স্থানে তাঈ ও আসাদ কবিলা হতে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ খলিফার সাথে যোগদান করল। এই স্থানে খলিফা কুফার একজনের দেখা পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — "কুফার গভর্নর মুসা আশয়ারীর মনোভাব কি !" তিনি বললেন — "আপনি যদি ঝগড়া বা যুদ্ধ বাধাবার নিমিত্ত কুফা গমন করেন, তাহলে তিনি আপনার বিরোধিতা করবেন। নচেৎ আপনার সাথে একমত হবেন।" খলিফা বললেন বিনা আক্রমণে আমি কাউকে আক্রমণ করবো না, এবং করি না।

হযরত আলীর সকাশে গভর্নর ওসমান ঃ

হযরত আলীর বাহিনী আবার এগিয়ে চলল। যখন তাঁরা সয়লবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন বসরাতে যুবাইর ও তালহার সাথে সেখানকার গভর্নর ওসমানের সংঘর্ষ বেধেছে। ঐ সংঘর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিবি আয়েশা। যাতে প্রাণ হারিয়েছেন হাকিম বিন জাবালা, এবং বন্দী হয়েছেন স্বয়ং গভর্নর ওসমান। বিবি আয়েশার হস্তক্ষেপে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই পেলেও অমানুষিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে মদীনার পথে রওনা হয়েছেন খলিফার সকাশে। হযরত আলী এই অমানবিক শাস্তির কথা শুনে খুবই মর্মাহত হয়ে বললেন— তালহা-যুবাইর কি ইসলামের নবীর যুদ্ধনীতিগুলোও ভুলে গেলো। হযরত আলী তাঁর সমগ্র জীবনে কোন নিরস্ত্র সৈন্য বা শত্রুর উপর হাত তোলেননি, পরাজিত সৈন্য আশ্রয় চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় অতিথির সম্মান দান করতেন। এটাই ছিল ইসলামের বীরের ধর্ম।

যখন বাহিনী যিকার নামক স্থানে উপস্থিত হলো, তখন ঐ হতভাগ্য গভর্নর ওসমান (মদীনার পথে) আলীর সাথে মিলিত হলেন। তিনি খলিফাকে সবিস্তারে সবকিছু বললেন। খলিফা শুনে বললেন – "আল্লাহ্ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন " আরো বললেন – "আমি বুঝতে পারছি না, কেন তালহা-যুবাইর কোন প্রবৃত্তির বশে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে।" ইতিপূর্বে খলিফা তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দকে কুফাতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা ফেরত আসার পর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান ও হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে আবার কুফা পাঠালেন।

কুফাতে খলিফা আলী ও বিবি আয়েশার দূত মুখোমুখি ঃ

তখন কুফাতে গভর্নর আবু মুসা আশয়ারী। তিনি খলিফা ওসমান হত্যার ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। তবে হযরত আলী খলিফা হওয়ার পরই তিনি তাঁর নামে কুফাবাসীদের বয়াত করান। খলিফা আলী তালহা ও যুবাইরের বিরোধিতার সংবাদ পেয়ে খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। কেননা তিনি জানতেন তাঁর প্রধান শত্রু মারওয়ান ও মুয়াবিয়া। এখানে যদি তালহা-যুবাইব ও বিবি আয়েশা যে কোন কারণেই তাঁর বিরোধিতা করেন, তাহলে শত্রুপক্ষ অনায়াসে বিজয়ী হবে। এই সত্যটি তিনি অনুধাবন করে বারবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের হকের পথে ফেরাতে। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য তিনি প্রথম কুফাতে পাঠালেন মহম্মদ বিন আবুবকর ও মহম্মদ বিন জাফরকে। তাঁরা ব্যর্থ হওয়ায় পাঠালেন আশরে বিন আব্বাস ও মহম্মদ বিন আব্বাসকে। এঁরাও ভাল ফল করতে না পাবায় সবশেষে পাঠালেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসের ও আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসানকে।

যখন এঁরা কুফাতে হাজির হলেন, তখন কুফার মসজিদে সেখানকার গভর্নর মুসা আশয়ারী ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর ভাষণের সারকথা ছিল তোমরা সবাই নিরপেক্ষ থাক। কেননা মহানবী বলেছেন – 'দুর্যোগেব সময় শায়িত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, এবং বসে থাকা ব্যক্তি দন্ডয়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম এবং দন্ডায়মান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ তোমরা অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধারণ করো।" ঠিক এই সময়েই ইমাম হাসান মসজিদে প্রবেশ করলে গভর্নর তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং হযরত আম্মার প্রবেশ করলে জিজ্ঞাসা করলেন – "তোমরা শহীদ খলিফাকে কোন রূপ সাহায্য না করে তাঁর হত্যাকারীদের সাথে মিলিত হলে ? এ কাজ কি ভাল হলো? সঙ্গে সঙ্গে চির বিপ্লবী আম্মার উত্তর দিলেন – "একথা সম্পূর্ণ মিথ্য" রটনা। আমরা তাদের সাথে মিলিনি, তারাও আমাদের সাথে মেলেনি, যখনই আমরা বুঝতে পারবো বা আপনারা বোঝাতে

পারবেন – কোন হত্যাকারী আমাদের মধ্যে আছে, আমরা তখনই তার প্রাণদণ্ড দেবো, আপনি দয়া করে দেখিয়ে দিন আমাদের মধ্যে তেমন কে আছে।" সঙ্গে সঙ্গে ইমাম হাসানও বলে উঠলেন – "আপনারা কোনদিন কি আমার পিতাকে ইসলামের খেদমত ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত হতে দেখেছেন কি ?" সমবেত উত্তর – 'না'। আবার বললেন – "আমার পিতা ন্যায়কার্যে কোনদিন কি কারো পরোয়া করেছেন ? আবার সম্মিলিত উত্তর— 'না'। "তবে খলিফা হত্যা কেন, যে কোন একটি দাসী হত্যাতেও তিনি ন্যায়বিচার করেন। একথা কি আপনারা জানেন না ? উত্তর – "আপনি সত্য বলেছেন।"

অতঃপর গভর্নর মুসা অতি সম্ভ্রমে বিনীত কণ্ঠে বললেন – হে নবীর নাতি! হে জগৎবরেণ্য মানুষ, আমার পিতামাতা আপনার পিতামাতা ও আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনার কথা একেবারেই সত্য, ঐ মুখ দিয়ে মিথ্যা বেরোতে পারে না। ঐ মুখ সত্যের মুখ, ন্যায়ের মুখ। আমি শুধু আপনার নানাজান রসূলে করিমের ঐ হাদিসটি স্মরণ করছি দুর্যোগের সময় . . . দণ্ডায়মান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ . . .।" তখন আম্মার গভর্নর মুসাকে বললেন – "ঐ হাদিস এখানে কি আজ প্রযোজ্য"? উত্তরে কয়েকজন আম্মারের কথার প্রতিবাদ করায় কথা কাটাকাটি আরম্ভ হলো। তখন মুসাই ওটা থামিয়ে দিলেন।

বিবি আয়েশার দূত ঃ

এই সময়েই বিবি আয়েশার দূত তাঁর পত্র-সহ বসরা হতে কুফাতে হাজির হয়ে সমবেত জামায়াতে পত্রখানি পড়ে শোনালেন – "তোমরা এ সময় কাহাকেও সাহায্য করো না। তোমরা আপন আপন গৃহে অবস্থান করো। যদি তা না করো, তাহলে আমাকে সাহায্য করো। আমি ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে অবতীর্ণ হয়েছি।" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তেজস্বী সাবিত ইবনে রবয়ী ভীষণভাবে ঝড়ের বেগে কিছু কটূক্তি-সহ বিবি আয়েশার পত্রের তীব্র প্রতিবাদ করলেন – "আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিবি আয়েশা কেন মদীনা না গিয়ে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ না করেই সদলবলে বসরায় হাজির হলেন ? যে দলে দেখাই যাচ্ছে মারওয়ানের মত মারাত্মক ক্ষতিকর ব্যক্তি ছড়ি ঘোরাচ্ছে। আমাদের সকলেরই উচিত সমস্ত ব্যক্তিকলহ ভুলে গিয়ে প্রথম খলিফার হাতকে শক্ত করা, এবং তিনিই বিচার করবেন প্রকৃত খুনীর।" সাবিতের তেজস্বী ভাষণে সকলেই খুশি হলেন। গভর্নর আবার বললেন – "তোমরা আররের টিলাগুলোর মত নিশ্চল বসে থাকো, তোমাদের তরবারিগুলো কোষবদ্ধ করো।" তাঁর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যায়েদ ইবনে সোহান দাঁড়িয়ে জনতার প্রতি লক্ষ্য করে বলতে থাকলেন – "আপনারা এ সময় কারো কথায় কান দেবেন না। খলিফাকে সাহায্য করুন।"

অতঃপর কুফারও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সজোরে যায়েদকে সমর্থন করলেন। সর্বশেষে কুফার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হজর ইবনে আদি দাঁড়ালেন এবং বললেন – "হে জনগণ, খলিফা আলী স্বয়ং তাঁর পুত্র ও রসুলের নাতিকে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছেন, আপনারা বিনা দ্বিধায় বিনা চিন্তায় তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমানের পরিচয় দিন। তোমরা সকলে আমার সাথে চল, আমরা আলীর পতাকাতলে সমবেত হই, যেভাবে একদিন বদরে ও ওহোদে এবং বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে ইসলামকে মজবুত করেছিলাম, আজও সেইভাবেই আবার চলো। ইসলামের ভীষণ দুর্যোগের দিনগুলোতে পতাকা ছিল আলীর হাতে, আজ আমরা ঐ পতাকা কোন কাপুরুষের, কোন মোনাফেকের হাতে দেখতে চাই না।" বিশিষ্ট সাহাবীর মর্মস্পর্শী বাণী সকলের মর্মকে স্পর্শ করলো।

ইমাম হাসানের ভাষণ, মালিক আশ্‌তার, ওয়ায়েস করণী, কাইফারবিন ওমরু ঃ

সব নেতার বক্তব্য শেষ হলে ইমাম হাসান দাঁড়ালেন। শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বললেন – "হে সমবেত জনগণ, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত কুফাবাসীগণ, আপনারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিন, খলিফার আনুগত্যে স্থির থাকুন, দেশকে দুর্যোগ হতে রক্ষা করুন, ইসলামের পতাকাকে তুলে ধরুন, যদি আপনারা বোঝেন – আমরা সত্য বলছি, তাহলে আমাদের সাহায্য করুন। যদি বোঝেন আমার পিতা আলীর তলোয়ার চিরদিন ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে এবং ইসলামের খেদমতে, তাহলে সেই ন্যায়নিষ্ঠ খলিফাকে আজ আপনারা সাহায্য করুন। হযরত যুবাইর ও তালহা আমার পিতার হাতে স্বেচ্ছায় বয়াত করলেন, উমরাহ করার নামে মক্কায় প্রস্থান করে বসরায় হাজির হলেন তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, এ কোন প্রকারের বয়াত, এ কোন শ্রেণীর উমরাহ! এটা কি সততা, না শঠতা!

আর বেশি কথা ইমাম হাসানকে বলতে হলো না। সমবেত জনতা এক বাক্যে তাঁকে সমর্থন করলেন। ইতিমধ্যে মহাবীর ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ মালিক আশতার সেখানে হাজির হলেন। তাঁর হঠাৎ আগমনে জনরবে একটা ভীষণ সাড়া পড়ে গেল। তিনি এক বাক্যে স্থির মনে ইসলামের চির মহান বীর, ত্যাগী পুরুষ, আল্লাহ্‌ব সিংহ, রসুলের জামাতা, খাতুনে জান্নাতের স্বামী, বীরজগতের প্রবাদ পুরুষ, জ্ঞানজগতের দরজা আমিরুল মোমেনীন খলিফা হযরত আলী হায়দরকে সক্রিয় সমর্থন ও সকল প্রকারের সাহায্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে সকলকে আকুল আহ্বান ও আন্তরিক আবেদন জানালেন। তাঁর কথাতে বিরাট সাড়া পড়ে গেল। তিনি ইমাম হাসানকে আলিঙ্গন করলেন। এবং গভর্নর মুসাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর অবস্থান কোথায় হবে। উত্তরে তিনি বললেন – নিরপেক্ষতা বজায়। তখন বীর আশতার

বললেন, আপনি কি খলিফার নামে বয়াত করেননি। উত্তর— করেছি। তাহলে খলিফার অধীনে খলিফার দেওয়া কুরসীতে বসে থাকা কি আপনার সাজে ? উত্তরে – নিরুত্তর। তাহলে আপনার জন্য রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ এখন আর বৈধ নয় বরং হারাম।

খেলাফতের এই বিপর্যয় দেখে দেশের বহু গুণী-জ্ঞানী বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা অকৃত্রিম প্রাণে আলীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। এই শ্রেণীর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত তাপস সর্বযুগের স্বনামধন্য সূফী হযরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) খলিফা আলী যখন যিকর নামক স্থানে অবস্থান করছেন, তখন তিনি তাঁর সাথে মিলিত হন। আজও মুসলিম জাহানে এমন কে আছেন, যিনি তাঁর মত জগদ্বিখ্যাত সূফীকে শ্রদ্ধা করেন না। এইভাবে খাঁটি মানুষগুলো হযরত আলীর সাথেই যোগদান করেছিলেন। কেননা আলীর জীবনে দু'নম্বর বলে কিছু ছিল না। যা ছিল সবই এক নম্বর। তাই যদি না হবে তাহলে মহানবীর খেলাতপ্রাপ্ত ইসলামের অদ্বিতীয় মনীষা হযরত ওয়ায়েস করণী ঐ বয়সে যিকর প্রান্তে হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন না। কেননা তিনি এক নম্বর ও দু'নম্বরের ব্যবধানটা ভালই বুঝতেন। এই সময় আর একজন তাপস কুলরবি হযরত কাইফার বিন ওমরু হযরত আলীর সাথে এসে মিলিত হন। এইভাবে তাঁর সাথে মিলতে থাকে বহু দেশবরেণ্য সাধককুল। ঠিক অনুরূপভাবে অন্যপক্ষে জুটেছিল দেশের কতকগুলো কলঙ্ক ও কুলাঙ্গার।ফসাদে ফেতনায়, প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় লোভে লালসায় যাদের কোন জোড়া ছিল না।

বসরার মাটিতে তাপসকুল শিরমণি
কাইফার বিন ওমরু ঃ

এই দুর্যোগের দিনে বসরার মানুষ সাধারণত তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত আলীর সমর্থনে, একদল তালহা ও যুবাইরের সমর্থনে, তৃতীয় দল নিরপেক্ষ। এই তৃতীয় দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল যাতে ঝামেলা না বাড়ে। ইতিমধ্যে প্রবীণ সাহাবী বোজর্গ ব্যক্তি মহানবীর স্নেহধন্য হযরত কাইফার তথায় হাজির হলেন খলিফার পক্ষ থেকে। তিনি সর্বপ্রথম বিবি আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এবং তাঁকে খোলামনে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন – "আপনি কেন এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন? আপনার মূল উদ্দেশ্য কি ? উত্তরে তিনি বলেন – "আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের সংশোধন করা ও পবিত্র কোরআনের অনুসারী করা।" তালহা ও যুবাইয়ের ও তিনি একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরাও প্রায় একই উত্তর দিলেন। তখন হযরত কাইফার তাঁদের বললেন – "আপনাদের যা উদ্দেশ্য,

কিন্তু আপনারা যে পথে ধরেছেন, ঐ পথে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।" তখন তাঁরা বললেন কেন হবে না। পবিত্র কোরআনে কাসাসের নির্দেশ আছে, আমরা হযরত ওসমান হত্যার কাসাস গ্রহণে আগ্রহী।" ২ ঃ ১৭৮, ১৯৪, ৫ ঃ ৪৫, ১৭ ঃ ৩৩

এবার হযরত কাইফার বললেন – "আপনারা কি জানেন না কাসাসের (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) অধিকার একমাত্র সর্বজনমান্য খেলাফতের হাতেই ন্যস্ত। সেই খেলাফত যদি দুর্বল হয়, তাকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে কাসাস কে গ্রহণ করবে। কাসাস (মৃত্যুদণ্ড) গ্রহণ তখনই সম্ভব হবে, যখন খেলাফত থাকবে শক্তিশালী, মজবুত। কাসাস যদি গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে প্রথম খেলাফতকে শক্তিশালী করতে হবে। নচেৎ কাসাস গ্রহণ কোনদিনই সম্ভব হবে না। বরং দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব এবং বিদ্রোহী মনোভাব বাড়তেই থাকবে। আপনারা আমাকে উত্তর দিন, আপনারা তো হযরত ওসমান হত্যার কাসাসের নামে বহুলোক হত্যা করলেন, কিন্তু ওসমান হত্যাকারীদের হত্যা করা তো বহু দূরের কথা, একজনকেও বন্দী পর্যন্ত করতে পেরেছেন কি ? পারেননি। কোনদিনই তা পারবেন না। তাহলে কাসাসের নামে বহু নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার অধিকার আপনাদের কে দিল ? আপনারা আমাকে উত্তর দিন – যাঁদের না জেনে, না শুনে হত্যা করলেন, তাদের কাসাস এবার কি হবে ? কে তাদের কাসাস গ্রহণ করবে ? মহান আল্লাহর দরবারে আপনারা কত বড় গর্হিত ও অন্যায় কাজ করেছেন। কত মজলুম আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট হাত তুলেছে, তার জবাব কে দেবে ? আপনারা মনে রাখবেন – আপনারা যে অন্যায় ও গর্হিত পথ অবলম্বন করেছেন ঐ পথে ঘরে ঘরে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠবে এবং আপনারাই হবেন তার জন্য দায়ী। আমি আপনাদের এখনও বলছি খেলাফতকে শক্তিশালী করুন এবং শক্তিশালী খেলাফতের মাধ্যমে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করুন ওসমান হত্যার জন্য কে বা কারা দায়ী, এবং তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করুন। যদি আপনারা তা না করেন, তাহলে আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই বলছি আপনাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবেই। আপনারা আল্লাহর নিকটও দায়ী থাকবেন।" উম্মুল মোমেনিন বিবি আয়েশাকে সম্বোধন করে বললেন – "আপনি কি মহান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে গেলেন – "হোয়াব ঝরনার কুকুরগুলোর কথা। তখন তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন – হে যুবাইর, একদিন কি মহান রসূল তোমাকে বলেননি – 'তুমি একদা না-হক যুদ্ধে প্রিয় আলীর বিরুদ্ধে লিপ্ত হবে।" অনুতপ্ত যুবাইর বললেন – 'সে কথা আমার মনে এসে গেছে।"

হযরত কাইফারের মত ব্যক্তি এইরূপ নিটোল বক্তব্য রাখার পর বিবি আয়েশা, তালহা, যুবাইর সকলেই যেন অনুতাপ-সহ সত্য অনুধাবনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা বললেন, "এই যদি হযরত আলীর ইচ্ছা হয়, তাহলে আমরা আর যুদ্ধ করবো কেন!

আমাদের আলীর সাথে কোন শত্রুতা নেই।" তখন হযরত কাইফার বললেন – "আমি যা বললাম তা আলীরই কথা। আমি শুধু আপনাদের শোনালাম মাত্র।" তখন বিবি আয়েশা তালহা-যুবাইর সকলেই খুশি হলেন। তাঁরা বারবার হযরত কাইফারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে "আমাদের একমাত্র অনুযোগ – হযরত ওসমান হত্যাকারীরা হযরত আলীর মদত পেয়ে তাঁর সেনা বাহিনীতে আশ্রয় নিয়েছে।" কাইফার বললেন – "আপনাদের বক্তব্যের প্রথম অংশ ঠিক না, শেষাংশটি ঠিক। অর্থাৎ হযরত ওসমানের হত্যাকারীগণ হযরত আলীর মদত পাইনি এবং কোনদিনই পাবে না। তবে তাঁর অজ্ঞাতে অনেকে তাঁর সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেছে। আপনারা সকলেই তাঁকে সাহায্য করুন ঐ মানুষগুলোকে খুঁজে বের করতে। এর পরিবর্তে যদি আপনারা আলীকে সদাই বিব্রত করতে থাকেন, তাহলে তাঁর ও আপনাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। একথায় সকলেই একমত হলেন।

ইতিমধ্যে কুচক্রীর দল বসরাতে একটা রটনা করে দিল যে, হযরত আলী বসরা জয় করতে পারলে বসরার পুরুষগুলোকে সব হত্যা করবেন ও মেয়েদের দাসীতে পরিণত করবেন। তখন একদল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হযরত আলীর নিকট গমন করলেন। হযরত কাইফারও হাজির হলেন। আলী কাইফারের মুখে সমস্ত কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। অতঃপর প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত সমাদরে আপন করে বরণ করলেন। প্রতিনিধিদল হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে ও কথাবার্তা বলে যারপরনাই তৃপ্ত হলেন। এবং বসরাতে প্রত্যাবর্তন করলেন। আপাত সমস্ত মেঘ কেটে গেল। উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অভিযোগ ও অনুযোগের নিরসন হলো। বোজর্গ ব্যক্তি হযরত কাইফারের মাধ্যমে আশার আলো যেন ফুটে উঠল।

হযরত আলীর ঘোষণা ও শান্তি ব্যর্থ করতে গোপন ষড়যন্ত্র ঃ

আমরা আপাত দুটো শিবির দেখে আসছি – একটি আলী ও অন্যটি বিবি আয়েশা-তালহা ও যুবাইর। এই দুই শিবিরের মূল মানুষগুলো মূলত কেউই খারাপ ছিলেন না, কিন্তু দুই শিবিরেই কতকগুলো দুষ্ট মানুষের আর্বিভাব ঘটেছিল। হযরত আলীর শিবিরে ওসমান হত্যার মানুষগুলো সেনাবেশে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ঐ শিবিরে মারওয়ান প্রমুখ উমাইয়াগণ প্রকাশ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল। বলতে গেলে মারওয়ান ও পদচ্যুত গভর্নরগণই উপদেষ্টা হয়ে বসেছিল। ফলে গোলযোগের আর কোন অভাব হয়নি। কিন্তু আলীর শিবিরে ঐ দুর্ভাগ্য ঘটেনি।

হযরত আলী তাপসপ্রবর কাইফারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "আমি খেলাফতে ধীরভাবে বসামাত্রই আমার প্রথম কাজ হবে ওসমান হত্যার পূর্ণ তদন্ত করে দোষীদের বের করা ও যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া।" আলীর এ কথা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। পরিস্থিতি ও পরিবেশ অন্যদিকে মোড় নিল। দু'দলই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সারা দেশ যেন চিন্তামুক্ত হলো। তখন দু'পক্ষের দুই চক্রান্তকারী দল জোরে-সোরে আপন চেষ্টা চালাতে থাকলো। কি করে শান্তি আলোচনা বানচাল করা যায়, কি করে আপন আপন সিদ্ধিলাভ করা যায়, এই ছিল তাদের মূল বাসনা। মারওয়ান গোষ্ঠী চাচ্ছিল গোলযোগ পাকিয়ে খেলাফত দখল এবং অন্য হত্যাকারীগণ চাচ্ছিল বিশৃঙ্খলা পাকিয়ে বিচার হতে মুক্তিলাভ, কাসাস (মৃত্যুদন্ড) হতে পরিত্রাণ। এটাই ছিল ষড়যন্ত্রের মূল কথা।

হযরত আলী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বসরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। তিনি তাঁর সকল সেনাবৃন্দকে একত্রিত হতে নির্দেশ দিলেন। এই সৈন্য সমাবেশে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিলেন – "হে আমার প্রিয় সৈনিকবৃন্দ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত আমি বসরা গমন করতে ইচ্ছুক। এই যাত্রার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কোন দেশ জয় নয়, কাউকে পরাজিত করাও নয়, এককথায় যুদ্ধ নয় শান্তি। আমি আরো একটি ঘোষণা করছি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় – আমার বিশাল বাহিনীতে খলিফা ওসমানের গৃহ অবরোধকারীদের মধ্যে যদি কেউ থেকে থাকো, সে বা তারা যেন এখনই আমার বাহিনী হতে দূরে সরে যায় অনতিবিলম্বে, আমার সঙ্গে তারা যেন এক পাও কোথাও গমন না করে। আমার সৈন্যসংখ্যা শূন্য হোক সেও ভাল, তবুও ঐ সৈন্য চাই না, যারা একজন খলিফার গৃহ অবরোধ করে আর একজন খলিফার দলে মিশে রক্ষা পেতে চায় ও সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। আমি খলিফা ওসমান হত্যার বিচার করতে ও শাস্তি দিতে দৃঢ়সংকল্প।

খলিফা আলীর এরূপ শক্ত ভাষণে সেনাদলে যারা গা-ঢাকা দিয়েছিল, তাদের ভীষণ ভাবনা হলো। কেননা তারা জানতো হযরত আলী ন্যায়বিচারে কত শক্ত মানুষ। এবার তারা আপনাদের বাঁচার তাগিদে গোপনে একত্রিত হলো। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় আড়াই হাজার মত। এই দলের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও আলিয়া বিন হাতিম প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তারা বলল এতদিন কাসাসের দাবিদার ছিল মাত্র একপক্ষ, আজ দু'পক্ষই দাবিদার। আজ আর আমাদের পরিত্রাণ নেই। এবার ওদের মধ্য হতে একজন বললো – "দুই পক্ষ যদি মিলে যায়, তাহলে আমাদের আর রক্ষা নেই। সুতরাং আমার কথায় ওদের তিনজনকেই (আলী-তালহা-যুবাইর) হযরত ওসমানের নিকট পাঠিয়ে দাও।" তখন তাদের

দলীয় নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলল – "হযরত আলীর সাথে এই মুহূর্তে সংঘর্ষে নেমে আমরা জয়ী হতে পারবো না। কেননা তাঁর বিশ হাজার সেনাবাহিনী, আর আমাদের মাত্র আড়াই হাজার। অপর পক্ষের সাথেও আমরা এখন সরাসরি পারবো না। অপর পক্ষের মারওয়ানের সাথে আমাদের গোপন কথাবার্তা চালাতেই হবে। এখন আলীর সাথেই যেমন আছি, তেমনি ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তখন আলিয়া বিন হাতিম বলল – তোমার কথা ঠিকই আছে, তবে একটি সংশোধন করতে হবে। হযরত আলী ঘোষণা করেছেন – ওসমান হত্যাকারীরা যেন অনতিবিলম্বে তাঁর দল থেকে বেরিয়ে যায়। দেশ-দশ এপক্ষ ওপক্ষ সবার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য আলীর দল থেকে আমাদের কিছু লোককে লোক দেখানো করে বেরিয়ে যেতে হবে। তখন আলী বুঝবেন তাঁর দলে আর কোন অন্য ব্যক্তি নেই, 'যারা আছে তারা আলীর একান্ত অনুগত মানুষ। এইভাবে তারা ভাল মানুষ সেজে দুরভিসন্ধি চালাতে থাকবে। কিছুতেই যেন মীমাংসা না হয়, দু'পক্ষই যেন একে অপরকে ঘোর শত্রু মনে করে। তার জন্য তাদের যা করার তারা তাই করবে।" শান্তিভঙ্গের জন্য, অশান্তি ছড়ানোর জন্য, নিজেদের রক্ষা করার জন্য ওসমান হত্যাকারীদের মধ্যে এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

সরল, সৎ ও সাধু আলী এ সবের কিছুই বুঝতে পারলেন না, জানতেও পারলেন না গোপন ষড়যন্ত্রকত গহীন হতে চলেছে। একে কি ইসলামের নিষ্ঠুর ইতিহাস বলবো, না নিয়তির আপন হাতে গড়া নির্জলা পরিহাস বলবো। দীনের নবী, মহান নবী, মহানবী এই সমস্ত পূর্ব ঘটনার অনেক কথাই বলে গিয়েছিলেন, হয়তো বা তিনি জানতে পেরেছিলেন – তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও প্রিয় আলী কখন কিভাবে কোন করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। এটাই হয়তো ভাগ্য। নির্ধারিত নিয়তি।

সপ্তম অধ্যায়

ঘটনার স্রোতে হযরত আলী (কঃ)

জামালের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রীঃ

এবার আমরা দেখবো ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে খড়কুটোর মত নিখিল বীর নিরুপায় হযরত আলী ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সজোরে প্রবাহিত।

প্রবাহিত আত্মতীরে যে জীবননদী
সেই নদীর নাব্যরূপ আসরার-ই-খুদী।

এই জীবন নদীর গতিরহস্য কে বুঝবে। কোথায় কোন বঙ্কিম পথে জীবনের রথ কিভাবে কেন ঘুরপাক খাবে, সে কথা কে জানে। আগামীকাল সকালে কে কি করবে, সে কথা কে বলবে।

ভবিতব্য লিখে দেন ভাগ্যের লিখন
ভাল হোক মন্দ হোক কে করে লঙ্ঘন। ৩১ ঃ ৩৪

মহান আলী আপন চরম সদিচ্ছানুযায়ী তাঁর সেনাবাহিনীকে বসরার পথে যেতে নির্দেশ দিলেন। ওসমান হত্যার ঐ অভিযুক্ত বিপ্লবী দলটিও গোপন পরামর্শানুযায়ী আলীর বাহিনী ত্যাগ করলো, আবার কিছু সংখ্যক গোপনে চলতেও থাকলো তাঁদের সাথে। বাহিনী কছরে আব্দুল্লাহ নামক স্থানে পৌঁছিয়ে তথায় শিবির স্থাপন করলো। অনতিদূরে বসরা। তালহা এবং যুবাইরও অপর প্রান্তে ছাউনি স্থাপন করলেন। উভয় পক্ষের তিনদিন মুখোমুখি অবস্থায় কেটে গেল। বলাই বাহুল্য একপক্ষে উমাইয়া শিরমণি মারওয়ান ও অন্যপক্ষে ওসমানঘাতকগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকলো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে। একদিকে বিবি আয়েশা ও অন্যদিকে হযরত আলী লাগাম ধরলেন।

মহান আলী ছিলেন জগদ্বিখ্যাত এক মহান বীর, তাঁর প্রাণ ছিল বিরোচিত প্রাণে ভূষিত, তাঁর হৃদয় ছিল চরম উদারতায় ভূষিত, তাঁর মন ছিল চরম সরলতায় ভূষিত, তাঁর তরবারি ছিল শুধু অন্যায়ের জন্য উন্মুক্ত, তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা ছিল অনন্তময়। তাই তিনি নিজে কেবল মাত্র আপন জীবন জিজ্ঞাসায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আপন সেনাবাহিনী হতে কোন এক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং বললেন – "তুমি সেনা হিসাবে আমার অধীন, কিন্তু তোমাকে আমি এখন ডেকেছি 'স্বাধীন ব্যক্তিরূপে'। তুমি তোমার বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান-গরিমা দিয়ে আজকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করো, যাতে আমি বুঝতে পারি আমি ন্যায় ও অন্যায়ের কোন পথে চলছি।" (এই প্রশ্নকারী ছিলেন হয় তাপসশ্রেষ্ঠ হযরত কাইফার স্বয়ং, কিংবা তাপসশ্রেষ্ঠ হযরত ওয়ায়েস করণী নিজে। একথাটি আমাকে বলেছিলেন আমার আব্বাজান ও চাচাজান মরহুম মৌলবী মোঃ ইউনুস

ও মরহুম মওলানা মোঃ ইলিয়াস। আল্লাহ্ তাঁদের জান্নাতে দাখেল করুন।)

প্রশ্ন ঃ আপনি বসরা এলেন কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ?

উত্তর ঃ মুসলমানদের মধ্যে আবার হারানো ভালবাসাকে ফিরিয়ে আনা।

প্রশ্ন ঃ বসরাবাসীরা যদি আপনাকে না মানে ?

উত্তর ঃ আমি কাউকে বাধ্য করবো না।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো বাধ্য করবেন না, কিন্তু তারা যদি আপনাকে বাধ্য করতে চায়, আপনি কি করবেন ?

উত্তর ঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন ঃ হযরত তালহা ও যুবাইরের নিকট কাসাস গ্রহণের পক্ষে কোন দলিল আছে বলে আপনি কি মনে করেন ?

উত্তর ঃ থাকতে পারে, তা না হলে তারা এগোচ্ছে কেন ।

প্রশ্ন ঃ কাসাস গ্রহণে আপনি বিলম্ব করছেন, তার কোন কারণ আছে কি ?

উত্তর ঃ আমার নিকট কারণ আছে।

প্রশ্ন ঃ কারণটা কি ?

উত্তর ঃ আমাকে স্থির হয়ে বসতে হবে, এবং ধীরভাবে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে, যেন নিরপরাধ শাস্তি পেয়ে না যায়।

প্রশ্ন ঃ যদি যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে নিহত ব্যক্তিগণের আল্লাহর নিকট কিরূপ হবে?

উত্তর ঃ উভয় পক্ষেরই নিহত ব্যক্তিগণ শহিদের দরজা পাবে। কেননা কতিপয় মানুষ ব্যতীত নিয়ৎ তো কারোই খারাপ না।

প্রশ্নকারী বলেন – মহানবী বলেছিলেন আপনি ওপারে জান্নাতি, আমি বলছি, আপনি এপারে নিরপরাধী। মহৎজন, মহৎপ্রাণ।

উত্তরকারী – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।

যে-জন অক্ষম এই জীবন জিজ্ঞাসায়
পড়ে না তাহার মন প্রভু-মহিমায়।

অতঃপর মহান আলী হাকাম ইবনে সালাম ও মালিক ইবনে হাবিবকে যুবাইরের নিকট পাঠালেন একটি প্রস্তাব-সহ। প্রস্তাব – "আপনারা হযরত কাইফারের প্রস্তাবে রাজি থাকলে লক্ষ্য রাখবেন ঐ প্রস্তাব চূড়ান্ত রূপ না নেওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে না যায়।" যুবাইর বলে পাঠালেন – "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা আমাদের কথায় অবিচল আছি ও থাকবো।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবাইর ও তালহা উভয় সেনাদলের মধ্যবর্তী স্থানে হাজির হলে হযরত আলী তা লক্ষ্য করেই আপন শিবির হতে বের হয়ে তাঁদের নিকট হাজির হলেন। আলাপ আরম্ভ হলো।

আলী ঃ ভাই তালহা, আপনি যে আমার শত্রুতা করছেন, সেটি কি জানেন ? আপনি কি আমার ভ্রাতা নন ?

আমাদের পরস্পরের রক্ত কি পরস্পরের জন্য হারাম নয় ?

তালহা ঃ আপনি কি ওসমান হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন না ?

আলী ঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি হত্যাকারীদের ওপর গজব নাজেল করুন। আপনি কি আমার হাতে বয়াত করেননি ?

তালহা ঃ সেটা কাসাস গ্রহণের শর্তে।

আলী ঃ আমি প্রথম দাবিদার কাসাস গ্রহণে।

তালহা ঃ তাহলে, আমার আর কিছু বলার নেই।

এইভাবে যুবাইয়ের সাথেও আলীর কিছু কথা হলো। আলাপ খুবই সন্তোষজনক হলো। যুবাইর কথা দিলেন যুদ্ধ না করার। পরে তাঁরা আপন আপন শিবিরে ফিরে গেলেন।

যুবাইর শিবিরে ফেরা মাত্র বিবি আয়েশার সাথে দেখা করলেন। এবং আপন মনোভাবের কথা ব্যক্ত করলেন— যুদ্ধ নয় শান্তি। বিবি আয়েশা এতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে যুবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ পিতাকে বললেন "আপনি এতদিন ধরে লোকেদের বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন, হঠাৎ আজ যুদ্ধ করব না বলছেন। আপনি আলীর সেনাবাহিনী দেখে ভীত হয়ে পড়েছেন। যুবাইর বুঝতে পারলেন যুবক পুত্রকে কেউ ইন্ধন জোগাচ্ছে। তিনি মুখে কোন কথা না বলেই সৈনিকের সাজে সাজলেন। এবং দ্বিধাহীন চিত্তে আলীর বিশাল বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। বিজ্ঞ আলী যুবাইরকে এভাবে শত্রু-শিবিরে সৈনিকের বেশে একাকী প্রবেশ করতে দেখে বুঝলেন কোন রহস্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন— তাঁকে যেন কেউ বাধা দান না করে। কেউ যেন অসম্মান না করে। যুবাইর আলীর বিশাল সেনাবাহিনীর ভিতরে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ালেন। এবং আপন ইচ্ছাতে আবার বেরিয়ে এলেন। সকলেই অবাক।

অতঃপর আপন শিবিরে ফিরে পুত্রকে ডাকলেন এবং বললেন – "তুমি কি লক্ষ্য করলে আমি সেনার বেশেই আলীর বিশাল সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করলাম, আপন ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করলাম। সাধারণ বেশে যাইনি। তাহলে আমাকে তাবা অতিথির সম্মান দিতো। আমি সৈনিকের বেশে বিনা অনুমতিতে অন্য সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করেছি। তাবা ইচ্ছা করলে আমার গর্দান নিতে পারতো। এবার

তুমি লক্ষ্য করলে তোমার পিতা মরণের ভয়ে কতটা ভীত। মৃত্যুকে অনেক আগেই মেরেছি। তাই নবীর দোয়া ও ভালবাসা পেয়েছি। আমি ঐ বাহিনীতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে দেখলাম। যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং রসূলে করিম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন– "আম্মারকে বিদ্রোহীরা কোতল করবে"। এবার সকলেই চিন্তা করো— কে কাকে হত্যা করতে যাচ্ছ। কারা নবীজীর কথায় পদাঘাত করছে।

অতঃপর শান্তি ও সন্ধিতে প্রবল আগ্রহী হযরত আলী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে যুবাইর ও তালহার নিকট প্রেরণ করলেন সন্ধির শর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এবং ঐ পক্ষ মহম্মদ বিন তালহাকে আলীর নিকট পাঠালেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। তিনদিন ধরে বিস্তারিত আলোচনা হলো। তারপর সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল সকালে উভয়পক্ষ কাগজে সই করে সন্ধিনামা ঘোষণা করবে। সমস্ত অশান্তি যেন মিটে গেল। কিন্তু চরম দুর্ভোগ, কার দ্বারা কেমন করে এ অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠলো। তা সবাই জানে। এতগুলো মহৎ প্রাণের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, মহৎ বেদনা বিনষ্ট হলো। অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। উভয়পক্ষের বানরগুলো বিজয়ী হলো। কথায় বলে বানরের চাল বোঝা মুশকিল। বানরকে কোনদিনই মানুষ করা যায় না। এই কয়েকটি বানর কিছুদিনের জন্য শান্তির দেশে অশান্তির আগুন জ্বাললো, কিন্তু চিরদিনের জন্য আপন আপন ভাগ্যের আগুন জ্বাললো, আপন আপন ইহকাল ও পরকালকে পুড়িয়ে দিল। এরই নাম ভাগ্যের পরিহাস, ভাগ্যের আগুন।

ভালো হোক মন্দ হোক ভাগ্যের লিখন
কোন দিন হয় নাকো তাহার লঙঘন।
যতই মহান হোন, থাক শত গুণ
নিভাতে পারে কি কারো কপালে আগুন।
শতঘর করে দাও— তকদির অনল
কে ঝাড়ে সাপের বিষ, জীবন-গরল। ২ঃ ৭, ৭ঃ ১৭৯।

যুদ্ধের অন্তরালের ইতিহাস
(৯ ডিসেম্বর ৬৫৬ খ্রীঃ)

এই যুদ্ধে মহৎপ্রাণা বিবি আয়েশা, যুবাইর ও তালহা ছিলেন নিমিত্ত মাত্র। অপর পক্ষে হযরত আলীও ছিলেন নিরুপায় ও নিমিত্ত মাত্র। প্রথম পক্ষের নাটের গুরু ছিল উমাইয়াগণের চির ধান্দাবাজ, চির ফট্কাবাজ মারওয়ান প্রমুখ এবং দ্বিতীয় পক্ষে নষ্টের কীট ছিল চির ভন্ড, চির কপট, চির চাটুকার আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। এই দু'জন যখনই দেখলো—শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে আর দেরি নেই, রাতটুকু মাত্র সময়, সকাল হলেই শান্তি এবং শান্তি এলেই তাদের সর্বনাশ। সুতরাং এই

রাতটুকুর মধ্যেই তাদেরকে তাদের কাজ সমাধা করতেই হবে। দুই নরাধমই একমত হলো রাতেই আরম্ভ করতে হবে হত্যাযজ্ঞ। তৈরি হলো আপন আপন শিবিরে। শয়তান আর কাকে বলে। ৩ঃ ১৭৫

রাত্রি সমাগত, উভয়পক্ষের সেনাবাহিনী সন্ধির কথাবার্তা শুনে কতই না আনন্দিত, কত বুকভরা আনন্দ ও আশা নিয়ে আজ আপন আপন শয্যাতে গমন করলো। গভীর রাত্রি, সকলেই নিদ্রামগ্ন, কেবল অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি মানুষ নামধারী শয়তান। যাদের শয়তানিতে মহামানবগণও হেরে গেলেন। হঠাৎ যেন উভয় শিবিরে বজ্রাঘাত হলো। অতি আচমকা যেন গভীর জঙ্গলে দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। উভয় শিবিরে চরম কোলাহল, কেউ কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার যেন অবকাশটুকুও নেই। শুধু তরবারির ঝনঝনানি শব্দ, ক্ষণিকের মধ্যে উলঙ্গ তরবারি যেন উন্মাদ রূপ গ্রহণ করলো। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, আঘাত, প্রত্যাঘাত, হুঙ্কার-প্রতিহুঙ্কার, গর্জন-প্রতিগর্জন। এই অঘটন, এই শয়তানি ষড়যন্ত্র ঘটল রাত্রির শেষের দিকে।

যুবাইর ও তালহা সেনাদের জিজ্ঞাসা করছেন-- কি হলো, কেন হলো। উত্তর – "আলীর পক্ষ আমাদের হঠাৎ অন্ধকারে আক্রমণ করেছে, আমরা আত্মরক্ষা করছি"। তখন তাঁরা উভয়েই দারুণ দুঃখে বলে উঠলেন – "হায় আল্লাহ্ আলী রক্তপাত না করে ছাড়লেন না"। অপরপক্ষে আলী জিজ্ঞাসা করলেন— কি ব্যাপার? উত্তর ঐ একই। তখন তাপস আলী শিশুর ন্যায় কেঁদে উঠেছিলেন হে আল্লাহ্! তুমি শ্রবণকারী, দর্শনকারী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। যুবাইর ও তালহা কথা দিয়েও কেন এই পথ বেছে নিল, জানি না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের শান্তির পথে সাহায্য করো।" যুদ্ধ কে বাধালো, কেন বাধালো, সে কথা অন্তরালে চলে গেল। পশ্চাতে পড়ে গেল। সামনে এলো — উভয়পক্ষের সেনাপতির প্রতি উভয়পক্ষের অবিশ্বাস ও চরম বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ। সাক্ষাতে আলোচনা করার আর কোন সুযোগই থাকলো না। শয়তানের দল এমনই চক্রান্ত করলো, মানুষের দল হেরে গেলেন। মানুষের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি কত ক্ষতিকর হতে পারে, জামালের যুদ্ধ তার জলন্ত প্রমাণ। ভণ্ড-চতুর-চাটুকার-অমানুষের চক্রান্ত মহা মানবদের মহান উদ্দেশ্যকে কিভাবে ব্যর্থ করে দেয়, জামালের যুদ্ধ তার জীবন্ত নজির, চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যুদ্ধের ইতিহাস ঃ

বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চলছে। শত শত লোক মারা যাচ্ছে। কাতারে কাতারে মানুষ আহত হচ্ছে। আর্তনাদ-চিৎকার, রণ দামামা-রণ হুঙ্কার রণ প্রাঙ্গণে শয়তানের বিজয় উল্লাসকে যেন অভিবাদন জানাচ্ছে। একদিকে কপট আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, এবং অন্যদিকে মারওয়ান ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ প্রাণ প্রতিজ্ঞায়,

প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তালহা ও যুবাইয়ের মনে দ্বন্দ্ব এসে গেছে, এ যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধের পশ্চাতে যেন কোথাও কিছু দুরভিসন্ধি রয়ে গেছে। ফলে তাদের গতি হলো স্তিমিত। বলতে গেলে তখন যুদ্ধ একতরফাভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। হেনকালে কাব ইবনে শোর নামক জনৈক ব্যক্তি চিন্তা করলেন— তিনি শুভবুদ্ধি নিয়েই ঐ চিন্তা করেছিলেন, বিবি আয়েশা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিন, তাঁকে দেখলে বা তাঁর প্রস্তাব শুনলে কেউই তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আবার কেউ কেউ বলেন— তিনি মারওয়ান কর্তৃক প্রোরোচিত হয়েই যুদ্ধের গতিকে আরো প্রবল করার নিমিত্ত বিবি আয়েশাকে যুদ্ধে নামান। শেষোক্ত কথাটিই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কেননা বিবি আয়েশা যুদ্ধে অবতরণ করে একবারো যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাব দেননি। এতে বোঝা যায় – কাব ছিল মারওয়ানেরই গুপ্তচর।

কাব বিবি আয়েশাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তখন কাব তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর উষ্ট্রের হাওদাটিকে লোহার নির্মিত জাল দ্বারা ভালভাবেই সুরক্ষিত করলেন। বিবি আয়েশা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রের এমন স্থানে হাজির হলেন, যেখান থেকে সকল সৈন্যই তাঁকে অবলোকন করতে পারল। ফল হিতে বিপরীত হলো। বিবি আয়েশাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা মাত্র মারওয়ান শিবিরের সৈন্যগণ দ্বিগুণ বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করলো। তালহা ও যুবাইরের অন্যমনস্কতা এবার ঢাকা পড়ে গেল। তখন আলীর পক্ষের কিছু সৎ ব্যক্তি আলীর নিকট আগমন করে তাঁকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললে তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে সম্মত হলেন। চিরদিনের অকৃত্রিম যোদ্ধা বীর আলী নিজেও লক্ষ্য করলেন— যুদ্ধের গতি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে— কেবল মাত্র বিবি আয়েশার উপস্থিতির জন্য। হযরত আলী কিছুতেই চাইছিলেন না বেশি মানুষ হত্যা হোক। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই বিবি আয়েশার নিকট দূত পাঠালেন। দূত তাঁর সাক্ষাৎ না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়েই ফিবে এলো। দূতকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হলো না। এবং দূতের প্রস্তাব তিনি জানলেন না। আবার অধিকাংশই বলেন তিনি সবই জেনেছিলেন আপন ভাইয়ের নিকট হতে।

নিরুপায় আলী তখন মহান আল্লাহর নিকট প্রথম তাঁর অনিচ্ছা ও আকাঙ্খার কথা কাতরভাবে জানালেন। অতঃপর বদর যুদ্ধের আজরাইল, ওহোদ প্রান্তরের মহাবীর, খন্দকের যম, খায়বরের শের-ই-খোদা জুলফিকর হাতে নিলেন। একদিন যে তরবারি সুদীর্ঘ একটানা তেইশ বছর মহানবীর ইঙ্গিতে পলকে মেঁদিনী কাঁপিয়ে তুলতো, সেই তরবারি আবার মহানবীর পর সুদীর্ঘ তেইশ বছর শান্তির কোলে চির বিশ্রামে কোষবদ্ধ ছিল, আজ আবার কোষমুক্ত হলো। আজ কোষমুক্ত তরবারি আবার নিষ্কাশিত হলো। তেইশ বছরের একটানা পরিশ্রম, আবার তেইশ বছরের

একটানা বিশ্রামের পর জগৎবীরের তরবারি আবার বের হলো। আমিরুল মোমেনিন হযতর আলী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই ছাড়লেন এক হায়দরী হাঁক। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রণপ্রান্তর কম্পিত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনী যেন শতগুণ শক্তি আহরণ করল।

সবকিছুর ঊর্ধ্বে শের-ই-খোদা চিন্তা করলেন— কি করে তাড়াতাড়ি যুদ্ধকে থামানো যায়। চির রণকুশল বীর লক্ষ্য করলেন যে এই যুদ্ধ প্রাণ পেয়েছে, গতিলাভ করেছে বিবি আয়েশাকে দেখে ও তাঁর উটকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ঐ জিনিসটাকে নিরস্ত করতে পারলেই যুদ্ধ আবার তার গতি হারাতে বাধ্য। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন— বিবি আয়েশা সেনাদলের মধ্যভাগে অবস্থান করছেন। মহম্মদ বিন তালহা অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পদাতিক বাহিনীর প্রধান এবং সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্বে দু'জন অনিচ্ছুক মানুষ যুবাইর ও তালহা।

এবার আরম্ভ হলো ওস্তাদের মার শেষ রাত। মহাবীর আলী ভীষণ এক রণহুঙ্কার যোগে তীর বেগে হাজির হলেন একেবারেই স্বয়ং যুবাইরের নিকট। জিজ্ঞাসা করলেন — "হে যুবাইর, তুমি কি ভুলে গেছো, মহান নবীর কথা, তিনি কি তোমাকে একদা জিজ্ঞাসা করেননি— 'তুমি কি আলীকে ভালবাসো ? উত্তরে বলেছিলে — 'হে রসূল, আমি অকৃত্রিম মনেই আলীকে ভালবাসি'। তখন দ্বীনের নবী কি তোমাকে বলেননি — "একদিন তুমি আলীর বিরুদ্ধে না-হক যুদ্ধে লিপ্ত হবে।" সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত যুবাইর বললেন —" হে আলী, সমস্ত কথা আমার স্মরণে এসে গেছে। আমি আর তোমার সাথে যুদ্ধ করব না।" এই বলে তিনি তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন, "হে পুত্র, আমরা 'না-হক' যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। আমি আর যুদ্ধ করবো না, তুমি আমার সাথে এসো।" পুত্র পিতার কথা গ্রহণ করল না। পিতা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

পিতা যুবাইর বধ হলেন ঃ

শয়তানের ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও শয়তান মারওয়ান লক্ষ্য করলো যুবাইর যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করে বসরা অভিমুখে রওনা হলেন। মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে ওমর বিন আল-জরমুয নামক এক দুষ্টজনকে নিযুক্ত করলো যুবাইরকে হত্যা করার জন্য। ওমর যুবাইয়ের পশ্চাদ্ধাবন করলো। তাঁর সাথে মিলিত হলো। বহু কথাবার্তা চলতে থাকল। যখন আসরা নামক স্থানে উপস্থিত হলো, তখন যোহরের নামাজের সময়। হযরত যুবাইর নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, নরাধম ওমর কালবিলম্ব না করেই তার তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড বেগে গর্দানে আঘাত করলো। হতভাগ্য যুবাইর বেশি কিছু বলার আর সুযোগ পেলেন না। এইটুকুই বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন— "হে বিশ্বাসঘাতক, হে আল্লাহর দুষমন, নবীর দুষমন, আলীর দুষমন, আমি চললাম, তোর স্থান জাহান্নাম।" শয়তান ওমর

অতি সত্বর ওখান হতে আলীর শিবিরে হাজির হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করলো। দূত গিয়ে হযরত আলীকে সব কথা বললে, আলী প্রথম কেঁদে ফেললেন, এবং দূতকে বললেন — ওকে বলে দাও ওর স্থান জাহান্নাম। হতভাগা ওমর ধারণা করেছিল— সে এই কাজের জন্য হযরত আলীর নিকট হতে খুব ভাল পুরস্কার পাবে। যখন দেখলো পুরস্কার কোন ধরনের, তখন আর ধৈর্য ধরে প্ররোচক মারওয়ান ও আব্দুল্লার নিকট যাওয়ার মানসিকতাও রাখতে পারলো না। চরম আত্ম-গ্লানির ক্ষোভে— দুঃখে সেই তরবারি দ্বারাই তখনই আত্মহত্যা করল।

নিজারে নিজেই করুক তিক্ত তিরস্কার
এহেন শাস্তি নাই শোধ তুলিবার।

এবার হযরত তালহার পালা ঃ

হযরত যুবাইরকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে দেখে হযরত তালহা এবার তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার মানসিকতাও হারিয়ে ফেললেন। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর হৃদয়কে যেন ক্ষতবিক্ষত করতে থাকলো। তিনিও স্থির করলেন — তিনি আর আলীর সাথে যুদ্ধ করবেন না। এমনকি সেনাদল হতেও দূরে সরে গেলেন। তখন নষ্টের কীট মারওয়ান আবার এটাকেও লক্ষ্য করলো। এবং চিন্তা করলো তালহা আর যুদ্ধ করবেন না। তখন কীট মারওয়ান মনে মনে ঠিক করে নিলো এঁকেও যুবাইয়ের মত অতি সত্বর ওসমানের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে। কেননা এঁরা এখন সত্য (অসত্য) বুঝতে পেরে গেছেন। যখন দেখলেন তালহা যুদ্ধক্ষেত্র হতে সত্যিই সরে পড়েছেন, তখন আর কালবিলম্ব না করে একটু আড়াল থেকে একটি বিষাক্ত তীর সজোরে নিক্ষেপ করলো। নিমেষের মধ্যে তীর তালহা ও তার ঘোড়াকেও আঘাত করল। ঘোড়া বিষাক্ত তীরের আঘাতে সওয়ার-সহ পড়ে গেল। তালহার পা দিয়ে ভীষণভাবে রক্ত ঝরতে থাকল। হযরত কাইফার এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে তালহাকে নিয়ে বসরা যাত্রা করলেন। কিন্তু বসরা পৌঁছবার পর তালহা আর বেশিক্ষণ জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুকালে হযরত কাইফারকে বলে গেলেন— "হে কাইফার তুমি সাক্ষী থেকো, নবীর দুষমন, ইসলামের দুষমন মারওয়ান আমাকে হত্যা করলো। তারই কারণে হযরত ওসমানও হত্যা হলেন। আলীকে আমার এই কথা বলে সালাম দিও। বলার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেলেন। (ইন্না . . . . রাজেউন)। যখনই এই দুঃসংবাদ হযরত আলীর নিকট পৌঁছল, তিনি শোনা মাত্র হা হা করে কেঁদে উঠলেন — "সত্য বলার, সত্য বোঝার মানুষগুলো সব চলে গেল। যখনই যুবাইর সত্যকে অনুধাবন করল, তখনই তাঁকে বধ করা হলো, অনুরূপভাবেই তালহাকেও বধ করা হলো, হে আল্লাহ্ এরা সত্য বলার, বোঝার মানুষগুলোকে আর জীবিত থাকতে দেবে না। আমাকেও কোনদিন ওরাই খতম করবে।" অতঃপর তিনি তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট গভীরভাবে দোয়াখায়ের

করলেন।

বিশ্বাসঘাতকদের হাতে হযরত যুবাইর ও তালহার মত মানুষ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বধ হলেন আপন আপন লোকদের হাতেই। কিন্তু এতেও যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হলো না। বিবি আয়েশার উষ্ট্র.যুদ্ধক্ষেত্রে নামার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের গতি অত্যন্ত তীব্ররূপ ধারণ করে। ওপক্ষে মারওয়ান এপক্ষে আব্দুল্লাহ বিন সাবা প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি বিবি আয়েশার উষ্ট্রের লাগামধারীগণ একের পর এক সত্তর জন অকাতরে প্রাণ হারাল। কিন্তু উটের লাগাম তখনও তাদের হাতেই থাকলো। বসরার মহাবীর আমর ইবনে বাহরা এমন ভীষণ ক্ষিপ্ত গতিতে যুদ্ধ করছিলেন, আলীর যে কোন সৈনিক তার সামনে দাঁড়ানো মাত্র বধ হচ্ছিল। তখন বীর হারেস বিন যুবাইর তার সম্মুখীন হলেন। দু'জনেই প্রচণ্ড যুদ্ধে মেতে গেলেন— কিছুক্ষণের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরের আঘাতে এক সাথেই প্রাণ হারালেন। আলী আক্ষেপভরে বলে উঠলেন— মুসলিম দুনিয়া দু'জন মহাবীরকে হারাল।

শের-ই-খোদা আলী লক্ষ্য করলেন— তাঁর শুধুমাত্র নিছক উপস্থিতি যুদ্ধকে প্রবলতর করে তুলেছে। অনুরূপভাবে বিবি আয়েশার উপস্থিতিও তাই। তখন তিনি আল্লাহর নিকট মোনাজাত করলেন— হে আল্লাহ্। আজ তুমি আমাকে যুদ্ধ করার নয়, যুদ্ধ থামাবার শক্তি দান করো, যুদ্ধ করার কৌশল নয়, যুদ্ধ থামাবার কৌশল দান কর"। এরপরই তিনি সেনাবাহিনীকে বিবি আয়েশার হাওদায় কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে উটের পায়ে আঘাত করতে বললেন। সেনাবাহিনী নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। যুদ্ধ প্রবল বেগে চলছিল। অসংখ্য প্রাণ নিমিষে অকাতরে লুটিয়ে পড়ছে। এবার শের-ই-খোদা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। যেমন করেই হোক যুদ্ধ থামাতেই হবে। তিনি প্রথম তিনবার সজোরে তক্‌বির পড়লেন, অতঃপর অশ্বারোহণে তিনবার তাঁর হায়দরী হাঁকে রণভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বিবি আয়েশার উটের নিকট হাজির হলেন। যেন বাজপাখির আগমনে বজ্রপতন ঘটল। ক্ষণিকের মধ্যে কে কোথায় সরে গেল। যুদ্ধ সমাপ্ত। বাজপাখির আগমনে মরুভূমি যেন বণভূমিতে পরিণত হলো।

যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় ঃ বন্দিনী বিবি আয়েশা (রাঃ)

এবার আলী সৈনিককে নির্দেশ দিলেন— বিবি আয়েশার উটের পেছনের পায়ে আঘাত কর। আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে উট চিৎকার করে বসে গেল। বিবি আয়েশা বন্দী হলেন। এবার সংবিত ফিরে পেলেন। এই অবস্থা হওয়ার পূর্বে হযরত আলী তাঁর আপন ভাই মহম্মদ বিন আবুবকরকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন অনুরোধ জানাতে। তিনি আপন ভগিনীকে অনুরোধ করেছিলেন— "এই অভিশপ্ত অন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র আপনি ত্যাগ করুন। যুবাইর ও তালহা ত্যাগ করেছেন, যার জন্য তাদের

আপন দলের লোক বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তাঁদের বধ করেছে। আপনি সকলের নিকট সম্মানিতা মহিলা, আপনি সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করুন"। তখন তিনি কারো কথায় কর্ণপাত করেননি। এই ঘটনার পর হযরত আলী আবার তাঁর আপন ভ্রাতা মহম্মদকে তাঁর নিকট পাঠালেন। এবার বন্দিনী ভগিনী নিরুত্তরা, নিরুপায়া, নিঃঝুম, নীরব ও নিস্তব্ধ। তবুও ভ্রাতা অতি সম্মানের সাথে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী হযরত কাইফার, হযরত আম্মার প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন বিবি আয়েশার হাওদাটিকে সযত্নে নিচে নামাতে ও লাশভরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে নিয়ে যেতে, এবং পর্দার ব্যবস্থা করতে। অতঃপর আলী তথায় গমন করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বিবি আয়েশা বললেন— "আল্লাহ্ আপনার সকল ত্রুটি মার্জনা করুন। তখন উত্তরে আলী বললেন— "আল্লাহ্ আপনার সকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করুন"।

অতঃপর হযরত আলী বিবি আয়েশাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দিলেন। বিবি আয়েশাকে সালাম জানাবার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন হযরত কাইফার ও হযরত আম্মার। সালাম জানালেন। বিবি আযেশা এঁদের মত দুই মহান সাহাবীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভভরে বলে উঠলেন— "এই ঘটনা ঘটার বিশ বছর পূর্বেই যদি মৃত্যু হতো, কতই না উত্তম হতো"। এই কথা আলী শোনার সাথে সাথে বলে উঠলেন আরো আক্ষেপভরা বাণী। এই যুদ্ধে বিবি আয়েশার পক্ষে ত্রিশ হাজার সেনা ও আলীর পক্ষে ছিল বিশ হাজার। সর্বমোট দশ হাজার সেনা একদিনে এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। আরো হারাতেন যদি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আলী কর্তৃক না ঘটত। বিবি আয়েশার পক্ষে ন' হাজার ও আলীর পক্ষে এক হাজার সৈন মারা যান। যুদ্ধ শেষে আলী সকল শহিদের যথারীতি জানাজা নামাজের ব্যবস্থা করে সকলকে সমাধিস্থ করেন। সমগ্র মনুষ্যকুলের অভিশাপ অমানুষ মারওয়ানের তখন আর দেখা নেই।

ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধই জামালের যুদ্ধ নামে পরিচিত। 'জামাল' আরবী শব্দের অর্থ উট। বিবি আয়েশা উটের উপর চেপে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে ঐ নামে অভিহিত। যুদ্ধকে প্রবলতর করেছিল বিবি আয়েশার উপস্থিতি ও উট, আবার যুদ্ধের আগুন নিভে গেল যখনই ঐ উট পড়ে গেল। তাই এটা উটের যুদ্ধ। এককথায় এই অভিশপ্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাল মহান আলীর উপস্থিতি ও সদিচ্ছা।

আলীর সমরনীতি ঃ

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই হযরত আলী মহানবী কর্তৃক ঘোষিত সমরনীতির কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। সারাদিন যে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ বিশ্ব ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করল, দিবাবসানে সন্ধ্যার কোলে

যুদ্ধসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো মহাশ্মশানের নীরব নিস্তব্ধতা। হযরত আলীর সেনাবাহিনী শিবিরে ফিরল বিশ্রামের জন্য। অপর পক্ষের ছত্রভঙ্গ সেনাদল নিজ নিজ ঘরে ফিরল। হযরত আলী যুদ্ধের ময়দানে আহত সেনাগণের জন্য নির্দেশ দিলেন— যথাযথ সেবা-যত্নের জন্য। এমনকি আহত আঘাতপ্রাপ্ত পশুগুলোর জন্যও ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেন। যেখানে যত আহত সেনা পড়েছিল সকলের নিকট গেলেন, দিলেন চরম সান্ত্বনা। সেনাপতি আলী এখন প্রধান সেবক আলীতে পরিণত হলেন। এইটাই ছিল তাঁর মহান জীবনের চরম মহত্ব। অতঃপর এগিয়ে এলেন বিবি আয়েশার ব্যবস্থাপনায়। ভাই মহম্মদকে নির্দেশ দিলেন ভগিনীকে বসরাতে নেওয়ার জন্য। তাঁকে তুলে আনা হলো তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আব্দুল্লাহ বিন খলফের গৃহে। যদিও আব্দুল্লাহ তখন আর ইহজগতে নেই, যুদ্ধপ্রাঙ্গণে নিহত। সারা বসরাতে শোকের মাতন চলছে। এমন কোন বাড়ি নেই যে বাড়িতে কেউ না কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েনি। এমন কোন একজন নারী নেই, যার পিতা কিংবা ভ্রাতা, কিংবা স্বামী, কিংবা কোন অতি নিকটজন মারা যান নি। প্রতিটি গৃহে হাহাকার শব্দ, কি করুনতম দৃশ্য আজ বসরা নগরীর। যারা ভেবেছিল আজ বিজয় উল্লাসে বসরা হবে নব-বধূর রঙ্গে রঞ্জিত, অতীব দুর্ভাগ্যের কথা, তারা দেখল আজ বিধবা বসরা। খলিফা আলী শোকাতুরা বসরাকে সান্ত্বনা দিতে কোন দিক থেকেই কোন ত্রুটিই করেননি। এখানেই মহাবীর আলী ছিলেন মহামানব। (নবীজীর সমরনীতি ঃ দ্রঃ 'মহানবী')

মিলিত হলেন বিবি আয়েশার সঙ্গে। অত্যন্ত ভক্তিভরে, অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমীহের সাথে তাঁর ব্যবস্থাপনার কোথাও কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, মন কষাকষি প্রভৃতির চিহ্নমাত্র আর থাকলো না। হযরত আলী খোলামনে বিবি আয়েশার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন, তিনিও আলীর নিকট ক্ষমা চাইলেন। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলো। পূর্বের সম্পর্ক আবার চরম অকৃত্রিমতার সাথে উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো। অতঃপর আলী মহম্মদকে নির্দেশ দিলেন আপন ভগিনী বিবি আয়েশাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়াব জন্য, সাথে দিলেন বসরার চল্লিশজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। যাওয়ার পথে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করে দিলেন। বিদায়কালে বিবি আয়েশা একটি ছোট্র ভাষণও দিলেন— "হে আমার বৎস্যগণ ! আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য এই অবাঞ্ছিত দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে গেল। আমাদের মধ্যে কোনদিনই কোন রূপ হিংসা-বিদ্বেষ বলে কিছুই ছিল না। আজও থাকল না।" অতঃপর আলীও অনুরূপ একটি ছোট্র ভাষণ দান করলেন। সকলেই খুব খুশি হলো। বিবি আয়েশা বিদায় নিলেন। হযরত আলী তাঁর সম্মানার্থে অনেক দূর পায়ে হেঁটে এসে উম্মুল মোমেনিনকে সম্মান দেখান, সঙ্গে ছিলেন ইমাম হাসান ও হোসেন এবং আরো অনেকে।

আলীর জয় ও ক্ষমা ঃ

অতঃপর আলী বসরার শাসনতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। এটাও বসরার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করেই করলেন। বাইতুল মালের অবস্থা দেখলেন। তা অতীব শোচনীয় অবস্থায় ছিল। তদানীন্তন গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিদায়কালে বাইতুলমাল একেবারে খালি করে দিয়েছিলেন। এটা একটা শাস্তিমূলক জঘন্য অপরাধ ছিল। এই প্রাক্তন গভর্নরের উস্কানিতেই তদানীন্তন গভর্নর ওসমান ইবনে হানিফকে মারওয়ান তথা কয়েকজন অতি নিষ্ঠুর, অতি অমানবিক শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু মহান আলী আজ প্রতিশোধ নিলেন না। এক বাক্যে সকলকেই ক্ষমা করলেন।

উপসংহার ঃ এই যুদ্ধের মূলে ছিলো প্রধানত অমানুষ মারওয়ান ও তার সহচরবৃন্দ, অন্যপক্ষে ছিল দুষ্টের শিরমণি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই হোক, তারা খুশি হতে পারলো না। যেহেতু অজস্র লোক বধ হলো, কিন্তু শের-ই-খোদা বধ হলেন না। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ক্ষতি করা, মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করা। এরা ছিল প্রকৃত মোনাফেক, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। ইসলামের চোখে মোশরেক অপেক্ষা মোনাফেক বেশি নিন্দনীয়। এদের বহুজন সাধু সেজে আলীর দলে প্রবেশ করেছিল। তখনকার দিনে কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে ডাক দেওয়া হতো। মানুষ দলে দলে সাড়া দিতো। সুতরাং সেখানে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বাছাই করার কোন অবকাশও থাকতো না। এই সুযোগটা তারা নিয়েছিল। এখন এই দলটি আর খলিফার সাথে থাকলো না। মারওয়ান প্রমুখ মোনাফেকের অসৎ চরিত্রের সাথে যোগাযোগ রেখে হযরত আলীর দল ত্যাগ করলো। এবং ইসলামের বৃহত্তর ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়ে সত্য-মিথ্যা নানা কথা দেশে ছড়াতে থাকল খলিফার বিরুদ্ধে। কথায় বলে— খলের ছলের অভাব হয় না। পরবর্তীকালে এই খলের দল নানা ছলে মানুষদের বিভ্রান্ত করতে থাকল। কথায় বলে মিথ্যা কথা শুনতে ভাল, সত্য কথা বলা কঠিন, মিথ্যা কথায় মোহিনী আছে, সত্য কথায় ঝাঁজ আছে। কিন্তু আলীর পথ ছিল সরল, কথা ছিল সত্য, আমরা লক্ষ্য করবো এই গোষ্ঠীটাই পরবর্তীকালে কীট মারওয়ানের মাধ্যমে কুচক্রী মুয়াবিয়ার সাথে যোগদান করে মহান আলীকে বধ করে ইসলামের গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করলো।

রাজধানী মদীনা হতে কুফা (৬৫৭ খ্রীঃ)

একদিন দ্বীনের নবী জন্মভূমি মক্কাতে তিতিবিরক্ত হয়েই মদীনা গমন করেছিলেন। মদীনা তাঁকে সাহস দিয়েছিল, শক্তি দিয়েছিলো, সফলতা দান করেছিল। মদীনায় ছিল আল্লাহর রহমত ও বরকত। ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে হযরত আলী খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর ওপর যে ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাটের ঝড় বইতে

আরম্ভ করলো, তা বর্ণনাতীত। মুয়াবিয়ার হাতে গড়া বিভিন্ন উপাদানে এ মরুঝড় শেষ হলো ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে যখন মহান আলী শহিদ হলেন। এই ঝড় এই তুফানকে মাথায় নিয়ে হযরত আলী ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে মদীনা হতে বের হলেন বসরা ও কুফার পথে । তখন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালমা তাঁর উটের লাগাম ধরে শিশুর মত কেঁদে উঠেছিলেন – "হে আমিরুল মোমেনিন, আপনি মদীনা ত্যাগ করবেন না। আজ যদি মদীনা ত্যাগ করেন, কাল আর ফিরতে পারবেন না। আর কোনদিন মদীনাতে রাজধানী ফিরে আসবে না।" মহান সাহাবীর কথা সত্যে পরিণত হয়েছিল। রাজধানী তো ফিরে এলোই না, বরং মদীনার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র খেলাফত ও নির্বাণলাভ করলো। ইসলাম হারাল তার গণতন্ত্র।

এই রাজধানী স্থানান্তরণে হযরত আলীরও কিছু দোষ ছিল না। তিনি অতি অসহায় ভাবে রাজনৈতিক মরুঝড় মরুতুফানে পড়ে এগিয়ে গেলেন। ১২-ই রজব কুফা নগরীতে প্রবেশ করলেন। বসরাতে বিজয়ী হলেন। বিজয়ী আলীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য তামাম কুফাবাসীগণ কুফার আমীর ভবনকে দারুণভাবে সুসজ্জিত করলেন। বিশাল খানাপিনার ব্যবস্থা করলেন। সংযম ও সাধনার সম্রাট, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সম্রাট এসব দেখে বললেন – মহান নবীর নিকট হতে আমি এ শিক্ষা পাইনি, ইসলাম আমাকে এ শিক্ষা দেয় না। আল্লাহর খোলা মাঠ, খোলা প্রান্তর, এ গরিবের জন্য যথেষ্ট।" তিনি সেই প্রান্তরেই তাঁবু খাটালেন। প্রথম দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। পরদিন মসজিদে জুম্মার নামাজে খোতবায় সকলকে সংযমের, সাধনার, ত্যাগ ও তিতিক্ষার, গরিব দরদী মনের, এবং অমিতব্যয়ী অপচয়কারী, অহঙ্কারী, অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী প্রভৃতির ওপর এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন।

অতঃপর তিনি কুফাতেই থেকে গেলেন। এবং তাঁর প্রথম কাজ হলো খেলাফতকে বিপন্নমুক্ত করা। তিনি যেন বুঝতে পারলেন ইসলামের পূতঃপবিত্র খেলাফত যদি না টেকে, তাহলে ইসলাম একদিন অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কতকগুলো মরা প্রাণহীন নীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ে যাবে। ইসলাম তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলবে। এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই বিজ্ঞ খলিফা প্রথম খেলাফতকে শক্তিশালী করতে চাইলেন। এই কাজকে সুসংহত করার নিমিত্ত তিনি কুফা নগরীকেই রাজধানী রূপে স্থির করলেন। এর পশ্চাতে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্যও ছিল।

১। মহানবী থেকে আরম্ভ করে তৃতীয় খেলাফতের মধ্যকাল পর্যন্ত সমগ্র মদীনা ছিল একটি পবিত্র মসজিদ স্বরূপ। কত বোজর্গ, কত দ্বীনদার, কত ওলী, কত আওলিয়া, কত মহান সাহাবী নবীকে কেন্দ্র করে মদীনাকে করেছিলেন একটি ফুলের বাগান স্বরূপ। তৃতীয় খলিফার মধ্যকাল হতেই সেই বাগান তার স্বরূপ হারাল। বহু ক্ষণজন্মা সাহাবী ইন্তেকাল করে গেলেন। সামান্য কিছু থেকে গেলেন। মদীনা হারাতে বসল তার প্রাণের পবিত্রতম গভীর স্পন্দন।

২। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের শাহাদত বরণের পর যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহাবী ছিলেন, তাঁরা মদীনার চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, খুনোখুনি ও একেবারেই নৈরাজ্যের জন্য নবীর শহর মদীনা ত্যাগ করলেন। মদীনা তার মূল ঐতিহ্য হারাল।

৩। কুফার অবস্থান ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। পক্ষান্তরে মদীনা ছিল আরবের একেবারেই উত্তর প্রান্তে। আরবের দক্ষিণ প্রান্তে মক্কা, তায়েফ, ইয়ামেন, ইয়ামামা ছিল অনেকটা শান্ত নিরাপদ অঞ্চল। পক্ষান্তরে ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম এলাকাগুলো ছিল অতি চঞ্চল, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি। এই ভৌগোলিক দিক থেকে সেদিনের অবস্থানুযায়ী কুফা ছিল রাজধানীর জন্য উপযুক্ত স্থান।

৪। ইসলামি খেলাফতের প্রধান শত্রু ছিল মুয়াবিয়া, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে। দামেস্ক মদীনা থেকে বহু দূরবর্তী, কিন্তু কুফা হতে নিকটবর্তী ছিল। এখান থেকে প্রশাসন ও যোগাযোগের সুবিধা ছিল।

৫। কুফাতে বর্তমান খলিফার সমর্থক দল বেশি থাকায় কুফা তাঁর জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বিবেচিত হয়।

৬। বসরাবাসীরা যোদ্ধা হিসাবে চিরদিন প্রসিদ্ধ ছিল। এবং বসরা ছিল কুফার নিকটবর্তী শহর। সময়ে অসময়ে ডাকা বা সাহায্য পাওয়া সহজ ছিল।

৭। যে শহরে স্বয়ং খলিফা নিজেই নিজ প্রাসাদে বধ হলেন, সেখানকার পরিস্থিতি, পরিবেশ আর রাজধানীর উপযুক্ত ছিল না। তাই রাজধানী মদীনা হতে কুফাতে স্থানান্তরিত হলো। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও মদীনার প্রতি হযরত আলীর ভক্তি ও ভালবাসা কোনদিনই কমে যায়নি। এককথায় রাজনৈতিক চাপে রাজধানীর স্থানান্তরণ হয়েছিল মাত্র।

জীবনের অন্তিম লগ্নে জ্ঞানবীর হযরত আলী একবার নয়, বারবার অনুধাবন করেছিলেন ঐ বিজ্ঞ সাহাবী আব্দুল্লার কথা, যিনি তাঁর উটের লাগাম ধরে শিশুর মত কেঁদেছিলেন – মদীনা ছাড়বেন না। আর আসতে পারবেন না।তাই-ই সত্য হলো। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বারবার অনুশোচনাও জেগেছিল। আর একদিনও মহানবীর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারৎ করার সুযোগ পাননি, আর একদিনও খাতুনে জান্নাত প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী রসুলের প্রাণের টুকরো বিবি ফাতেমার রওজা শরিফ ও জিয়ারত করার সুযোগও পাননি। এর চেয়ে বড় অনুতাপ, বড় অনুশোচনা হযরত আলীর জীবনে আর ছিল না। কেননা একথা কসম খেয়েও বলা যেতে পারে যে, হযরত আলী রাজ্যভোগ করতে চাননি, চেয়েছিলেন ইসলামের খেলাফতকে সুদৃঢ় ও সুন্দর করতে। মহান নবীর আদর্শকে

তুলে ধরতে, মহান আল্লাহর নিশানকে তুলে রাখতে, মহান আল্লাহর বাণী কোরআনকে মানুষের কল্যাণে, মানুষের চরিত্র গঠনে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে।

আজকে যে সমস্ত 'অগত্যা মুসলমান' লাফালাফি দাপাদাপি করছে, তারা সেদিন ছিল কোথায়। যেদিন বদর প্রান্তরে নবী দাঁড়ালেন মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে, যেদিন ওহোদ প্রান্তরে নবী ক্ষতবিক্ষত হলেন, যেদিন খন্দকের যুদ্ধে আরবশ্রেষ্ঠ বীরের বিরুদ্ধে দ্বীনের নবী হযরত আলীকে পাঠালেন, যেদিন খায়বরে সবাই হার মানলো, নবীজী পাঠালেন আলীকে, মহানবীর মহাজীবনে আরো কতদিন এভাবে কেটেছে, যে দিনগুলোতে আলী হায়দার সাক্ষাৎ যমের সাথে পাঞ্জা কষেছিলেন, সেদিন ঐ অগত্যা মুসলমানগণ কোথায় ছিল ! মক্কা বিজয়ের পর আর উড়তে না পেরেই বাধ্য হয়ে বাছাধনরা পোষ মেনেছিল, 'অগত্যা মুসলমান' হয়েছিল।

গভর্নর নিয়োগ ঃ

মহানবী বলেছিলেন – যাঁরা (তাঁর জীবিতকালে) মক্কা বিজয়ের পর (অগত্যা) মুসলমান হলো, তাদের ইসলামের কোন গৌরবজনক পদ দেওয়া হবে না।" ঐ মানুষগুলো মুসলমান হলেও মহানবীর চোখে চিহ্নিত ছিল 'অগত্যা মুসলমানরূপে'। এমনকি মহানবী ঐ মুসলমানদের দু'-একজন সম্পর্কে কঠোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও ঘোষণা করেছিলেন। কিছু মানুষের বিশেষ অনুরোধে দয়ার নবী শাস্তি প্রয়োগ করেননি। কিন্তু তাদের তিনি তাঁর সামনে আসতে নিষেধ করে দিয়েছিলন। এতই ঘৃণার চোখে দেখতেন। অথচ ঐ রূপ কোন এক ব্যক্তিকে (আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ) তৃতীয় খলিফা মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করে দেশ ও দশের চূড়ান্ত বিরাগভাজন হয়েছিলেন। খলিফার ঐ কাজে মহানবীর অমর আত্মা কি খুশি হয়েছিল ! এ কাজে হযরত আলী তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন খলিফার। অনেকে বলেন, হযরত ওসমান তাঁর আপনজনদের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তাই হযরত আলী খুবই চটে গিয়েছিলেন, রাগান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। তিনি আপনজনদের গভর্নর করার জন্য বিরক্ত হননি, বরং অসৎ জনদের গভর্নর করার জন্যই বিরক্ত হয়েছিলেন।

তিনি যখন খলিফা হিসাবে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন তখন প্রধানত তিনটি জিনিস ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলেন—

১। খলিফার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যতা, ২। সততা বা সাধুতা, ৩। যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা। এই ভিত্তিতে তিনি গভর্নরদের নিযুক্ত করলেন বা করতেন।

১। বসরা — আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

২। খোরাসান — খোলাইদ ইবনে কাস

৩। মাদায়েন — ইয়াযিদ ইবনে কায়েস

৪। সিজিস্তান — রবী ইবনে কায়েস

৫। ইস্পাহান — মহম্মদ ইবনে সুলাইম

৬। কাসকার — কাদামা ইবনে আজলান আবদি

৭। জাযিরা মসুল — মালেক ইবনে আশতার নাখঈ

ইসলামের বড় দুষমন-মোনাফেক আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবাঃ

মোনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার দলবল নিয়ে ওসমান হত্যা মূল লক্ষ্য ছিল না। মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম হত্যা। মোনাফেক যখন লক্ষ্য করলো হযরত আলী বসরা বিজয় করে জাঁকিয়ে বসেছে, এখনও যদি তাঁকে সাহায্য করা যায়, তাহলে তিনি সিরিয়ার মুয়াবিযাকেও পরাস্ত করে সারা দেশে নির্বিঘ্নে ইসলামের শান্তি পতাকাকে তুলে ধরবেন। তার লক্ষ্য হলো যেমন করেই হোক এটাকে রোধ করতে হবে। এই একমাত্র উদ্দেশ্যেই তিনি পারস্যের সিজিস্তানে বিদ্রোহ আরম্ভ করলেন। তখন খলিফা বিদ্রোহ দমনে আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ তায়ীকে পাঠালেন। যুদ্ধে সাবায়ীগণের হাতে আব্দুর রহমান পরাজিত ও সদলবলে নিহত হলেন। এই দুঃসংবাদে খলিফা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সিজিস্তানের গভর্নর রবি ইবনে কায়েসকে নিযুক্ত করলেন এই বিদ্রোহ দমনে। রবির প্রচণ্ড আক্রমণে সাবায়ীগণ কিছু সংখ্যক ছাড়া সকলেই প্রাণ হারাল। পরে এই কিছু সংখ্যকই কালসাপ রূপে সিফফিনের ভীষণ যুদ্ধে আলীর দলে ঢুকে পড়ে। এইভাবে তারা নিজরা নির্মূল না হয়ে ইসলামকেই নির্মূল করার প্রচেষ্টায় থাকলো আজীবন।

ইরান সম্রাট খসরু-দুহিতা ঃ

খোরাসনের নবনিযুক্ত গভর্নর খুলাইদ ইবনে কাস শাসনভার গ্রহণ করার পরই জানতে পারলেন— পারস্য সম্রাট-তনয়া নিশাপুরে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্খাকে তিনটি জিনিস সাহায্য করেছিলো— ১) তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, ২) অবিবাহিতা, ৩) বুদ্ধিমতি। গভর্নর খুলাইদ কালবিলম্ব না করেই নিশাপুর যাত্রা করলেন নিজেই সদলবলে। সংঘর্ষে রাজবন্দিনী রাজকুমারীকে খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন – কেন সে বিদ্রোহী হয়েছিল? উত্তর – পিতার সাম্রাজ্য উদ্ধার। খলিফা বললেন— এখন কি চাও। উত্তর – ক্ষমা ও স্বাধীন জীবন। খলিফা-তাই মঞ্জুর করলাম জীবনে আর কতবার বিদ্রোহ করবে? উত্তর – আপনার মত মানুষের বিরুদ্ধে আর একবারও নয়, আপনি এক সঙ্গে খলিফা ও সত্যিই একটি আদর্শ মানুষ। খলিফা তাঁর

বুদ্ধিমত্তা ও সাহস এবং সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রস্তাব দিলেন – "তুমি আমার পরিবারেও থাকতে পারো। উত্তর – কি করে থাকবো ? খলিফা – তুমি তো এখনও অবিবাহিতা, আমার বড় ছেলে হাসানের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঘরসংসার করতে পারো। উত্তর – তিনি তো নিজেই এখন অন্যের ওপর নির্ভরশীল, তাঁকে কি করে বিয়ে করবো। আমি সম্রাটের মেয়ে। আপনাকেই বিয়ে করে সম্রাজ্ঞী হতে চাই। খলিফা – তা হবে না। তুমি আজ মুক্ত, তুমি স্বাধীন, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, বিয়ে করতে পারো। অতঃপর রাজদুহিতা বিদায় নিলেন। জীবনে আর কোন দিন বিদ্রোহ করেননি। তবে পরবর্তী জীবনে ভীষণ ভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, খলিফার প্রস্তাব না মেনে।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামের খেলাফত ধ্বংসে চক্রান্তের চার শিরমণি

১। চক্রান্তের মধ্যমণি আমির মুয়াবিয়া ঃ

আমির মুয়াবিয়ার পিতা ছিলেন আরব-প্রতিভা আবু সুফিয়ান। তবে এই প্রতিভাকে বলতে হবে বিপথগামী প্রতিভা (perverted genius)। প্রবল ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি তাকে আরব নেতৃত্বের অধিকারী করেছিল। একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবে ইসলামের প্রথম যুগে ইসলামের মহান নবীকে ঘরছাড়া, দেশছাড়া ও একেবারেই নিশ্চিহ্ন করতে তখনকার মক্কার মাটিতে যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর মানুষ জন্মিয়েছিলেন, আবু সুফিয়ান তাদের অন্যতম, একথাতেও কোন সন্দেহ নেই। এমন কোন অবিচার, অত্যাচার, অনাচার ছিল না, যা তারা মহান নবীর প্রতি ও তাঁর মহান সাহাবীদের ওপর প্রয়োগ করেনি। মহান আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও নবীজীর অসীম ধৈর্য না থাকলে তাঁরা মক্কার মাটিতেই হয়তো বিলীন হয়ে যেতেন। কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে নবীজী বিলীন হননি, ওরাই বিলীন হলো, এবং বিলীন হওয়ার পর আর যখন কোন উপায়ই থাকলো না। তখনই তাঁরা 'অগত্যা মুসলমান' হলেন। তাই ওদের 'অগত্যা মুসলমান' বলা হয়ে থাকে। আমির মুয়াবিয়া ঐ আবু সুফিয়ানের সন্তান।

আমির মুয়াবিয়ার মাতার নাম হিন্দা। হিন্দার পিতার নাম ওৎবা। ওৎবা মহানবীর বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে মহাবীর হামজার হাতে নিহত হয়। অতঃপর ওহোদ প্রান্তে যে যুদ্ধ বাধল, সেখানে অতি অতর্কিতে মহাবীর হামজার প্রতি বিরোধী পক্ষ আঘাত হানলে হামজা শহিদ হন। এবং হিন্দা বীর হামজার নাক, কান ও চোখকে কেটে বিকৃত করে। তৎপর হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাঁর শরীর হতে হৃদপিণ্ড বের করে সকলের সম্মুখে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে বিশ্ব ইতিহাসের হিংস্র জীবজন্তুদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আমির মুয়াবিয়া এই বিশ্বনিন্দিতা জগৎ ইতিহাসের এই জঘন্যতম অধ্যায় সৃষ্টিকারিণী মহিলা হিন্দার গর্ভজাত সন্তান।

মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে নিরুপায় পিতা আবু সুফিয়ানের সঙ্গে, পুত্র চতুর মুয়াবিয়াও ইসলামে দীক্ষিত হন। লেখাপড়া জানতো বলে মহানবী মুয়াবিয়াকে অন্য কয়েক জনের সাথে ওহী (প্রত্যাদেশ বাণী) লেখকও নিযুক্ত করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইয়াজিদ সিরিয়ার জেলাশাসক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে মুয়াবিয়া ঐ পদ পান। পরে হযরত ওমরের খেলাফতে আপন কর্মগুণে ও কর্মদক্ষতায় গভর্নরও

হন। খলিফা ওসমান তাঁকে ঐ পদে স্থায়ী করেন। একটানা বাইশ বছর একই স্থানে একই পদে থেকে বিশাল শক্তি সঞ্চয় করে জীবনের আসল জিনিসটি হারিয়ে ফেলেন— প্রকৃত সাহাবা চরিত্র। কেননা অধিকাংশ সাহাবা জীবনের সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কোন মতেই 'সাহাবা চরিত্র' ত্যাগ করেননি। যেহেতু পরে আমরা লক্ষ্য করলাম এই সংসারের নকল বা ক্ষণিক স্বাদ লাভের জন্য কোথাও মুয়াবিয়া ধূর্তকুল চূড়ামণি কোথাও শত্রুকুল চূড়ামণি, কোথাও ইসলামি গণতন্ত্রের প্রাণনাশকারীদের প্রধান। ভন্ডতা, শঠতা, কপটতা, চাটুকারিতা প্রভৃতি বহু জিনিস তাঁর অমূল্য চরিত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মহানবীর একজন বিশেষ সাহাবী ওহী লেখকের জীবনে এগুলো মোটেই শোভনীয় হয়নি। কেননা মহানবী বলেন – "হাসানাতুল আবরার সাইয়াতুল মুকাররেবিন" – আল্লাহর নিকট যারা দূরস্ত ব্যক্তি, তাদের পুণ্য, আল্লাহর নিকটস্থ ব্যক্তিদের জন্য পাপ স্বরূপ। অর্থাৎ জ্ঞানীর কাজ অজ্ঞানী অপেক্ষা অনেক উন্নতমানের হতে হবে। এই অধ্যায়ে মুয়াবিয়া চরিত্র বড়ই দুঃখজনক, অতিশয় নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

কিন্তু এই জীবনের অন্য অধ্যায়ে যখন তাঁকে দেখি তখন তুলনাহীন শাসক, তুলনাহীন সংগঠক, তুলনাহীন কূটনীতিবিদ, তুলনাহীন সম্রাট। পৃথিবীর যে কোন শক্তিধর সম্রাটের পাশে যে কোন সফল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পাশে অবলীলায় আরব-প্রতিভা উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়াকে অনায়াসে বসানো যায়। আমির মুয়াবিয়ার মনে কেন এই উচ্চাশা জাগল, তাঁকে খলিফা বনাম সম্রাট হতে হবে, এর মূলে তাঁর কি কোন মানসিক রোগ ছিল? আমরা উত্তরে বলতে বাধ্য, তাঁর মনে সেরূপ কোন কিছু ছিল না, এটা পরবর্তীকালে জন্ম নিলো। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁর এই উচ্চাশার বা স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিলো। সেটা কোন পরিবেশ, কোন পরিস্থিতি, আমরা লক্ষ্য করছি খলিফা ওমরের সময় তিনি অতি সাধারণবেশী একজন আমির মাত্র। কেননা খলিফা ওমরের চাকর ইরফা খলিফাকে যতটা ভয় করতো, আমির মুয়াবিয়া খলিফাকে তা অপেক্ষা শতগুণ বেশি করতেন। সুতরাং এই সময়ে আমির মুয়াবিয়ার মনে কোন স্বপ্নই জাগেনি। যখনই হযরত ওসমানের খেলাফতকাল এল, তখনই খলিফার চরম উদারতা ও ভীষণ দুর্বলতার সুযোগে তিনি নামকা-ওয়াস্তে তাঁর অধীনে আমির থাকলেও আপন আচরণে ও শাসনে নিজেকে স্বয়ং খলিফা বলেই মনে করতেন। সুতরাং এই যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের সৃষ্টি হলো, এখানেই জন্ম নিল মুয়াবিয়ার সাধের স্বপ্নজগৎ। খলিফা ওসমানের চরম দুর্বলতা ও ভীষণ উদারতাই ছিল মুয়াবিয়ার এই ভীষণ ও মারাত্মক উচ্চাকাঙ্খার জন্মদাতা। আমির মুয়াবিয়ার এই বেপরোয়া ব্যবহারের জন্য হযরত আলী বহুবার খলিফা ওসমানকে সতর্ক করে বিরাগভাজনই

হয়েছিলেন, ফল কিছুই হয়নি। বরং এই বলাতেই হযরত আবুযর গিফারির মত মানুষের মরুভূমিতেই নির্বাসনদণ্ড হয়েছিল, এবং তিনি ওখানেই মারা যান। একটি মানুষের অন্তরের সরলতা, উদারতা ও মানসিক দুর্বলতা এবং শারীরিক বার্ধ্যক্যতার মধ্যে একদিন জন্ম নিল ইসলামের বিশাল খেলাফত ধ্বংসের সুপ্ত বীজ। এই বীজ বিদ্রোহীদের প্লাবনে তার শক্ত মাটি খুঁজে পেলো আমির মুয়াবিয়ার মনের বনে মহীরুহ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে।

এই মহীরুহটি কিভাবে মুয়াবিয়ার মনের উর্বর মাটিতে চারাবৃক্ষ রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অতি সংক্ষেপে খলিফা আলী মুয়াবিয়াকে আনুগত্যের জন্য পত্র দিলেন। আমির মুয়াবিয়া খলিফা আলীকে চরম উপহাস করেই তার উত্তরে একটি পত্রবিহীন খাম পাঠালেন। খলিফা আলী খাম খুলেই অবাক। কিন্তু খলিফা তখন কিছু করতে পারলেন না। যেহেতু সাহাবী যুবাইর ও তালহা এবং বিবি আয়েশা তাঁকে নানা কারণে নানা দিক থেকে বিব্রত করে তুলেছেন।খলিফার এই বিব্রতকালে সুযোগসন্ধানী আমির মুয়াবিয়া আপন ঘর সামলিয়ে প্রচুর শক্তি সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় কারণ, খলিফা আলী জ্ঞানগরিমা, ত্যাগতিতিক্ষা, সাধনা-সংযমতা, মনুষ্যত্ব-মানবতা, বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতির ছিলেন জীবন্ত রূপ এবং জাগ্রত মূর্তপ্রতীক। অন্যদিকে আমির মুয়াবিয়া স্বার্থসিদ্ধি কুটবুদ্ধি, বদবুদ্ধি, আদর্শচ্যুতি শঠতা ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘতকতা প্রভৃতির ছিলেন সিদ্ধহস্ত সুনিপুণ মানুষ।

এইভাবে যুবাইর, তালহা ও বিবি আয়েশার বিরোধিতায় পরিস্থিতি ও পরিবেশ ঐ শিশু চারাবৃক্ষটির আত্মপ্রকাশের জন্য অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। অধিকন্তু খলিফা আলীর মনুষ্যত্ব ও মানবতার সুযোগ নিয়ে এবং তৎসঙ্গে চতুর আমির মুয়াবিয়ার বিবেকের বিসর্জনে ঐ চারাবৃক্ষের সুপ্ত বীজ একদিন শক্তিশালী মহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্থ করল।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি – আমির মুয়াবিয়া ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ ও সংগঠক। খলিফা আলী যখন বসরা প্রভৃতি নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিলেন, তখন আমির মুয়াবিয়াও আপন কাজে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি খুবই শৃঙ্খলার সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শহিদ খলিফা ওসমানের রক্তাক্ত জামা ও বিবি নায়লার কর্তিত অঙ্গুলি তিনি সারা দেশে খুবই সুষ্ঠুভাবে জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরছিলেন। দামেস্কর মসজিদে ঐগুলোকে কাঁচের আলমারিতে রাখা হয়েছিল। তিনি প্রতিটি অঞ্চলে উপযুক্ত বেতনভোগী মানুষও নিযুক্ত করেছিলেন জনগণকে খলিফা হত্যার ব্যাপারে উত্তেজিত করার জন্য। এইভাবে তিনি সারা দেশজুড়ে এক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেন এবং প্রবল জনমত গড়ে তোলেন।

আর একটি বিরাট কাজ তিনি করেছিলেন, শুধুমাত্র আম-জনগণকেই হাত করেননি, হাত করেছিলেন সেদিনের প্রকৃত আরব মেধাগুলোকেও। আমির মুয়াবিয়ার চরিত্রে মানুষ চেনার একটি বিশেষ গুণ ছিল। কোন মানুষের দ্বারা কি কাজ করানো যাবে, সেটা খুব ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। এবং এই কাজে পরিবেশও তাঁর সহায়ক হলো। সিরিয়ার বাইতুলমাল (কোষাগার) ধনরত্নে ভরপুর ছিল। তিনি সেই অগাধ ধনভান্ডারকে জনমত সংগঠনে ও আরব রাজনৈতিক মেধাগুলোকে স্বপক্ষে আনার জন্য পুরোপুরি কাজে লাগালেন। একজন আরব রাজনীতিক ও কূটনীতিককে জয় করা নিমিত্ত পাঁচ হতে দশ লক্ষ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) অবলীলায় অবারিতভাবে খরচ করলেন। বলতে যদিও খারাপ লাগে আমির মুয়াবিয়া স্রেফ লোভে-প্রলোভনে, পদে-পদবিতে, এবং টাকার জোরে আরব মেধাগুলোকে রাতের আঁধারে ছাগল বাঁধা করে বেঁধে ফেললেন। এই মেধাগুলোর অন্যতম ছিলেন— আমর ইবনুল আস, মুগিরা বিন শোবা এবং যিয়াদ বিন সামিয়া প্রমুখ।

অন্যদিকে, খলিফা আলীর সাথে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব সাধু চরিত্রের সাহাবা, কিছু সহজ সরল জনতা এবং কিছু মানুষ যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওসমান হত্যার সাথে জড়িত। এই শেষোক্ত মানুষগুলোর জন্য আমির মুয়াবিয়ার জনমত গঠন করাটাও আরো সহজ হয়ে উঠলো খলিফা আলীর বিরুদ্ধে। খলিফা এই মানুষগুলোকে শনাক্ত করার পূর্বেই চতুর মুয়াবিয়া আপন কাজ হাসিল করে ফেলেন। এটাও তাঁর চরম বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। এককথায় বলতে গেলে মহান আলীর সততা, সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সুচতুর মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র, শঠতা ও নীতিভ্রষ্টতা মক্কার মাটিতে মহানবীর এক নম্বর শত্রু আবু সুফিয়ান তনয় মুয়াবিয়ার জন্য আবব জাহানে সাফল্যের সিংহদ্বার খুলে দিল।

২। চক্রান্তের শিরমণি আমর ইবনুল আস

মহান আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ নানা গুণে, নানা অগুণে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেউ বা সরল সহজ, কেহ কঠিন কঠোর, কেউ বা ত্যাগী, কেউ বা ভোগী, কেউ বা জ্ঞানী, কেউ বা ধ্যানী, কেউ বা ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, কেউ বা নীতিভ্রষ্ট-ভ্রষ্টাচার, কেউ বা কূটনীতিতে বিজ্ঞ, কেউ বা দূরদর্শিতায় প্রাজ্ঞ, কেউ বা বিবেকবান, কেউ বা বিবেকহীন, কেউ বা স্বার্থপর, কেউ বা পরকল্যাণী, কেউ বা সত্যাবাদী, কেউ বা মিথ্যাবাদী। মহানবীর যুগেও এসব মানুষের অভাব ছিল না। তবে তাঁর সুমহান সংস্পর্শে যাঁরা একটু বেশি সময় কাটাবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃত পরশমণিরই স্পর্শলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। তবে অনেক সাহাবীই খুব কম সময় পেয়েছিলেন তাঁর সুমহান সান্নিধ্যে। তাঁদের অনেকের চরিত্রও ঠিকমত গড়ে

উঠতেও পারেনি। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই এই শ্রেণীতেই পড়েন।

আমর ইবনুল আস তদানীন্তন আরব রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদদের অন্যতম ছিলেন। স্বয়ং ওমর ফারুক তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতাকে মর্যাদা দিয়ে মিশরের গভর্নর জেনারেল রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে হযরত ওসমানের খেলাফতকালে নানা কারণে পদচ্যুত হন। হযরত ওসমান যখন শহিদ হলেন, তখন চতুর রাজনীতিবিদ সপরিবারে মদীনা হতে মক্কা না গিয়ে একেবারে বায়তুল মোকাদ্দাস জেরুজালেমে হাজির হয়ে আরব রাজনীতির আকাশে যে কালমেঘ, যে গ্রহফের, যে অশুভ লক্ষণ দেখা দিল. তার প্রতিকারের ব্যবস্থা বা প্রতিবিধান না করেই আপন স্বার্থসিদ্ধির নিপুণ সন্ধানে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করে পরিস্থিতি ও পরিবেশের ওপর তীব্রভাবে লক্ষ্য রাখতে থাকলেন। হযরত আলী, যুবাইর, তালহা, বিবি আয়েশা প্রমুখ নেতৃবর্গের মধ্যে যখন ভুলবোঝাবুঝি চূড়ান্ত পর্যায়ে. তখন তিনি লক্ষ্য করছিলেন সমগ্র আরবের ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হোক, ইসলামের ভাগ্যাকাশ জাহান্নামে যাক, মহানবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত খেলাফত (গণতন্ত্র) পাতালে যাক, কেবলমাত্র তাঁর ভাগ্যাকাশে যেন সৌভাগ্যের চাঁদটি ষোলকলায় উদিত হয়। তাঁর কি উচিত ছিল না, তাঁর মত রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদের ইসলামের খেলাফতের এই চরম দুঃসময় ও দুর্দিনে পরিস্থিতির ন্যায়সঙ্গত মোকাবিলার জন্য সম্মুখভাগে এগিয়ে আসা। এখানেই বোঝা যায় তিনি কতটুকু ইসলাম-দরদী ছিলেন। কতটুকু আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলগামী ছিলেন।

একদিন এই পরিস্থিতিতে আমর তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্রকে ডাক দিলেন।জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তাঁর কি করা কর্তব্য। পুত্র উত্তরে বললেন – "হে পিতা, স্বয়ং মহানবীর সময়, প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার সময়ও আপনি তাঁদের খুবই বিশ্বাসভাজন ছিলেন ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিতও ছিলেন। আজ ইসলামের মহান খেলাফতকে কেন্দ্র করে যে ভীষণ গোলযোগ দেখা দিয়েছে, সেই গোলযোগ নিরসনে শুধুমাত্র ইসলামের খেদমতে আপনার ন্যায় ব্যক্তির যোগ্য ভূমিকা পালন করা উচিত বলে মনে করি। সকল জ্ঞানী উম্মতই নায়েব-ই-নবী। আমরা যদি এটা ভুলে যাই, কোন মুখে হাশরের মাঠে নবীজীকে মুখ দেখাবো।" এবার কনিষ্ঠ পুত্র বললেন – "আপনি একজন প্রবীণতম ও প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, আপনার উচিত এই বিভ্রাটকালে, এই বিপ্লব মাঝে আপন প্রভাবের ফসল তুলে নেওয়া।" তখন পিতা উভয় পুত্রের পরামর্শ শুনে বললেন— "আব্দুল্লার কথা শুনলে দ্বীনের কল্যাণে আখেরাতের মঙ্গল অনিবার্য এবং মহম্মদের কথা শুনলে দুনিয়ার কল্যাণ অবশ্যই।"

অতঃপর বৃদ্ধ আমর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেন। দেখা গেল তাঁর এই পরিণত বয়সেও কোথায় গেল মহান নবীর সাহচর্য, কোথায় গেল প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফাগণের হিতোপদেশ, কোথায় গেল আপন বিবেকের সামান্যতম দংশন, তাঁর দ্বীনের ওপর দুনিয়া সরবে বিজয় ঘোষণা করলো এবং তিনি পার্থিব লোভে ও লালসায় মুয়াবিয়ার দরবারে হুমড়ি খেয়ে আছড়িয়ে পড়লেন। জীবনসায়াহ্নে ভুলে গেলেন পবিত্র কোরআনের ঐ অমোঘ বাণী – "তোমার পরবর্তী (জীবন) কাল পূর্ববর্তী (জীবন, কাল অপেক্ষা শ্রেয়।" ২ঃ ৪১, ৪২, ৯৩ঃ ৪।

সিফ্ফিনের যুদ্ধে এই প্রবীণ সাহাবী মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে খলিফা আলীর সাথে যে শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিলেন হাশরের মাঠে কোন মুখে তিনি মহানবীর সামনে দাঁড়াবেন। ইসলামে আর যাই থাক, কোন বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক ও প্রতারকের স্থান নেই। প্রবীণতম সাহাবী মূসা আশয়ারিকে তিনি যেভাবে স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় প্রতারিত করেছিলেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিশ্ব প্রতারককেও হার মানায়, নজিরবিহীন। মানবতার মূর্ত প্রতীক মহান আলী কয়েকটি অমানুষের হাতে বলি হলেন। ইসলামের নির্ভেজাল গণতন্ত্র ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে পরিণত হলো। এ পাপ মহাপাপ। এরা মানবতার দুষমন।

এঁদের অতি সঙ্কীর্ণ মনের স্বার্থান্বেষী কার্যকলাপ শুধু হযরত আলীকেই ক্ষত-বিক্ষত করল না, কেবল মাত্র ইসলামের ও মুসলমানদেরই ক্ষতিই করল না, ইসলাম এসেছিল বিশ্ব মানবের পরিত্রাণে ও কল্যাণে। সুতরাং তাঁরা বিশ্ব মানবেরই ক্ষতি করলেন। এ অন্যায় মহা অন্যায়। এ অপরাধ বিশ্ব সমাজের জন্য মহা অপরাধ।

৩। মুগিরা বিন শোবা ঃ

মুগিরা ছিলেন একজন প্রবীণ সাহাবী। জ্ঞানী, বিচক্ষণ, রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ। দ্বিতীয় খলিফার শাহাদত বরণকালে তিনি কুফার গভর্নর ছিলেন। হযরত আলীর নিকট আত্মীয়ও ছিলেন। হযরত আলী যখন খেলাফতের প্রথম দিকে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছিলেন, তাতে তিনি একমত হতে পারেননি। আমাদের মনে হয় খলিফা যদি এই প্রবীণ সাহাবীর কথা বা পরামর্শ গ্রহণ করতেন, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা অবনতির দিকে যেতো না। কিন্তু খলিফা যখন তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না, বা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন না, তখন তিনি আর ধৈর্য না ধরেই মক্কায় যুবাইর, তালহা ও বিবি আয়েশার সাথে যোগদান করলেন।

এবং তাঁদের সাথে অভিযানে বসরাভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু বিচক্ষণ মুগিরা যখন বুঝতে পারলেন যে, এঁদের সাথে থেকেও কোন লাভ হবে না, তখন তিনি আপন দূরদর্শিতা বলেই পথিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে একেবারে দামাস্কে মুয়াবিয়ার দরবারে হাজির হলেন। মুয়াবিয়া হাতেনাতে এমন একজন কূটনীতিবিদকে পেয়ে যেন স্বর্গ হাতে পেলেন। তিনি তাঁর দাবি সঙ্গে সঙ্গে বিশাল অঙ্কে পূরণ করে দিয়ে তাঁকেও বেঁধে ফেললেন। তিনিও যা চাচ্ছিলেন তাই পেলেন। আরম্ভ হলো কূটনীতি, রাজনীতি, ষড়যন্ত্র, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা। এখানে ইসলাম হলো গৌণ, স্বার্থ হলো মুখ্য।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার থাকা দরকার যে, ঐ জটিলতম সময়ে যাঁরাই হযরত আলীর নিকট গিয়েছিলেন ও তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, পরামর্শগুলো ছিল কূটনীতিতে ভরা। বিরোধটা বেধেছিল এখানেই। হযরত আলী সমস্ত কিছু করার পূর্বে একবার দেখে নিতেন মহানবীর নীতির দর্পণে, যে মহানবীর নিকট তিনি নাবালক অবস্থা থেকে অবস্থান করেছিলেন। জগতের ক্ষুদ্র হতে যে কোন বৃহত্তর স্বার্থও তাঁকে কোনদিনই ঐ পথ হতে পথচ্যুত করতে পারেনি। ঈমানকে বিক্রি করে, আমানকে বন্ধক দিয়ে তিনি কোন নীতিই পছন্দ করতেন না। তিনি ভাবতেন– জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় জয় নীতির জয়, সর্বাপেক্ষা বড় পরাজয় নীতির পরাজয়। এই অগ্নিপরীক্ষাতে মুগিরা বিন শোবা টিকতে পারলেন না। কিন্তু তাঁদের মত প্রবীণ সাহাবীবৃন্দ এই কঠিন পরীক্ষার যোগ্যতম পরীক্ষার্থী ছিলেন। জাগতিক টানাপোড়েনে পড়ে এই সত্যটিকে তাঁরা অনুধাবন করলেন না। অর্থের প্রবল টানে দামেস্কে হাজির হলেন এবং সম্পদের শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়লেন। ওখানে একটিই নীতি কাজ করল— পয়সা ও পদ। ইসলাম হলো গৌণ, আখেরাত হলো মৌন, দুনিয়া হলো মুখ্য।

তাহলে এই সমস্ত মানুষ, যাঁরা একদিনের জন্যও মহানবীকে পেয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর স্বর্ণযুগকে লাভ করেছিলেন, তাঁদের গুরুদায়িত্ব কত বেশি ছিল, তাঁদের সম্মান যেমন ছিল অপরিসীম, তাঁদের কর্তব্যও তেমনি ছিলো অতুলনীয়। কেবলমাত্র ফাঁকিবাজির সাথে নবী-সাহাবা হওয়ার সুযোগে দু'হাতে মানুষের দেওয়া সম্মান কুড়িয়ে নেবো, আর নবীর নীতির প্রয়োগের বেলায় পাশ কাটিয়ে চলে যাবো, এতো নিরেট ধান্দাবাজদের ব্যাপার। এঁরা ছিলেন সেই প্রকৃতির দাসানুদাস ধান্দাবাজ।

যিয়াদ ইবনে সামিয়া (আবু সুফিয়ান)

হযরত ওমরের খেলাফতকালে যিয়াদ কুড়ি বাইশ বছরের একজন খরদীপ্ত যুবক। সুতরাং যিয়াদের জন্ম প্রায় ৬২২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়। যখন আবু

সুফিয়ানের অমানুষিক অত্যাচার, এমনকি হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রে মহানবী তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। যিয়াদের মাতা সামিয়া ছিল আবু সুফিয়ানের ক্রীতদাসী। এই সামিয়ার সাথে আবু সুফিয়ানের ঘনিষ্ঠ যৌন সম্পর্কও ছিল। ঐ সম্পর্কের ফসল যিয়াদ। এইজন্য যিয়াদকে অনেক ঐতিহাসিক জারজ বা অসতী মায়ের সন্তানও বলে থাকেন। তবে সে-যুগে এগুলো খুবই প্রচলিত ছিল, শুধু আরবে নয়, সারা পৃথিবীতেই। দাসপ্রথার লীলাভূমি রোমান সাম্রাজ্য। এবং দাসপ্রথার প্রথম নিষিদ্ধকরণ ও উচ্ছেদভূমি মহানবীর আরবভূমি পবিত্র মদীনা। মহানবী সেদিন ঘোষণা করলেন —

যে-কাজ আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়তর
তোমরা সকলে আজ দাসমুক্ত কর। —হাদিস

ইসলাম জগতের হযরত বেলাল ও হযরত আম্মার দাস ছিলেন প্রথম। পরবর্তী জীবনে তাঁরা মহানবীর সংস্পর্শে এত দূর উঠলেন যে, আজ মুসলিম জাহানে তাঁদের এত সম্মান, যা বলে শেষ করা যায় না।

প্রথম যৌবনেই যিয়াদের প্রতিভা প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। এবং অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল। এমনকি খলিফা ওমরের মত মানুষও কুফার গভর্নর আবু মূসা আশয়ারিকে তাঁর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করতে বলতেন। তাঁর বক্তৃতাশক্তি, বাগ্মিতা, ভাষাজ্ঞান, হঠাৎ বুদ্ধি, সাহস ও সাংগঠনিক শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, একদিন আমরের মত কূটনীতিবিদও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, "যিয়াদ যদি সোজাসুজি কোরেশ বংশে জন্ম নিতে পারতো, তাহলে সমগ্র আরব ওর বুদ্ধিমত্তার নিকট নত হতে বাধ্য থাকতো।" যিয়াদ আসলে আবু সুফিয়ানের ঔরসে কোরেশ রক্তেই তৈরি। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি বলতে যা, কোম্পানির সেই লেবেলটি পাননি।

হযরত আলীর সাথে যিয়াদের সম্পর্ক ভালই ছিল। যিয়াদ আলীর খুব ভক্তও ছিলেন। মুয়াবিয়া চিন্তা করলেন – যিয়াদের মত একজন ক্ষণজন্মা যুবককে যে কোন প্রকারেই হাত করতে হবে। প্রথম প্রথম চেষ্টা করলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হলেন। এদিকে যিয়াদ চিরদিন তাঁর একটি ব্যাপারে কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতেন না। সকলেই তাঁকে তাঁর মাতার নামে ডাকতো। অর্থাৎ পিতাহীন সন্তান। তিনি একবার চেষ্টা করেছিলেন – আবু সুফিয়ানকে পিতা রূপে ব্যবহার করতে। কিন্তু মুয়াবিয়া তাতে প্রবল বাধ সাধলেন। সুতরাং কাজ হলো না। অগত্যা আবার মাতার নামে পরিচিত হতে থাকলেন। মুয়াবিয়া যিয়াদের এই দুর্বলতাটা খুব ভালই জানতেন। তিনি ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন। যিয়াদকে প্রস্তাব দিলেন – তিনি তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানকে আপন পিতা বলে পরিচয় দিতে পারবেন, যদি মুয়াবিয়ার

পক্ষে আলীর বিরুদ্ধে যোগ দেন। মানুষের সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা মানুষের নিকট চিরদিনই খুব বড় জিনিস। যিয়াদ তাঁর বহুদিনের আকাঙ্খিত বস্তুকে হাতে পেয়ে যেন স্বর্গ পেলেন। তিনি নির্দ্বিধায় মুয়াবিয়ার প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে আলীর ভক্ত সমুদ্র হতে মুয়াবিয়ার অনুরক্তের পীরিতের দ্বীপে উত্তরণ করলেন। এই ঘটনার পর হতে যিয়াদ ইবনে সামিয়া যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান নামে পরিচিতি লাভ করেন। যিয়াদ পেলেন আবু সুফিয়ানের পুত্রের মর্যাদা। মুয়াবিয়া পেলেন একজন ক্ষুরধার রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, অসাধারণ বাগ্মী, ফলে দু'জনেরই লাভ হলো। শুধু মুয়াবিয়ার কূটনীতি চালে লোকসান হলো হযরত আলীর, যাঁর নিকট চিরদিনই নীতি একটাই ছিল, তা ন্যায়নীতি।

আমরা পূর্বেই বলেছি, তখনকার আরবভূমি চারজন বিশেষ রাজনীতি বিশারদের জন্ম দিয়েছিল – মুয়াবিয়া, আমর, মুগিরা ও যিয়াদ। এবার এই চারজন একত্রে বসলেন হযরত আলীর বিরুদ্ধে। এই চারজনের নীতি বলতে একটাই ছিল কার্য উদ্ধার ও স্বার্থসিদ্ধি এবং হযরত আলীরও নীতি বলতে একটাই ছিল – যে কোন কিছুরই বিনিময়েই ইসলামের তথা আপন নীতিকে বাঁচিয়ে রাখা। আপন আপন পথে উভয় পক্ষই কৃতকার্যতা লাভ করেছিল। মুয়াবিয়া রাজত্ব লাভ করেছিলেন, এবং হযরত আলী রোজ হাশর দিন পর্যন্ত তাঁর নীতিকে সারা দুনিয়ার বুকে বাঁচিযে রেখে গেছেন। মহানবীর একনিষ্ঠ সেবক মহানবীর বাণীকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

দুই হাতে দাও যদি সূর্য আর চাঁদ
আমাব আদর্শ আমি নাহি দিব বাদ। —হাদিস

সুতরাং একদিকে থাকল চারজন স্বার্থবাজ, সংঘর্ষবাজ, ধান্দাবাজ, ধড়িবাজ, কুকীর্তিপরায়ণ, দুর্নীতিপরায়ণ এবং অন্যদিকে দেখলাম একাকী একটি সহজ সরল মানুষ, ন্যায়পরায়ণ মানুষ, মনুষ্যত্বের দূত ও মানবতার অকৃত্রিম মুজাহিদ যোদ্ধা, নবীর জামাতা, ফাতেমার প্রিয়তম স্বামী হযরত আলী।

রাখিতে বিশাল রাজ্য আপনার হাতে
সন্ধি কভু করো নাই অসতের সাথে।

বিশ্ব বীরের মধ্যে তোমার যে ঠাঁই
যেখানে তোমার পাশে তিল ঠাঁই নাই।

জীবন বিপন্নময় জেনেও সংঘাতে
সন্ধি কভু করো নাই অজ্ঞতার সাথে।

এ জগতে ছিলে তুমি কত বড় বীর
আজও অম্লান তব উন্নত শির।

ওপারেতেও তব.রূপ দেখিবে সবাই
বেহেশতেও তুমি বীর বীরের মর্যাদায়।

অকাতরে দিলে প্রাণ পামরের হাতে
সন্ধি কভু করো নাই দুর্নীতির সাথে।
মনুষ্যত্বে মানবতায় রহিয়া সুস্থির
ন্যায়ের জন্যেই তুমি দিলে তব শির
কোথাও কখনো তুমি মানোনি দ্বিমত
বাঁচাইতে গণতন্ত্র, নবীর সুন্নত।

সেদিন হাশর মাঠেও দেখিবে সবাই
তুমি যে মহান বীর বীরের মর্যাদায়।

পরিশেষে উভয়পক্ষই আপন আপন নীতিতে অবিচল থেকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। হযরত আলী যেন বুঝতে পেরেছিলেন ঘটনার পরাজয় ঘটলেও এটি নীতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, অনাগত কালের মানুষের জন্য প্রয়োজন, তাই মাথা নত করেননি।

নবম অধ্যায়

সিফফিনের যুদ্ধের ও ষড়যন্ত্রের পূর্বাধ্যায়

(৬৫৮ খ্রীঃ)

উভয় পক্ষের দূতপর্ব ঃ

ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের যুদ্ধ। একটি অমানবিক ঘটনা। মহান নবীর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অবসান। ইসলামের পবিত্র খেলাফতের অবমাননা। বিশ্বের প্রথম নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের হত্যাকাণ্ড। বদরের যুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া প্রতিভাসিত। সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘর্ষ। ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। একটি সরল সহজ আদর্শ মানবের সাথে কুটিল কুচক্র অনাদর্শের লড়াই আরম্ভ হলো।

বিচক্ষণ হযরত আলী ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন একটি গভীর চক্রান্ত চলছে। চক্রান্তের মধ্যমণি আমির মুয়াবিয়া জেগে ঘুমাচ্ছেন। কোনদিনই তাঁর ঐ ঘুম শত দূতের দ্বারাও ভাঙা যাবে না। তবুও সাধক আলী শত নিরাশের মাঝেও বারবার চেষ্টা করেছেন যদি ঐ শয়তানি ঘুম ভাঙানো যায়, যদি ঐ পশুবৎ মানসিকতা দূর করা যায়, যদি মানুষকে মানুষের পথে ফেরানো যায়, যদি তাঁদের আবার ইসলামের মহান খেদমতে নিয়োজিত করা যায়, যার জন্য মহানবীর স্নেহধন্য, আদর্শধন্য, সান্নিধ্যধন্য শের-ই-খোদা হযরত আলী তাঁর ইচ্ছা, আকাঙ্খা ও চেষ্টার কোথাও কোন ত্রুটি রাখেননি, কোথাও কোন কিছুর নিকট মাথা নত করেননি। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়েছেন, নিশ্চিত গভীর খাদের দিকে ধাবিত হয়েছেন, তবুও গরীয়ান আলী আপন নীতিতে ছিলেন মহীয়ান। এইখানেই আলীর জয়, চির জয়, মনুষ্যত্বের জয়, মানবতার জয়। মানুষ আলীর জয়।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে হযরত আলী একটি পত্রসহ জরির ইবনে আব্দুল্লাহকে দূতরূপে আমির মুয়াবিয়ার নিকট পাঠালেন, যদি কিছু ফল পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে মুয়াবিয়া তাঁর সাধের খেলাফত স্বপ্নে মশগুল হয়ে আপন সীমান্ত বিস্তারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। হযরত আলী মহাবীর আশতারকে মসুল প্রভৃতি অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করায় মুয়াবিয়ার ঐ আশা প্রতিহত হয়েছিল। এই কূটচালের মূলে ছিলেন আমর। আমর তখন মুয়াবিয়ার দরবারে আসন জাঁকিয়ে বসে আছেন। তখনও কিন্তু কেউ কাউকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। কথায় বলে অসৎ বা চোর ব্যক্তি কোনদিনই অন্য একজন অসৎ বা চোরকে বিশ্বাস করে না।

দূতের পত্রখানি মুয়াবিয়া সকলকে পড়ে শোনালেন। তবে অবজ্ঞা ও চরম তাচ্ছিল্যের ভরে। দূত এতে মানসিক কষ্ট পেলেন মুয়াবিয়ার সৌজন্যমূলক জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করে। পত্রখানি – "মুয়াবিয়া, তোমার উচিত কাজ হবে, সকলে মিলে

আমার হাতে বয়াত করা। কারণ পূববর্তী দু'জন খলিফা যেভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মদীনার মোহাজির ও আনসারগণ কর্তৃক, আমিও সেইভাবেই নির্বাচিত খলিফা। তুমি জান, আমি এ পদের দাবিদার ছিলাম না। অন্যান্য সকলের পীড়াপীড়িতে আমি খেলাফত গ্রহণ করেছি। যারা এই ব্যাপারে এখন বিরোধিতা করবে ও অন্যদের উৎসাহিত করবে, তারা তো বিদ্রোহী। এবং খলিফার কর্তব্য বিদ্রোহ দমন করা। আমি খলিফা হিসাবে বিদ্রোহ দমনে বাধ্য। তুমি মোহাজির ও আনসারদের পথ গ্রহণ করো। যা উত্তম পথ। নচেৎ তোমার-আমার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য জেনো। তুমি ওসমান হত্যাকে আপন স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে গ্রহণ করো না। তুমি তো শাসন বোঝ, প্রথম আমার আনুগত্য স্বীকার করো, পরে তোমার যা কিছু বক্তব্য পেশ করো। আমি কোরআন ও হাদিস মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবই।"

অতঃপর মুয়াবিয়া তাঁব প্রধান পরামর্শদাতা আমরের সঙ্গে বসলেন। আমর তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন আলী এখন দুর্বল। বসরা এবং জঙ্গে জামালে তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী খতম হয়ে গেছে। প্রকৃত সাহসী যোদ্ধা ও প্রকৃত বুদ্ধিদাতা এখন আর আলীর নেই। ওসমান হত্যার প্রতিশোধ আগে মিটুক। পরে অন্য কথা। মুয়াবিয়া আবু মুসলিম নামক জনৈক দূতকে পাঠালেন। দূত তাঁর পত্র আলীর হাতে অর্পণ করে পত্রের সারকথাটুকু তুলে ধরলেন – "সকল দিক দিয়েই আপনি খলিফা পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি প্রথম ওসমান হত্যাকারীদের মুয়াবিয়ার হাতে অর্পণ করুন, অতঃপর মুয়াবিয়া সদলবলে আপনার হাতে বয়াত করবেন।" একথা শুনে আলী বললেন— "আপনি তো জানেন, "ওসমান হত্যাকারীরা বিদ্রোহী।" দূত বললেন – 'হ্যাঁ'। তখন আলী বললেন – "মুয়াবিয়া যতক্ষণ আমার হাতে বয়াত না করবে, ততক্ষণ সে ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই বিদ্রোহী। তাহলে আমি কি করে কতকগুলো বিদ্রোহীকে অন্য কতকগুলো বিদ্রোহীদেব হাতে তুলে দেবো। দ্বিতীয়ত দেশবাসী কোন ন্যায়-অন্যায় করলে খলিফা তার বিচার করবেন। অন্য কেউ না।"

অতঃপর দূতকে বললেন – "আপনি বিশ্রাম নিন। আমি দেখছি কি করা যায়।" খলিফা সবার সাথে কথা বললেন। খোলা মনে আলোচনাও করলেন। সকলে খলিফাকে জানালো – "আমরা যা বলার দূতকে বলব আগামীকাল।" পরদিন দূতের সামনে দশ হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল – "আমরা সকলেই ওসমানের হত্যাকারী। কে কাসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, আমাদের তাঁর নিকট নিয়ে চলো।" দূত তখন হতবাক। তখন আলী বললেন – "এবার আপনি লক্ষ্য করুন, অবস্থা কত গভীর ও কত জটিল। এব প্রকৃত সমাধান যদি

মুয়াবিয়া মনেপ্রাণে অন্তর থেকে চায়, তাহলে তাকে প্রথম আমার হাতে বয়াত করে আমার সাথে এক হতে হবে।"

অতঃপর আবার হযরত আলী মুয়াবিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন পত্রের মাধ্যমে – "মুয়াবিয়া, তুমি তোমার দূতের মুখ থেকে সব শোনো। ব্যবস্থা গ্রহণ কর অবস্থা বিবেচনা করে। অহেতুক জেদাজেদি করে ইসলামের ক্ষতি করো না। তাতে ইহকাল কতটুকু পাবে জানি না, পরকাল কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে। একথা মনে রেখে যা করার করো।" নাটের গুরু আমরকেও পৃথক ভাবে লিখলেন, বুঝালেন—" আমর, তোমার বয়স হয়েছে। যদি তুমি পরকাল বিশ্বাস করো, তাহলে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করো। আর যদি একজন প্রবীণ সাহাবী হিসাবে পরকালে কোন ক্ষীণ বিশ্বাসও না থাকে তাহলে যা ভাল বোঝো তাই করো।" চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। পত্রদ্বয়ে কোন ফল হয়নি।

অগত্যা অন্য প্রস্তুতি ঃ

হযরত আলীর শত অনুনয়বিনয়েও যখন কোন কাজ হলো না, যখন সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, যখন সব আশাভরসা শেষ হলো, যখন শান্তির শেষ প্রদীপটিও নিভে গেল, তখন নিরুপায় খলিফা আলী কেবল কর্তব্যের খাতিরেই অগত্যা অন্য প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হলেন। আরম্ভ হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে খণ্ডযুদ্ধ, খণ্ডযুদ্ধ থেকে অখণ্ড যুদ্ধ।

খলিফা আলী প্রথম বসরার গভর্নর আব্দুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন – বসরাতে একজন উপযুক্ত মানুষকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে বসরা হতে সৈনদল সংগ্রহ করতঃ সত্বর খলিফার সাথে মিলিত হতে। আব্দুল্লাহ খলিফার নির্দেশমত কাজ করে যাত্রাকালে দূত মারফত খলিফাকে জানিয়ে দিলেন। খলিফা দূতের মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে কুফাতে আবু মাসউদ আনসারীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে তখলিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তথায় শিবির স্থাপন করে সৈন্যাবন্যাসে মনোসংযোগ করলেন। খলিফা এখান থেকে আট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে যিয়াদ ইবনে নছর হারসীর নেতৃত্বে সিরিয়া মুখে রওনা করে দিলেন। তারপর সরীহ ইবনে হানির নেতৃত্বে আর একটি চার হাজার সৈন্যের বাহিনী তার পেছনে পাঠালেন। অতঃপর খলিফা স্বয়ং মূল বাহিনীসহ মাদায়েনে হাজির হলেন। তথা হতে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মকফুল ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে সিরিয়ার পথে রওনা করলেন। এবং যিয়াদ, সরীহ ও মকফুল সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন – রোক্কা নামক স্থানের নিকট ফোরাত নদী অতিক্রম করে অপেক্ষা করতে। সকলেই তাই করেছিলেন। এবার স্বয়ং খলিফা মাদায়েন ত্যাগ করে রোক্কা

অভিমুখে যাত্রা করে ফোরাত নদী অতিক্রম করে সকলেই একস্থানে একত্রিত হলেন। অতঃপর খলিফা পুনরায় যিয়াদ ও সরীহকে আবার অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন।

প্রথম সংঘর্ষ ঃ আমির মুয়াবিয়া এ সংবাদ শ্রবণে আবুল আওর সলমার অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে খলিফার সেনাদলের যাত্রাপথ রুখে দিতে নির্দেশ দিলেন। উভয় দলে সংঘর্ষ আরম্ভ হলো। এই সংঘর্ষে কোন জয়পরাজয় হলো না। সন্ধ্যা সমাগত হলো। ইতিমধ্যে হযরত আলী আরো একটি বাহিনী প্রেরণ করেন মালিক আশতারের নেতৃত্বে। খলিফা মালিককে নির্দেশ দিলেন সম্মিলিত বাহিনীর সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে যিয়াদকে দক্ষিণ বাহু ও সরীহকে বাম বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত করতে। এবং সিরীয়বাহিনী আক্রমণ না করা পর্যন্ত তাদের আক্রমণ না করতে। মালিক খলিফার নির্দেশমত কাজ করে সৈন্যবিন্যাসেব কাজ শেষ করলেন।

প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঃ আমির মুয়াবিয়ার সেনাপতি আবুল আওর বুঝতে পারলেন মালিকের সাথে আর পারা যাবে না। তিনি রাতের অন্ধকারে পিছু হটে গেলেন এবং মুয়াবিয়াকে সমস্ত জ্ঞাপন করলে তিনি সিফ্‌ফিন ময়দানকে যুদ্ধ প্রান্তর মনস্থ করে তার নিকটবর্তী স্থলে শিবির স্থাপন করেন। রাত্রির অবসানে আবুল আওর যথারীতি ভাবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়ে প্রতিপক্ষেব যে কোন যোদ্ধাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালে প্রতিপক্ষ হতে হাশিম ইবনে ওকবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো। দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমান সমান রয়ে গেল। অতঃপর আরম্ভ হলো সম্মিলিত সংগ্রাম। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপুল বেগে যুদ্ধ চলল। জয়পরাজয়ের অনিশ্চিত অবস্থায় সন্ধ্যা সমাগত হলো। যুদ্ধ বন্ধ হলো।

মানবতার মূর্ত প্রতীক মহান আলী ঃ

পরদিন খলিফা আলী ও আমির মুয়াবিয়া পাশাপাশি ভাবে আপন আপন শিবিরে হাজির হলেন। হযরত আলী সেনাপতি আশতারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন – ফোরাত নদীর তীরে এমনভাবে সৈন্য সাজাতে যাতে সেনাবাহিনীর পানির কোন অসুবিধা না হয়। চতুর মুয়াবিয়া পানি রোধের ব্যবস্থাটা অনেক আগেই মিটিয়ে ফেলেছিলেন। খলিফা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি আশতার বিষয়টি তাঁর গোচরে আনলেন। খলিফা এর গুরুত্ব ভালভাবেই অনুধাবন করলেন। এবং আমির মুয়াবিয়ার নিকট একজন দূত পাঠালেন। "মুয়াবিয়া, তোমার শেষ কৈফিয়ত না পাওয়া পর্যন্ত আমি যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। আমার সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত কখনও আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেনি। এবং করবে না। এখনও আমি যুদ্ধ চাই না।

তুমি অশান্তি পরিত্যাগ করো। এই পত্রের বড় বিষয়, অত্যন্ত দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয়, তোমার নির্দেশে তোমার সেনাবাহিনী ফোরাত নদীর পথ অবরোধ করে আমার সেনাবাহিনীকে পানির কষ্টে পিপাসায় মারতে চায়। আমাদের মধ্যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি পানি বন্ধ করার নির্দেশ তুলে নাও। এবং এটা খুবই অমানবিক কাজ। তুমি এ কাজ হতে বিরত থাক। আর যদি তুমি মনে করো, পানি নিয়েই তুমি প্রথম যুদ্ধ বাধিয়ে অহেতুক লোকক্ষয় করবে, তাতেও আমি ভীত নই। তবে অহেতুক ঝামেলা করো না। অমানবিক কিছু করো না।"

আমির মুয়াবিয়া তাঁর পারিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করলেন। পরামর্শে মুয়াবিয়া যদি একবার পানি বন্ধ কবতে চান, তাঁর পারিষদ দল দশবার পানি বন্ধ করতে চায়। "বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।"–রবীন্দ্রনাথ- সঞ্চয়িতা ২৪১

হযরত আলী জানতে পারলেন মুয়াবিয়া খলিফার পত্রটি পাওয়ার পর তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন – "খলিফার সেনাবাহিনীর একটি শিশুও যেন এক বিন্দুও পানি না পায়। এক ফোঁটাও পানি যেন খলিফার শিবিরে না পৌঁছায়।" মহান আলী তখন নিরুপায় হয়েই সেনাপতি মহাবীর আশতারকে নির্দেশ দিলেন ফোরাত নদীর কূল অধিকার করতেই হবে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সেনাপতি প্রস্তুত হলেন।

প্রতিপক্ষের সেনাপতিও প্রস্তুত । আরম্ভ হলো তীরের বর্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শানিত তরবাবি ঝলসিয়ে উঠলো। বেজে উঠলো প্রচণ্ড রণদামামা। একপক্ষের দাবি পিপাসায় পানি দিতে হবে, অন্যপক্ষের মতলব পানির জন্যই তোমাদের মরতে হবে। যুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যে তীব্ররূপ ধারণ করলো। সেনাপতি মালিক আশতার জীবনমরণ পণ করেই তাঁর সেনাবাহিনী-সহ কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিলেন। মালিক আশতারের প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে না পেরেই মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনী কেবল মাত্র নদীতীরই ছেড়ে দিলো না, একেবারেই নদী প্রান্তর হতেই বহু দূরে পালাতে বাধ্য হলো। তখন অবস্থাটা উল্টো হয়ে গেল। সমস্ত নদীতীর এখন খলিফার সেনাবাহিনীর হাতে। তারা সজোরে রব তুললো – ওদের আর এক ফোঁটাও পানি দেওয়া হবে না।

নিরুপায় মুয়াবিয়া বাহিনী নিদারুণ পিপাসায় কয়েকজনকে মহান আলীর নিকট পাঠালেন। তারা বলল— আপনার সেনাবাহিনী পানি বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি একটু দয়া করুন। খলিফা বললেন – "এ পথ কে দেখাল ?" উত্তর – মুয়াবিয়া। খলিফা – "পানির জন্য এই সংগ্রামে বেশ কিছু নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারালো। দায়ী কে ?" উত্তর – মুয়াবিয়া। খলিফা – "এখন বুঝলে এই অহেতুক যুদ্ধটা কার সাথে কার হচ্ছে।" উত্তর – হকের সাথে না-হকের, ন্যায়ের

সাথে অন্যায়ের"। অতঃপর মহান আলী আর কথা না বাড়িয়ে সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন – "কোন মানুষই যেন পানির জন্য কষ্ট না পায়।" এইভাবে মুয়াবিয়ার বোকামি, মুর্খামি ও অমনুষত্বের জন্য অকারণে বহু প্রাণ অকালে চলে গেল। যদি এই পানির সময়ে মহান আলীর পরাজয় ঘটতো তাহলে পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হতো, বিশ্ব ইতিহাসেও এর দৃষ্টান্ত ও মুয়াবিয়ার এই অমনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেতো কি ? অথচ মহান আলী যুদ্ধে জয় করেও শত্রুর সাথে, শয়তানের সাথে কি পরিচয় দিলেন। এখন তিনি ইচ্ছা করলে যোগ্য কারণ দেখিয়েই অনায়াসে পানি বন্ধ করতে পারতেন। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, মানুষের সাথে কপটতা করা মহান আলী কোনদিনই জানতেন না। এখানেই মানুষ আলী চির মহান, মানবতার জীবন্ত রূপ, মনুষ্যত্বের জ্বলন্ত মূর্ত প্রতীক (আবার এই মুয়াবিয়ারই কুখ্যাত সন্তান ইয়াজিদ এই ফোরাত নদীর তীরেই মহান আলীর সুমহান কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেনকে পানি বন্ধ করবে। পিতা যেমন তেমনি পুত্র, অমানুষের পশুপুত্র।)

মহান আলীর এই ফেরেশতা তুল্য ব্যবহারে প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা যেন সাড়া পড়ে গেল। উভয়পক্ষের সেনাবাহিনী এত খোলামনে মেলামেশা করতে থাকলো, মনে হলো যেন তারা একই শিবিরের মানুষ। সবার মনে আশার আলো দেখা দিল – এবার হয়তো সন্ধি আসন্নপ্রায়, শান্তি আগতপ্রায়। এই স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টির মূলে ছিল মানুষ আলীর অমায়িক ব্যবহার, সন্ধিপ্রিয় মন, শান্তিপ্রিয় হৃদয়।

উভয়পক্ষের সৈন্যবিন্যাস চিত্র ঃ

উভয়পক্ষেরই সৈন্যসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ করে দাঁড়াল। একপক্ষে হযরত আলী ও অন্যপক্ষে আমির মুয়াবিয়া সেনাপতি।

হযরত আলীর অধীনস্থ সেনাপতিগণ ঃ

কুফার অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি — মালিক আশতার।

কুফার পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি — আম্মার ইবনে ইয়াসের।

বসরার অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি — সহল ইবনে হানিফ।

বসরার পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি — কায়েস ইবনে সায়াদ।

প্রধান পতাকাধারী — হাশিম ইবনে ওকবা। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আরো বহু সেনাপতি ছিলেন।

আমির মুয়াবিয়ার অধীনস্থ সেনাপতিগণ ঃ

সম্মুখ বাহিনীর সেনাপতি — আবুল আওর সলমা।

অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি — আমর ইবনুল আস।

পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি — মুসলিম ইবনে ওকবা।

ডান বাহুর সেনাপতি — যুলকালাহ্ হামিরী

বাম বাহুর সেনাপতি — হাবিব ইবনে সলমা।

অন্যান্য গণ — ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, রশিদ, মালেক, আবদুর রহমান প্রমুখ।

দুই বিশাল বাহিনী মুখোমুখি ঃ আবার সন্ধি প্রচেষ্টা

৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ, সিফ্‌ফিনের উভয় প্রান্ত দুই বিশাল বাহিনী দ্বারা আজ উত্তপ্ত। আরম্ভ হওয়া মাত্র কত প্রাণ নিমেষে ঝরে যাবে তা কে জানে। কিন্তু আলী আবার সন্ধি চেষ্টা করলেন। এবং আবার তিনি মুয়াবিয়ার নিকট তিনজন শান্তিদূত পাঠালেন – বশীর ইবনে ওমরু, সাইদ ইবনে কায়েস, শবরত ইবনে রবয়ী প্রমুখ। এবং বলে দিলেন – "তোমরা মুয়াবিয়াকে এই নাহক যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করো এবং বলো মহানবীর বহু বাণী আছে, তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে – তুমি নাহক যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছো। তুমি হযরত আলীর হাতে বয়াত করে শান্তির সাথে সকল কিছুর ফয়সালা করো।"

প্রতিনিধিদল মুয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হলেন। প্রথম বশীর বললেন – "হে মুয়াবিয়া, তুমি তোমার অন্যায় ও ভুল জেদ ত্যাগ করো। অহেতুক মুসলমানদের রক্তপাত ঘটিয়ো না, গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করো না। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই আল্লাহর দরবারে যেতে হবে। আপন আপন কাজের জবাবদিহিও করতে হবে।"

মুয়াবিয়া – "তুমি তোমার জ্ঞানী বন্ধু আলীকে এরূপ জ্ঞানের কথা শোনাও না কেন ?"

বশির – "তুমি কি বলতে চাও তুমি ও আলী এক ? আলী সারা আরবে সুপণ্ডিত, তুমি তোমার দরবারে কুচক্রী, তাই না ? সারা মুসলিম জাহানে আলীর আসন কত উচ্চে। এবং তোমার আসন কোথায়, তুমি কি জান ? আল্লাহর রসুলের ওপর যাঁরা ইমান এনেছিলেন, আলী তাঁদের প্রথম ও অন্যতম। আর তুমি শেষ পদের শেষবিন্দু, তাই না ? আলী রসুলের প্রিয়তম জামাতা এবং খাতুনে জান্নাতের স্বামী। তুমি ইতিহাস কুখ্যাত মহিলা হিন্দার গর্ভজাত সন্তান, তাই না ? খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি তিনি, না তুমি ? তোমার উচিত হযরত আলীর হাতে বয়াত করে দ্বীন ও দুনিয়াতে ধন্য হওয়া।

মুয়াবিয়া – "তুমি কি বলতে চাও, আমি ওসমান হত্যার প্রতিশোধের দাবি ত্যাগ করবো ? আল্লাহর নামেই বলছি – তা আমি কখনও করবো না।"

বশির– "আমিও পাগল নই, তুমিও পাগল নও। তোমাকে আমি কোন সময়ে বলেছি দাবি ছাড়তে ? দাবি যেখানে করবে, সেই খেলাফতকে আগে স্বীকৃতি দাও,

পরে দাবি-দাওয়ার যাবতীয় কথা তুলো।

শবরত – "মুয়াবিয়া শোন, ওসমান হত্যার দাবির ব্যাপারে তোমার প্রকৃত লক্ষ্য আমরা জানি। যখন ওসমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল, মাসের পর মাস অতিবাহিত হচ্ছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে ? তখন তুমি মনেপ্রাণে ফন্দী আঁটছিলে, সময় কাটাচ্ছিলে, যাতে ওসমান শহিদ হয়ে যায়, যাতে তুমি দাবি তুলতে পারো, যাতে তুমি খেলাফতও দখল করতে পারো। কিন্তু তুমি জেনে রেখো – খেলাফত কোন দিনও দখল করার জিনিস নয়, এটাকে জনগণের নিকট হতে পেতে হয়। তবে তোমাকে আমি শেষ কথা বলছি – যদি তুমি এই নাহক যুদ্ধে অকৃতকার্য হও, তাহলে তোমার দুর্গতির কোন সীমা থাকবে না। আর যদি কৃতকার্য হও, তাহলেও দোজখের আগুনে তোমার দুর্ভোগেরও কোন সীমা থাকবে না।"

মুয়াবিয়া – "যেমন আলী, তেমনি তাঁর অসভ্য প্রতিনিধিবর্গ। অসভ্যগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। মিথ্যাবাজ, ধাপ্পাবাজগুলো আমার কাছে এসেছে বকর বকর করতে। সত্বর তোমরা দূর হয়ে যাও, তরবারিই সবকিছুর মীমাংসা করবে। তরবারিকে এত ভয়, জানের এত ভয়। আমি সব শেষ করে ছাড়বো।"

মহান আলীর সন্ধি প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হলো, শান্তিপ্রয়াস আবার পণ্ড হলো। শান্তিমিশন শূন্য হাতে আবার ফিবে এলো। কিন্তু উভয় দলেই ছিল অনেক জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান ব্যক্তি, এমনকি কোরআনের শত শত হাফেজ। যাঁরা সশরীরে বিদায় হজে হাজির ছিলেন, এবং স্বকর্ণে মহানবীর ঐ বিদায় ভাষণ শ্রবণ করেছিলেন – "এক মুসলমানের জীবন মান সম্মান ও সম্পত্তি অন্য মুসলমানেব নিকট পবিত্র হজের মাস ও পবিত্র কাবাগৃহ অপেক্ষাও অনেক পবিত্র। ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়, যার চিন্তা, কথা ও কাজের দ্বারা অন্য মুসলমান কষ্ট পায়। ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়, যার হাতের দ্বারা অন্য মুসলমান কষ্ট পায়। ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়, যে ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে।" এই কথাগুলো তাঁদের কানের মাঝে বার বার বেজে উঠছিল। পবিত্র কোরআনের অমিয়বাণীও তাঁদের আঘাত কবছিল – "যে কোন বিষযে তোমাদের মতভেদ ঘটলে সেবিষয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের স্মরণ নাও, এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি। তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" ৩ ঃ ১০৩, ৪ ঃ ৫৯, ৭ ঃ ৮৬, ১০৩, ৮ ঃ ৪৫-৪৬, ১০ ঃ ৮১, ২৮ ঃ ৭৭।

এই কারণেও উভয়পক্ষের কিছু মানুষ ও সন্ধির হাল ছাড়লেন না। তারা তিন মাসে প্রায় আশিবার যুদ্ধকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, ও জমাদিউল আউয়াল এই তিন মাস কেবল মাত্র শান্তি ও সন্ধির প্রচেষ্টাতে কেটে গেল। অবশেষে আমির মুয়াবিয়ার নিকট সব যুক্তি, সব প্রচেষ্টা একের পর এক

ব্যর্থ হলো। সন্ধির শেষ সংলাপ শেষ হলো। শান্তির আলোচনাদীপ নির্বাণলাভ করলো। নেমে এলো অশান্তির ঘোর অন্ধকার। আরম্ভ হলো কুখ্যাত সংগ্রাম — ইসলামের পবিত্র খেলাফত থাকবে কি থাকবে না ? জমাদিউস সানী, ৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ।

এই ব্যাপারে সিডিলট বলেন – "এহেন পবিত্র ও মহান গৌরবের অধিকারীর (হঃ আলী) সামনে সকলেই বিনত হতে পারত, কিন্তু তা হলো না।"

সিফ্‌ফিন যুদ্ধের সূচনা ৬৫৭ খ্রীঃ

সিফ্‌ফিন যুদ্ধের সূচনাপর্ব আরম্ভ হলো রবিউল আওয়াল মাস, ছত্রিশ হিজরী। প্রথম তিন মাস শান্তি প্রচেষ্টা চলল। ব্যর্থ হল সবই। অতঃপর আরবী চন্দ্র মাস জিলহজ মাসের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একমাস স্থায়ী হলো। এরপর সাঁইত্রিশ হিজরীর প্রথম মাস মহরমের চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধ বন্ধ হলো। মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আবার আরম্ভ হলো। নয়দিন যুদ্ধ চলার পর মুয়াবিয়ার দল যখন প্রায়ই ধরাশায়ী ডুবুডুবু তখন মুয়াবিয়ার সেনাপতি কূটনীতি বিশারদ অতীব ধূর্ত আমরের এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার চালে যুদ্ধ বন্ধ হয়।

এই যে একমাস যুদ্ধ হলো, একে ঠিক যুদ্ধ বলা যাবে না। একটি বড় যুদ্ধের মহড়া বা অনুশীলন বলা যেতে পারে। কেন এরূপ হলো। এর পশ্চাতে কি ছিল। এর পিছনে এই ধীরগতির মূলে ছিল হযরত আলীর শান্তিকামী মানসিকতা। তিনি কোনক্রমেই যুদ্ধটা চাচ্ছিলেন না। অধিকাংশ সেনাও এই মতাবলম্বী ছিলেন। ফলে যুদ্ধের গতি ছিল শ্লথ, ধীর। সকাল বিকাল দুবেলা দু'পক্ষেরকিছু সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যেন যুদ্ধের মহড়া দিতেন, বাকিরা দেখতেন। মুসলমানদের মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামটা ঘটুক, এটা কোন মুসলমানই পছন্দ করছিলেন না একমাত্র চক্রান্তের চার শিরমণি ব্যতীত। যাদের চক্রান্তে বাকি সকলেই চলতে বাধ্য হল।

সন্ধিও শান্তির শেষ প্রচেষ্টা ঃ

যুদ্ধের জন্য নিষিদ্ধ মহরম মাস এসে গেল। শান্তিকামী আলী আবার একবার শেষবারের মত শান্তি প্রচেষ্টা চালাতে মনস্থ করে তাঁর পারিষদবর্গকে ডেকে বললেন— তোমরা আর একবার শান্তি প্রচেষ্টা চালাও। আমি মহান আল্লাহর নিকট সদাই প্রার্থনা করছি— হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দাও, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। কোরআন ৭ ঃ ৮৯। মীমাংসাই কল্যাণকর। ৪ ঃ ১২৮। তোমরা আর একবার মুয়াবিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করো। আমি যেন রোজ হাশরে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলকে বলতে পারি— সবসময়ই সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি।

অতঃপর খলিফার অনুমতিক্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত আবু দারদা, হযরত ইমাম বাহেলী, আদি ইবনে হাতেমতাই, যায়েদ ইবনে কায়েম, যিয়াদ ইবনে হাফসা, শবরত ইবনে রবয়ী প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুয়াবিয়ার দরবারে আবার উপস্থিত হলেন শান্তির আশায়।

আবু দারদা – "মুয়াবিয়া, তুমি কি জন্য হযরত আলীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ ?

আমির মুয়াবিয়া – "ওসমান হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য"।

আবু দারদা – হযরত ওসমানকে কি হযরত আলী হত্যা করেছেন ?

আমির মুয়াবিয়া – "হত্যা করেননি, তবে হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন। আমার হাতে তাদের অর্পণ করলে আমি আলীর হাতে বয়াত করবো।"

আদি – "মুয়াবিয়া, আমরা তোমার নিকট শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তুমি আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলে মুসলমানগণ গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ হবে। তুমি কি অস্বীকার করতে পার ? আলী মুসলমানদের মধ্যে এখন উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত। তুমি ব্যতীত সকলেই তো মেনে নিয়েছে। দয়া করে তুমিও তাঁকে খলিফা বলে মেনে নাও। সব অশান্তির অবসান হোক। যদি না করো, তাহলে উটের যুদ্ধের পরিণাম মনে রেখো।"

মুয়াবিয়া – "আদি, তুমি কি আমাকে শান্তির নামে ভয় দেখাতে এসেছ ? জেনে রেখো, যুদ্ধকে আমি ভয় করি না। আমি জানি, ওসমান হত্যায় তুমিও জড়িত ছিলে, তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে।"

আদি– মুয়াবিয়া, তুমি জেনে রেখো, তুমি মিথ্যাবাদী, কপট। ঐদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য (আল্লাহর) অভিশাপ। ৭৭ ঃ ১৯

ইমাম বাহেলী– "আপনারা একে অপরের প্রতি অভিযোগ ছাড়ুন। মুয়াবিয়া, আপনি বলুন, কি করে শান্তি আসতে পারে।"

মুয়াবিয়া – "আপনি আলীকে বলুন। ওসমান হত্যাকারীদের আমার হাতে তুলে দেবে, তখন আমি তাঁর হাতে বয়াত করব। তারা সবাই তাঁরই শিবিরে আছে।"

যায়েদ – "মুয়াবিয়া, তুমি আগে বয়াত করো, তারপর তুমিই ওসমান হত্যাকারীদের শনাক্ত করো, আমরা তোমাকেই সাহায্য করবো। নচেৎ তাঁর শিবিরে হযরত আম্মারের মত বোজর্গ ব্যক্তিও আছেন। তুমি কি তাঁকেও কোতল করতে চাও।"

মুয়াবিয়া– "আম্মার এমনকি অসাধারণ ব্যক্তি ?"

যিয়াদ – "মুয়াবিয়া, আল্লাহর কসম, তুমি তোমার কথা তুলে নাও। তুমি জেনে রেখো, হযরত আম্মার তোমার মত অগত্যা মুসলমান ও স্বেচ্ছাচারী, অমিতব্যয়ী এবং আমানতে খিয়ানতকারী একজন চরম উচ্ছৃঙ্খল আমির নন। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও তাঁর রসুলের প্রিয় উম্মত। এবং তামাম মুসলিম জাহানের খুবই সম্মানিত ব্যক্তি।"

শবরত – "মুয়াবিয়া, যতক্ষণ আমাদের ঘাড়ের ওপর মাথা আছে, ততক্ষণ তুমি ঐ কাজ করতে পারবে না। তুমি যত বড়ই দুঃসাহসী ও উচ্ছৃঙ্খল হও।"

মুয়াবিয়া – "তোমাদের কে এখানে ডাকে, আস কেন ? অবস্থা যদি ঐরূপ হয়, তাহলে দেখবে আমার আগে তোমার মাথাটিই যাবে।"

অতঃপর স্বভাবদুষ্ট শিরমণি, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, দুষ্টমির ভাবে অতিক্রান্ত মহা ধূর্ত আমর মুয়াবিয়াকে পরামর্শ দিল হযরত আলীকে কিছু গালাগালি শোনাবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে। যা কথা, তাই কাজ। মুয়াবিয়া হাবিব ইবনে মুসলিম কহ্‌রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠালেন।

হাবীব - "হে আলী, ওসমান প্রকৃত খলিফা ছিলেন। আল্লাহর হুকুম মেনে চলতেন। আপনি তাঁর প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ ছিলেন। তাঁর অন্যায় হত্যার জন্য আপনি দায়ী। যদি আপনি তা অস্বীকার করেন, তাহলে হত্যাকারীদের আশ্রয় না দিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা তাদের কোতল করবো। অতঃপর মুসলমানরা ঠিক করবে কে খলিফা হবেন।"

হযরত আলী – "আমি তোমার কথায় খুবই মর্মাহত। তুমি কিছু বোঝো বলে আমার মনে হচ্ছে না। সুতরাং একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কথা কাটাকাটি করা ঠিক না। তুমি যে কথাগুলো বললে, আমি বহুবার তার সবিস্তারে জবাব দিয়েছি। তোমার মত মানুষের মুখে যে কথা শোভা পায় না, তাই তুমি বললে। যাকে বলে ছোট মুখে বড় কথা।" ৩ ঃ ৬৬

হাবিব– "আপনি অচিরে আমাকে এমন রূপে দেখবেন, তাতে আপনি আরো বিরক্ত হবেন।"

হযরত আলী – "নির্বোধ, তুমি কি আমাকে যুদ্ধের ভয় দেখাতে এসেছো। মহানবীর জীবনকালে ইসলামের এমন কোন যুদ্ধ নেই, যেখানে আমি নেই। আল্লহর ফজলে যেখানে ছিলাম, সেখানেই ছিল জয়। নির্বোধ জেনে রেখো, দ্বীনের নবী আমাকেই 'শের-ই-খোদা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

শরজিল – "আপনি আমাদের অন্য কথা কিছু বলুন।"

হযরত আলী – প্রশংসা এক আল্লাহর। তিনি আমাদের মধ্যে এমন একজন

রসূল পাঠালেন, যাঁর গুণের কোন শেষ নেই। তিনি আমাদের সত্যের পথ দেখিয়েছেন। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শিখিয়েছেন। অতঃপর এলেন খলিফা আবুবক্কর ও ওমর। তাঁদের শাসন ছিল ন্যায়ের শাসন। আমি রসূলের নিকটতম আত্মীয় হলেও কোনদিন খেলাফতের প্রতি দাবি তুলিনি। কেননা তাঁরা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নীতিবান খলিফা। তারপর খলিফা ওসমান এলেন। তিনি এমন কিছু কাজ করলেন যার ফলে দেশজুড়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। বিরক্ত হলো সমস্ত জনগণ। তারাই তাঁকে বধ করলো। এ ব্যাপারে আমার কোন কিছুর সাথে সাথ নেই। এরপর আমি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে খলিফা হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিই, অনুরোধ করি। কিন্তু আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই আমাকে খেলাফতের দায়িত্ব নিতে প্রায় বাধ্য করলেন। যুবাইর, তালহা প্রমুখ ব্যক্তিগণ আমার হাতে বয়াত করেও আবার অন্যের কথায় উলটিয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা আপন আপন ভুল বুঝতে পেরে আবার ঠিক পথ ধরলেন, তখন তাঁদের মত সজ্জনকে হত্যা করলো কে বা কারা ?

এখন মুয়াবিয়াও আমার বিরোধী। মুয়াবিয়া তো প্রথম যুগের মুসলমানদের একজনও নয়। ইসলামে তার অবদান বলতে শূন্য। মুয়াবিয়া, তার পিতা, তার পরিবারবর্গ মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের যে ক্ষতি করেছে, তা ওজন করার মত কোন বাটখারা নেই। যখন কোন উপায়ই ছিল না, তখনই তো তারা মুসলমান হলো। অর্থাৎ অগত্যা মুসলমান। আশ্চর্য, সেই লোকের সাথে তোমরা আজ আমার তুলনা কবছো, এবং আমার বিরোধিতা করছো। আমি তোমাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করছি। তোমরা সত্যের পক্ষে ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো।"

শরজিল– "ওসমান কি অন্যায়ভাবে নিহত হননি ?"

হযরত আলী – এ সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। হত্যাকারীরা বললো – "আমরা অন্যায়ের প্রতিকার করলাম।" তবে স্বয়ং খলিফাই যদি অন্যায় করেন, তাহলে বিচার করবে কে ?

— অন্যায়টা কি ?

হযরত আলী – হত্যাকারী বলল "দেশ স্বজন-পোষণ ও চরম দুর্নীতিতে ভরে গেল। বহু সাধু-সজ্জন নির্বাসিত হলেন শুধু প্রতিকারের আওয়াজ তোলার জন্য।" একথাগুলো মিথ্যা নয়।

— "ওসমান কি জালেম বা মজলুম ছিলেন ?"

হযরত আলী – "একজন খলিফা কি করে ঐ দুটোর একটা হবেন ? কোনটাই নন।

— "আপনি কেন হত্যাকারীদের আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন না ?"

হযরত আলী – "তোমরা তো বহুবার দেখলে কম করে দশ থেকে বিশ হাজার সৈন্য এক সাথে বলছে – আমরা হত্যাকারী। এখন কি করবে বলো। দেখ, তোমরা জিনিসটাকে উলটো ভাবে ধরছো। তোমরা আমাকে বিচার করতে বলছো, অথচ আমাকে বিচারকের আসনটি দিতে চাও না। প্রথম আমাকে খলিফা বা বিচারক মেনে নাও, তৎপর ফরিয়াদি রূপে ফরিয়াদ কর, আমি নিশ্চয়ই বিচার করবো। অতঃপর বিচার সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ে শোনালেন। ৪ ঃ ৫৮, ১৩৫, ৫ ঃ ৮, ১৬ ঃ ৯০, ৩৯ ঃ ৭৫, ৯৯, ৯৯ ঃ ৭–৮, ১০১ ঃ ৮–৯।

আর তোমরা হত্যাকারীদের তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলছো, হত্যাকারী দল বলছে, যেদিন তারা মিশরের পথে বিশ্বাসঘাতক, কপট, দুরাচার মারওয়ানের হাতের লেখা চিঠি খলিফার সিলমহর-সহ উদ্ধার করে খলিফার দরবারে দাবি জানালো মারওয়ানকে তাদের হাতে তুলে দিতে, খলিফা তখন কি ঐ একটিই মাত্র মানুষকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ? দেননি। তাদের ঐ প্রশ্নের জবাব দাও। বিশ হাজার মানুষের মধ্যে কে হত্যাকারী, এটা শনাক্ত করতে হলে সময় লাগবে। অথচ মারওয়ানের ব্যাপারে শনাক্তের কোন প্রশ্নই ছিল না। অতএব তোমরা আমাকে খলিফা মেনে শনাক্তকরণের সময় দাও। আমি বিচার করবই। তোমরা কি জান না বসরা সংঘর্ষের পর আমি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে দিয়েছি ওসমান হত্যাকারী দল ও হত্যাকারীদের কেউই যেন আমার সেনাবাহিনীতে না থাকে। আজই বেরিয়ে যাও। এরপর আমি আর কি করতে পারি। জেনে রেখো, ভুলে যাচ্ছো কেন, আলীর তলোয়ার শুধুমাত্র অত্যাচারীদের জন্যই নিষ্কাশিত হয়।"

মুয়াবিয়ার প্রতিনিধিদল সন্ধি বা শান্তির জন্য আসেনি, কিছু বলতে ও কিছু কথা নিতে এসেছিল। হযরত আলী সেটা বুঝতে পারলেন । সন্ধি বা শান্তির আর কোন পথ থাকলো না।

সিফ্ফিনের যুদ্ধের সমাপ্তি পর্ব ঃ ৬৫৯ খ্রীঃ

একটি চক্রান্ত ঃ এককথায় আমরা নিদারুণ অনুতাপ ও অনুশোচনার সাথে সিফ্ফিনের যুদ্ধের ফলাফল বলতে পারি। ইসলামের জাত দুষমন চির ক্ষতিকারক বেঈমান মোনাফেক আমর ইবনুল আসের শঠতা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও চরম বিশ্বাসঘাতকতায় শের-ই-খোদা বিজয়ী আলীর যে বিপর্যয় হলো, তা ইসলামের মহা বিপর্যয়। কেননা মহানবী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জীবনব্যবস্থার ও ইসলামের ইতিহাসের সুবর্ণরেখা যখন আলীর অমিতবিক্রমে অমিতব্যয়ী, অপচয়ী, স্বার্থপর, ভোগবিলাসী, দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন, স্বজনপোষণকারী, গরিবের

রক্তশোষণকারী দালালদের প্রতিকূলে দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়ে দুর্নিবার গতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলল, ঠিক তখনই ইসলামের চির ক্ষতিকারক সর্বনাশের মূল ও ষড়যন্ত্রের শিরমণি আমরের এক চক্রান্তে সবই ভেস্তে গেল।

ইসলামের সর্বমোট খেলাফত কাল ৬৩২ - ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃত খেলাফতকাল হলো ৬৩২ - ৬৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ৬৪৪ - ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হযরত ওসমানের খেলাফতকালকে প্রকৃত খেলাফতকাল বলা যায় না। কেননা ঐ কালটা ছিল রাজ্যবিস্তার, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের এবং গরিব শোষণের যুগ বা কাল। ৬৫৬ - ৬৬১ পর্যন্ত হযরত আলীর খেলাফতকাল। এই কালটিতে সমাজের কতকগুলো কুখ্যাত সন্তান তাঁকে একটি দিনও স্বস্তিতে কাটাতে দেননি। পরিশেষে হত্যা করলো। তিনি শত চেষ্টা করেও জীবনের বিনিময়েও নবীর বিশুদ্ধ ইসলামকে আর ফেরাতে পারেননি এবং পবিত্র খেলাফতকে ঠেকাতে পারেননি।

হযরত আলীর যুদ্ধনীতি ঃ

৩৭ হিজরী সন, মহরম মাস সবে মাত্র সমাপ্ত। আগামীকাল সফর মাস আরম্ভ হবে। মহরমের শেষ সন্ধ্যায় হযরত আলী তাঁর বাহিনীকে ডাক দিলেন। বললেন— আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে রণদামামা। এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু যুদ্ধনীতি ঘোষণা করলেন ঃ

১। আত্মরক্ষা ও শান্তির জন্য যুদ্ধ, আক্রমণ নয়।

২। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কথাই বলবে, নিজের নয়।

৩। পলাতক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করো না।

৪। যে আহত সৈনিক আপন আত্মরক্ষার্থে অক্ষম, তাকে আর আঘাত করবে না।

৫। মৃত সৈনিককে উলঙ্গ করে তার অস্ত্রশস্ত্র বা পোশাক খুলে নেবে না।

৬। কোন মৃত সৈনিকের নাক বা কান কাটবে না। অঙ্গ হানি করবে না।

৭। কোন নারী আঘাত করলেও তুমি আঘাত করো না।

৮। কোন নারীর শ্লীলতাহানি করো না।

৯। কোন শিশুকে আঘাত হানবে না।

১০। কোন অক্ষম বৃদ্ধকে বধ করবে না।

১১। কোন অন্ধ বা খোঁড়াকে আঘাত করো না।

১২। সৈনিক বিহীন কোন পশুকে আঘাত করবে না।

১৩। সৈনিক আত্মসমর্পণ করলে, আশ্রয় দেবে।

১৪। প্রকৃত জগৎ শস্যক্ষেত্র নষ্ট করবে না।

১৫। স্থাপত্যজগৎ বাড়িঘর ধ্বংস করবে না।

১৬। পানি বন্ধ করবে না।

১৭। আপন বিবেকের নিকট দায়ী থেকো।

দেখিয়া মহান নবী তব ইনসানিয়াত
দিলেন তোমার হাতে খাতুনে জান্নাত

বলতে গেলে এগুলো ইসলামের মহানবীরই যুদ্ধনীতি। মহাবীর আলী সেই আদর্শেই চির অনুপ্রাণিত। মহাবীর আলী যখন তাঁর যুদ্ধনীতি ঘোষণা করছিলেন, তখন তাঁর দু'পাশে ইসলাম জগতের দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে। একজন তাপসকুল শিরমণি হযরত ওয়ায়েস করণী, অন্যজন সাহাবাকুল শিরমণি হযরত আম্মার বিন ইয়াসের। আম্মার সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন – "আম্মার, তুমি একদিন কাফের (অবিশ্বাসী) সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হবে।"

সিফ্‌ফিনের রণাঙ্গন, প্রথম দিন ঃ ৬৫৮ - ৫৯ খ্রীঃ

ইসলামের ইতিহাসে কুখ্যাত সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হলো, হিজরী ছিল ৩৭, মাস ছিল সফর, তারিখ ছিল পয়লা, বার ছিল বৃহস্পতি। একদিকে বীর মালিক আশতারের নেতৃত্বে কুফাবাসীগণ, অন্যদিকে হাবিব ইবনে মুসালিমার নেতৃত্বে সিরিয়াবাসীগণ। উভয়পক্ষের সৈন্যগণ সারাদিনের যুদ্ধপাট চুকিয়ে জয়-পরাজয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা আগমনে আপন আপন শিবিরে ফিরলো।

দ্বিতীয় দিন ঃ হযরত আলীর পক্ষে হাশিম ইবনে ওতবা, আমির মুয়াবিয়ার পক্ষে আবুল আত্তার সলমা। অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় বাহিনীর প্রবল যুদ্ধ শুরু হলো। দিবাবসানে বিনা হার-জিতে যুদ্ধ বন্ধ হলো।

তৃতীয় দিন ঃ হযরত আলীর পক্ষে জগদ্বিখ্যাত সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসের, এবং বিরোধী পক্ষে কুখ্যাত যোদ্ধা বিশ্ববিখ্যাত বেঈমান আমর ইবনুল আস যুদ্ধক্ষেত্রে আবতীর্ণ হলেন। এদিনের যুদ্ধের গতি ছিল প্রচণ্ড ভয়াবহ। বিকালের দিকে হযরত আম্মার অপর পক্ষকে প্রায় কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন। বহু সৈন্য হতাহত হলো। কিন্তু জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকলো।

চতুর্থ দিন ঃ মহান আলীর পক্ষে তাঁরই যুবক পুত্র বিবি খাওলার গর্ভজাত মহাবীর মহম্মদ হানাফিয়া, অপর পক্ষে হযরত ওমর-তনয় ওবায়দুল্লাহ। এই ওবায়দুল্লাহ পিতা ওমর শহিদ হওয়ার পর খলিফার অজ্ঞাতেই সন্দেহজনক ঘাতকদের বধ করলে হযরত আলী বলেছিলেন, কাজটা ঠিক হলো না। বিচার

করেই প্রাণদণ্ড দিতে হয়, বিচারের আগে নয়। এতে ওবায়দুল্লাহ তখন হতে হযরত আলীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ওবায়দুল্লার সৈন্যগণ পিছিয়ে যেতে থাকায় ওবায়দুল্লাহ মহম্মদকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানালে মহম্মদ সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান গ্রহণ করে মল্লযুদ্ধে নেমে পড়েন। তখন হযরত আলী দূর হতে তা দেখে মল্লযুদ্ধের কারণ জানতে পেরে, পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে তুলে নেন। এবং বলেন – "যখনই যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ করবে আল্লাহর জন্য ও ইসলামের জন্য, তোমাদের ঐ যুদ্ধটা ব্যক্তি আক্রোশে পরিণত হয়েছিল।" যাই হোক দিবাবসানে ওদিনের যুদ্ধ ওখানে শেষ।

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।

পঞ্চম দিন ঃ হযরত আলীর পক্ষে সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, অপর পক্ষে সেনাপতি অলীদ ইবনে ওতবা। অলীদ আপন স্বভাববশত বনি হাশিমীদের ভীষণভাবে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করলে আব্দুল্লাহ দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হলে অলীদ সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে প্রাণ বাঁচায়। এদিনেও যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে গেলো। তবে মুয়াবিয়া পক্ষের প্রচুর সৈন্য এদিন প্রাণ হারায়।

ষষ্ঠ দিন ঃ এই দিনে দুই পক্ষে দুই মহাবীর হাজির। হযরত আলীর পক্ষে মহাবীর মালিক আশতার ও অন্যপক্ষে বীর হাবিব ইবনে মুসালিমা। এদিনও সারাক্ষণ যুদ্ধ চলল। বহু ক্ষয়ক্ষতি হলো। সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ বন্ধ হলো। জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকলো।

সপ্তম দিন ঃ সপ্তম দিনে যুদ্ধের গতি তীব্ররূপ ধারণ করল। স্বয়ং শের-ই-খোদা হযরত আলী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ওদিকে আমির মুয়াবিয়াও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধের বেগ মহাকোবান হলো। শের-ই-খোদার দুর্বার আক্রমণে রণভূমি আজ কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুয়াবিয়ার সৈন্যগণ আপন আপন আত্মরক্ষায় আকুল হয়ে উঠলো। দিবাশেষে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা, ক্ষীপ্র গতি মুয়াবিয়ার শিবির প্রান্তে গিয়ে ঠেকে গেল। তখন সেই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নেই, সমগ্র রণক্ষেত্র যেন রক্তিম রঙে রঞ্জিত, রক্তে ঢাকা কার্পেট, কোথাও বা জমাট রক্ত, কোথাও বা স্রোত। ঐদিনই শের-ই-খোদা যদি তাঁর অতি উচ্চাঙ্গের মানবতা ও মানসিকতার জন্য শত্রুপক্ষের যুদ্ধবিরতির আবেদন মেনে না নিয়ে আর কিছুক্ষণ ঐ সিংহবিক্রমে সমরক্ষেত্রে বাজপাখির ন্যায় বিচরণ করতেন, তাহলে মুয়াবিয়ার সমর সাধ হয়তো ঐদিনই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন। ঐদিনে মুয়াবিয়া ও তাঁর যুদ্ধ-শিবির একবার নয়, শতবার অন্তরে অন্তরে অনুধাবন করলো—

আল্লাহর নবী কাকে শের-ই-খোদা উপাধি দান করেছিলেন, কে মুসলিম জাহানের চিরদিনের শের-ই-খোদা, কে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তের প্রথম বীর যোদ্ধা, প্রথম পতাকাবাহী অমর বীর।

যে সমস্ত নামধারী সাহাবী নবীর দুর্লভ সহবত পেয়েও জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, জীবনে অন্তিম প্রান্তে এসেও জগতের মান-সম্মান ও ধনসম্পদের লোভে ও লালসায় ঐ মহান সহবতের মান ও মর্যাদা (সিফ্‌ফিন প্রান্তে) নিজেরাই দিলেন না, আজকের মুসলিম জাহান কোন যুক্তিতে তাঁদের মান-মর্যাদা দেবে। তাঁরা মানের অযোগ্য।

তুমি যে নবীর সঙ্গী, রসুল খানদান
নিজ হাতে নাহি করো নিজ অপমান।

অষ্টম দিন ঃ বিশাল সেনাবাহিনীর পরিচালনায় স্বয়ং হযরত আলী। ডান বাহুতে বীর আব্দুল্লাহ ইবনে বদিল খোয়ায়ী, বাম বাহুতে বীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। কবি ও কারীদের দায়িত্বে থাকলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের। এঁদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় থাকলেন কায়েস ইবনে সায়াদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ।

স্বয়ং মুয়াবিয়া আজ তাঁর সেনাবাহিনীর নিকট হতে মৃত্যুপণের শপথ নিয়ে প্রধান সেনাপতির আসনে বসলেন। ডান বাহুতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ফারুক, বাম বাহুতে হাবীব বিন মুসালিমা।

বৃহস্পতিবার প্রভাত। আরম্ভ হলো জগতের এক ভীষণ অবর্ণনীয় যুদ্ধ। চিন্তা করলেও মাথা ঘেমে যায়, ভাবনা করলেও শরীর অবশ হয়ে যায়। মনে পড়লেও দুঃখের সীমা থাকে না। প্রথম আমিরুল মোমেনিনের ডান বাহুর সেনাপতি আব্দুল্লাহ আমির মুয়াবিয়ার বাম বাহুর সেনাপতি হাবীব কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। বেজে উঠল রণদামামা, জ্বলে উঠলো দাবানল। আব্দুল্লাহ সদলবলে হাবিবকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে আমির মুয়াবিয়ার মূল বাহিনীর নিকট হাজির করলেন। দেখা দিল বিপাক। যখন আব্দুল্লার ক্ষুদ্র বাহিনী হাবিবের ক্ষুদ্র বাহিনীকে তাড়া করে বহু দূরে নিয়ে গেল, তখন হযরত আলীর মূল বাহিনী বহু দূরে, অথচ বিরোধী পক্ষের মূল বাহিনীর অতি নিকটস্থ হওয়ায় তারা বিরোধী পক্ষের বিশাল বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেল।

এটা ছিল যুদ্ধের একটা কৌশল। যাই হোক আব্দুল্লার সাহায্যের জন্য পাঠানো হলো সহল ইবনে হানিফকে। দুর্ভাগ্যবশত সহলের ক্ষুদ্র বাহিনী আব্দুল্লার নিকট পৌঁছতে পারলো না, কেননা বিশাল বাহিনী তাকে তখন ঘিরে ফেলেছে। ওখানে বীর আব্দুল্লাহ তাঁর আড়াইশো সৈন্য-সহ শহিদ হলেন। ডান বাহুর সেনাপতি

আব্দুল্লার এই বিপর্যয়ে বাম বাহুর সেনাপতি ইবনে আব্বাসও একটু যেন ঘাবড়িয়ে পড়েন। তখন হযরত আলী যুদ্ধের কৌশলগত ভুলটা ধরে ফেললেন এবং মানসিক দিকটাও বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চির যোদ্ধা শের-ই-খোদা আপন তিন পুত্র ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন ও মহম্মদকে যথাস্থানে প্রেরণ করলেন। মহাবীর মালেক আশতারকে দিলেন নেতৃত্ব। যখন সেনাবাহিনী দেখলো ডানে ও বামে স্বয়ং নবীজীর স্নেহধণ্য মহান নাতিদ্বয় মা ফাতেমার পুত্রগণ সজোরে ধাবমান এবং সম্মুখে মহাবীর আশতার সিংহগর্জনে আগুয়ান, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং শের-ই-খোদা সৈনিকদের শক্তি ও সাহস যোগাতে এগিয়ে গেলেন। হেন কালে আবু সুফিয়ানদের ক্রীতদাস আহসার শৃগাল রূপে সিংহকে বধ করতে এগিয়ে এলে শের-ই-খোদা তাকে শুধু বাম হাতে ধরে এমন একটি আছাড় দিলেন, এক আছাড়েই আহসারের জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়ার সাথে সাথেই বুঝতে পারলো কে শৃগাল কে সিংহ।

বীর আশতার ডান ও বাম উভয় বাহুকে এক সাথে দুর্বার বেগে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার ঠেলতে ঠেলতে বিরোধী পক্ষের মূল শিবিরের নিকট পৌঁছলেন। এবার কিন্তু আর কৌশলগত কোন ভুল ছিল না। হেনকালে হযরত আম্মারের নেতৃত্বে আব্দুল্লাহ ইবনে হাশিম বিপুল উৎসাহব্যঞ্জক কবিতা পড়তে পড়তে এগিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষের ওকবা তাঁকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওকবার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকবাকে বধ করেন। নব্বই বছরের বৃদ্ধ বীর হযরত আম্মার তখন সজোরে তকবির ধ্বনি দিচ্ছেন।

এই সময় শেরে-ই-খোদা কখনও সিংহবিক্রমে, কখনও হস্তী নিনাদে সৃষ্টি করেছেন সমরেই সিংহাসন। তিনি যখন ডান বাহু লক্ষ্য করছেন, তখন কৌশলগত দিক ধরে বিরোধী পক্ষের ডান ও বামের সেনাপতি যুলকালাহ ও ওবায়দুল্লাহ এক সাথে শত্রু পক্ষের বাম বাহুকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলে হযরত আলীর বীর যোদ্ধা ইবনে আব্বাস তখন প্রায় ধরাশায়ী হতে চলেছেন রণ পতাকা টলটলয়মান। এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে শের-ই-খোদা যেন এক পলকে এক নিমিষেই ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবয়ী গোত্রের সেনাবাহিনী যেন কোন এক যাদুবলেই যুদ্ধের গতিকে নিমিষেই ফিরিয়ে দিল। যে কোন সমরে শের-ই-খোদার হাজির মাহাত্ম্য ছিল এমনি। যুদ্ধ তখন এমনি ভয়াবহ রূপ নিল, যা সত্যিই বর্ণনাতীত। পলকের মধ্যেই কত প্রাণ পড়ে যাচ্ছে। একটি বৃক্ষের পাতাও এত তাড়াতাড়ি পড়ে না। যুদ্ধ অষ্টমীর এই মহাক্ষণেই আমির মুয়াবিয়া তাঁর ডান ও বাম বাহুর দুই শ্রেষ্ঠতম বীরদ্বয়কে হারালেন – যুলকালাহ ও ওবায়দুল্লাহ।

হযরত আম্মারের শাহাদত বরণ ৬৫৯ খ্রীঃ

প্রবীণতম সাহাবী হযরত আম্মার স্বয়ং মহানবীর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আজ মহানবী যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁর বয়স হতো (৬৫৯ – ৫৭০) ৮৯ বছর। এখন হযরত আম্মার ছিলেন নব্বইয়েরও উর্ধ্বে মানুষ। হযরত আম্মারের সমগ্র জীবন ছিলো মহানবীতে নিবেদিতপ্রাণ। এই মহান সাহাবীকে মহানবী দারুণ ভালবাসতেন। একদিন মহানবী বলেছিলেন– "আম্মার, তুমি একদিন কাফের (অবিশ্বাসী) সম্প্রদায়ের হাতে একটি নাহক যুদ্ধে নিহত হবে।" দিনের পর দিন গেল, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ এগিয়ে এলো। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর মহাক্ষণটিও এগিয়ে এলো।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়, দিনের রবি ডুবুডুবু। কিন্তু যুদ্ধ তার আপন গতিতে আগুয়ান। হেনকালে হযরত আম্মার সেনাবাহিনীর সম্মুখে একটা উদ্দীপ্তময় ভাষণ দিলেন। প্রতিটি সৈনিকের শিরায় শিরায় জেগে উঠলো নব শিহরণ, নব জাগরণ, নতুন প্রাণ, নতুন গান। যুদ্ধ যেন আবার নব গতিলাভ করলো। স্বয়ং হযরত আম্মার ঐ বয়সেই ভীষণ বেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁক দিলেন, ডাক দিলেন। কিছুক্ষণ সিংহবিক্রমে যুদ্ধ চালানোর পর অতর্কিতে এক প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়লো। মহানবীর স্নেহধন্য, ভালবাসাধন্য, ভবিষ্যদ্বাণীধন্য জগদ্বিখ্যাত সাহাবী ইসলাম জগতের এক ডাকে চেনা মানুষ হযরত আম্মার শাহাদত বরণ করলেন। মহানবীর বাণী সত্যে পরিণত হলো।

হযরত আম্মার শাহাদত বরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র সমরেই মহানবীর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি সজোরে প্রচার হওয়ামাত্রই আমির মুয়াবিয়ার শিবিরে সৈন্যদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা নেমে এলো। সকল সৈনিকের মাথা যেন নত হয়ে গেল, মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, সৈনিকদের এই মানসিক দুরবস্থা, শিথিলতা লক্ষ্য করে মুয়াবিয়া মাথায় হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান পরামর্শদাতা, বুদ্ধিদাতা সুচতুর ষড়যন্ত্রের মূল আমরকে ডাকা হলো। বদবুদ্ধিতে, বদ চালে, বদ চিন্তায়, ও বদ কাজে আমরের জুড়ি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রচার করলেন – "হে সৈনিকবৃন্দ, আম্মারের মত মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে যুদ্ধে এনেছে 'আলী'। সুতরাং আলীই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী"। এইরূপ নানা প্রবঞ্চনামূলক কথার দ্বারা আপন সৈনিকদের মনোবল ফেরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঠক-প্রতারক-কাঠমূর্খ আর কাকে বলে। মহানবী তো বলেননি, কে যুদ্ধে নিয়ে যাবে, তিনি বলেছেন কাদের হাতে মারা যাবে।" আর একটি কথা হযরত আলী বারবার ঘোষণা করেছিলেন – "আমি কাউকেই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য জোর করবো না। আমি শুধু আহ্বান বা আমন্ত্রণ জানাবো, আপন ইচ্ছায় যার যা খুশি তাই করবে।"

একজন সাহাবী হয়েও, মহানবীর দুর্লভ সাহচর্য পেয়েও, অমূল্য সহবত পেয়েও এই দুনিয়ার দু'দিনের পদ-পদবী, ধন-মান-যশ-খ্যাতি প্রভৃতির অন্ধ মোহে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সবার মাঝে স্বয়ং মহানবীর পূতপবিত্র বাণীকে বিকৃত করতে পারে, সে কোন জন ? চরম অভিশপ্ত মানব। মহানবী বলেন – "শিক্ষিত ব্যক্তির পাপ অশিক্ষিত ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক গুরুতর। জ্ঞানীর অন্যায় অজ্ঞানী অপেক্ষা ভীষণ গুরুতর। অশিক্ষিত অজ্ঞানীর শাস্তি হবে যেখানে লঘুতর, সেখানে শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তির হবে গুরুতর।" আমর ইবনুল আস প্রথম জীবনে মহানবীর একজন সাহাবী ছিলেন, দুঃখের বিষয় পরবর্তী জীবনে বা জীবনের দিগন্তভূমিতে একটি শয়তানি চক্রান্তের প্রধান উপদেষ্টা। এই প্রবল চক্রান্তটিই একদিন ইসলামের পবিত্র খেলাফতকে ধ্বংস করল। ইসলামের গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করল, মুসলমানদের সত্য বলার স্বতঃস্ফূর্ত স্পৃহাকে জখম করল, খুন করল।

আশকে রসুল হযরত ওয়ায়েস করণীর শাহাদত বরণ ঃ

দ্বীনের নবী হযরত মহম্মদ মস্তাফা (সাঃ)– এর এই দুনিয়াতে কোটি কোটি উম্মত বা অনুসারী আছেন, তাঁদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ আছেন আশেকে নবী, আশেকে রসুল, নবীপ্রেমিক, রসুলপ্রেমিক। এই লক্ষ লক্ষ নবীপ্রেমিকের প্রথম শ্রেণীর প্রথম জন হযরত ওয়ায়েস কারণী(রহঃ)। ওহোদ প্রান্তের যুদ্ধে নবীজীর দুটো দাঁত নষ্ট হওয়ার সংবাদে হযরত ওয়ায়েস কারণী প্রথম নিজ দাঁতের দুটো ভেঙে দেন। পরে সন্দেহ জাগায় নবিজীর কোন দুটো দাঁত নষ্ট হয়েছে। এই সন্দেহ নিরসন করতে গিয়ে তিনি একের পর এক সব দাঁত ক'টি ভেঙে ফেলেন।

নবীজী বলেন — "যে আমার, আমি তাঁর"। আমার জুব্বা (বিশেষ পোশাক) ওয়ায়েস কারণী পাবে, হে ওমর ও আলী, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার পোশাক তাঁকে দিয়ে এসো।

তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম বেদউরা। জন্মস্থান আরবের ইয়ামেন প্রদেশের অন্তর্গত শওর নদীর তীরে 'করণ' নামক গ্রামে। তাঁর দাদার নাম ছিল বাদার। এই করণ নাম থেকেই তিনি কারণী হয়েছেন। তিনি নবীপ্রেমিক ছিলেন, নবীপাগল ছিলেন, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় 'নবীপ্রেমিক' আর দেখা যায় না। অথচ তিনি একবারও নবীর সাথে মোলাকাত করলেন না। কারণ স্বরূপ দেখা যাচ্ছে, তাঁর জননী ছিলেন অন্ধ ও বৃদ্ধা, তাঁর আর কেউ ছিল না। জননীর সেবার ত্রুটি হবে বলে তিনি একবার নবীজীকেও দেখার সুযোগ পেলেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে মাতৃভক্তিতেও এ সন্তানের এ বিশ্বে দ্বিতীয় কোন জোড়া নেই।

মহানবী বলেন — "তাঁর দোয়াতে বিশ হাজার মেষের যত লোম আছে, আমার ততজন পাপী উম্মত মুক্তি লাভ করবে।" মহানবীর মুখে তাঁর সম্পর্কে এরূপ উচ্চস্তরের কথা শুনে, বড় বড় সাহাবাগণ অবাক হতেন এ কোন মহাপুরুষ। সকল সাহাবাই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন এত বড় নবীপ্রেমিক এই দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আজও মুসলিম বিশ্ব এই মহান তাপসকে নম্রচিত্তে শ্রদ্ধা জানায়।

তাপসকুল শিরমণি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আশেকে রসুল, সর্বশ্রেষ্ঠ মাতৃগতপ্রাণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগীপুরুষ সম্পর্কে মহানবী বলেন — "যাঁর সম্মানে আল্লাহ্ কিয়ামত (উত্থান) দিনে সত্তর হাজার ফেরেশতাকে নিযুক্ত করবেন, সেই মহান চির সম্মানিত পুরুষ হযরত ওয়ায়েস কারণী যখন জানতে পারলেন যে, কতকগুলো মানুষ দুনিয়ার লোভ-লালসায় পড়ে শের-ই-খোদা আলীকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে, তিনি আর থাকতে না পেরে ঐ বয়সেই শুধুমাত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যই হযরত আলীর পক্ষে জেহাদে যোগদান করলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামই জেহাদ।

যুদ্ধের অষ্টম দিন বৃহস্পতিবার। সারাদিন প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধ চলল। মহান আলী কখন যুদ্ধ মাঝে, কখন বা পাশে, কখন বা শিয়রে, কখন বা সম্মুখে। দিবা অবসান হলো, কিন্তু মহা যুদ্ধের কোন অবসান নেই, বরং যুদ্ধ যেন নতুন গতিতে বেগবান। রাত্রির অন্ধকারেও আরাম নেই। বিরাম নেই। যুদ্ধের এমনি মারাত্মক এক মোহ সকলকে যেন মোহাভিভূত করে তুলেছিল! এই কু-লক্ষণময় যুদ্ধে দিবালোকে হযরত আম্মারের মত মহান ব্যক্তি ইসলামের জন্য হযরত আলীর পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর মহান জীবনটিকে উৎসর্গ করলেন। ঠিক রাত্রি বেলায় অনুরূপভাবেই অন্য এক অদ্বিতীয় মহান, অদ্বিতীয় আশেকে রসুল, স্বয়ং রসুল-জোব্বাধারী হযরত ওয়ায়েস কারণী ইসলামের জন্য রসুলের জামাতা হযরত আলীর সম্মুখেই জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনেরই এক শুভলগ্নে, জীবন গোধূলি লগ্নে সমগ্র সিফ্‌ফিন প্রান্তর ও সমরকে এক চরম গৌরব দান করে পরম তৃপ্তির সাথে যুদ্ধস্নাত শাহাদত বরণ করে পরম করুণাময়ের নিকট গমন করলেন।

শোকাহত আলীর আহ্বান ঃ শের-ই-খোদা হযরত আলী দিবালোকে দেখলেন হযরত আম্মারের শাহাদত বরণ, এবং রাত্রিবেলায় হযরত ওয়ায়েস কারণীর শাহাদাত বরণ দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না, এই দুই মহানের প্রাণ বিয়োগে বিবেকের তাড়নায় তিনি যেন শত তীরের সহস্র বাণে বিদ্ধ হতে থাকলেন, বনরাজ সিংহ যেমন বড় ধরনের' কোন আঘাত পেলে বনভূমিকে কাঁপিয়ে তোলে, ঠিক তেমনিভাবে আজ এখানে 'আল্লাহর সিংহ' হযরত আলী নিমিষের মাঝে সহস্র সৈন্য পরিবেষ্টিত শত্রু ব্যূহকে ছিন্নবিছিন্ন করে একেবারেই অকল্পনীয় ভাবেই স্বয়ং মুয়াবিয়ার শিবিরের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে সিংহ গর্জনে ডাক দিলেন, মেদিনী

কাঁপিয়ে হায়দরী হাঁক দিলেন — "কোথায় মুয়াবিয়া, বাইরে এস ; আমাদের জন্য কেন মহৎ প্রাণগুলো ইসলামের মহৎ বেদনায় অকাতরে যাবে ; বাইরে এস, যুদ্ধ দু'জনের মধ্যেই সীমিত হোক – আমাতে ও তোমাতে। আমি চাই না ইসলামের মহৎ প্রাণগুলো একের পর এক ঝরে পড়ুক। আমি চাই না ইসলামের দীপশিখাগুলো একের পর এক এই আহম্মকী যুদ্ধে নির্বাণলাভ করুক।"

তখন মুয়াবিয়া শিবির মধ্যেই ভয়ে কম্পমান, জড়সড়। এক কথায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কি করে কি হলো। পাশেই বসে ছিলেন ধূর্ত শিয়ালপণ্ডিত আমর ইবনুল আস, কূট পরামর্শ জগতের অদ্বিতীয় মানুষ। যাঁর পরামর্শেই এই না-হক যুদ্ধের অবতারণা। যখন মুয়াবিয়া লজ্জায় হোক, হঠকারিতায় হোক হযরত আলীর সাথে মল্লযুদ্ধে পাঞ্জা কষতে প্রস্তুত হতে যাচ্ছিলেন, তখনই আমর তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন — 'মুয়াবিয়া তুমি কি জান না, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোন বীর আছে, যে সমরক্ষেত্রে হযরত আলীর সম্মুখে নেমে তার ধড় ও প্রাণ এক সাথে নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে।" পরামর্শদাতা আমরের মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুয়াবিয়া যেন তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। শের-ই-খোদা বন-রাজ সিংহ ধূর্ত খ্যাঁক শিয়ালদের নিকট হতে ফিরে গেলেন। মুয়াবিয়ার সহস্র সৈনিকের মধ্যে অবাধে এলেন অনায়াসে ফিরে গেলেন। ভীরু কাপুরুষের দল ভেতরেই থাকল। সিফ্‌ফিন যুদ্ধের এই অভিশপ্ত ভীষণ রাত্রিটিই ইসলামের ইতিহাসে লাইলাতুল হারীর নামে প্রসিদ্ধ।

নবম দিন শুক্রবার ঃ

রাত্রি শেষ হলো, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলো না। সকাল হলো, কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ণীত হলো না। তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তুফানবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। কত বৃক্ষ কত মহীরুহ ধরাশায়ী হচ্ছে, কত মা সন্তান-হারা হচ্ছে। কত স্ত্রী স্বামী-হারা হচ্ছে। কত বোন ভাই হারাচ্ছে, কত নাবালক নাবালিকা, কত দুধের শিশু তাদের জন্মদাতা পিতাকে হারাচ্ছে। সকাল হল, সকাল আবার দুপুর হল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোন ইঙ্গিতই ফুটে উঠলো না। এ দৃশ্যও হযরত আলীর নিকট খুবই মর্মান্তিক হয়ে উঠলো। এই করুণ দৃশ্যকে বন্ধ করার জন্যই তিনি সরাসরি নিজ প্রাণের কোন রূপ তোয়াক্কা না করেই শত্রু শিবিরে হাজির হয়ে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল অগণিত প্রাণ যেন অকাতরে আর না যায়। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। যুদ্ধ না করার ও যুদ্ধ থামার শতদিকের শত চেষ্টা করেও যখন দেখলেন — মুয়াবিয়ার পাষাণ প্রাণে কোন সাড়া নেই, নিখিল বীর নিরুপায় হয়েই যুদ্ধক্ষেত্রটিকে আর একবার নিরীক্ষণ করে সেনাপতি মালিক আশতারকে নির্দেশ দিলেন — যেমন করেই হোক এই যুদ্ধের, এই ভয়াবহ লোক ক্ষতির অবসান ঘটাতে হবে। যবনিকা টানতে হবে এই না-হক যুদ্ধের।

এই দুই মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনাবসানই শুধুআলীরপ্রাণে আঘাত দেয়নি, তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল অগণিত মানুষের প্রাণহানিও। তাঁর বীরের প্রাণ, তাঁর মহামানবের মন, তাঁর কমল হৃদয়, তাঁর বিশাল চিত্ত সন্তান হারা জননীর ন্যায়, মা হারা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে উঠেছিল, তাঁর পরিশুদ্ধ আশা, আল্লাহতে নিবেদিত আত্মা, আপন-ভোলা আত্মা সকলের অলক্ষ্যেই যেন আল্লাহর দরবারে আর্তনাদ করে উঠেছিল মানুষের জন্য।

অতঃপর হযরত আলী, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, প্রতিজ্ঞা-সহ সেনাপতি মালিক আশতারকে সমরের সম্মুখভাগে নামিয়ে দিলেন, এবং নিজে যুদ্ধের সার্বিক দিক পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। এখন আর যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত আলী নেই, আছেন শের-ই-খোদা। মালিক আশতার বিখ্যাত সেনাবাহিনী-সহ অদম্য গতিতে দুর্বারভাবে সিরীয় সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই মারাত্মক বিভীষিকাময় আক্রমণের তেজ সহ্য করতে না পেরে সিরীয়বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে উঠলে একতরফাভাবে সমরক্ষেত্রে নিধনযজ্ঞ চলতে থাকায় যত সংখ্যক সিরীয় সৈন্য নিহত হলো, সাতদিনব্যাপী সমগ্র যুদ্ধে তা হয়নি। শের-ই-খোদার ক্ষুরধার নেতৃত্বে ও বীরত্বে এদিনের যুদ্ধ যে ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছিল, তাতে মুয়াবিয়ার লক্ষাধিক সৈন্যের আর বাকি ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার। অথচ হযরত আলীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের তুলনায় অতি সামান্যই শহিদ হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিরীয় বাহিনীর মাথা ও মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে পড়ল। যখন সিরীয়বাহিনীর শক্তি নিঃশেষিত, সাহসের দীপ নির্বাপিত, তখন সকলেই ছত্রভঙ্গ। শের-ই-খোদা তাঁর সেনাবাহিনী দ্বারা মুয়াবিয়ার শিবির পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে তুলেছেন। খেলা শেষ, সমর শেষ, চূড়ান্ত পরাজয়। মুয়াবিয়া শিবির মধ্যে নীরব নিস্তব্ধ নিথর। মুয়াবিয়া চিরদনই তাঁর মনের কোণে জানতেন সিংহ আলীর নিকট মুয়াবিয়া চিরদিনই শৃগাল।

শের-ই-খোদার এই বিজয় যদি কার্যে পরিণত হতো, তাহলে সমাজে যে অর্থনৈতিক ব্যভিচার আরম্ভ হয়েছিল, তা একেবারেই সমূলে উৎপাটি ত হয়ে ফিরে আসত এক সুন্দরতম খেলাফত কাল। কিন্তু মুয়াবিয়ার পরামর্শদাতা আমর পবিত্র কোরআনকে নিয়ে এমনি এক প্রতারণার জাল বিস্তার করল, সবই ভেস্তে গেল। ২ ঃ ৪১।

তুমি যে-নবীর সঙ্গী শ্রেষ্ঠ মুসলমান
নিজ হাতে করে গেলে নিজ অপমান।

কোরআন নিয়ে (সাহাবীর) প্রতারণা ঃ

মালিক আশতার যখন মুয়াবিয়ার সিরীয়বাহিনীকে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, যখন তারা প্রাণের দায়ে দিশেহারা, যখন মুয়াবিয়া স্বয়ং মৃত্যুর জন্য মুহূর্ত গুনছেন, যখন শের-ই-খোদা আল্লাহর দরবারে গভীর কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত, যখন দীর্ঘ নয় দিনের লড়াই সমাপ্ত, যখন বিজয় হযরত আলীর মুঠোতে, যখন মুয়াবিয়া সদলবলে বন্দী আপন শিবিরেই, তখনই বিশ্ব প্রতারণার প্রবাদ পুরুষ, চালবাজি, ধোকাবাজি, ধাপ্পাবাজির চির চূড়ামণি আমর মুয়াবিযাকে এক মোক্ষম পরামর্শ দিয়ে বসল – তুমি তোমার সৈন্যদের নির্দেশ দাও, তারা যেন প্রত্যেকেই কোরআন ও কোরআনের পাতা ছিঁড়ে লাঠির ডগে বেঁধে হযরত আলীর সৈন্যদের সামনে তুলে ধরে বলে – "আমরা কোরআন নিয়ে বলছি আমরা শান্তি চাই, সন্ধি চাই, অতঃপর যা করার করবো।"

চতুর মুয়াবিয়া এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়ে তাঁর ছত্রভঙ্গ-দিশেহারা সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ঐ রূপই করতে। তারাও দেখল আত্মরক্ষার চরম সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার কবা হলো। হযরত আলীর কুফা, বসরা ও মদীনাবাসী সৈন্যদল টোপ খেযে নিল। পবিত্র কোরআনকে নিয়ে শপথ করতে দেখে সাধারণ সৈন্যগণ সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ল। পবিত্র কোরআনকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। তারা সকলেই হযরত আলীকে চাপ দিতে থাকলো যুদ্ধ থামাতে। তখন তিনি তাদের শতবার সহস্রবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন – "এটা নির্জলা ধোকাবাজি, কোরআনকে নিয়ে প্রতারণা, ওরা কোরআনকে মানে না, ওরা তোমাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তোমাদেব হাতে পাওয়া বিজয়কে বিনষ্ট করতে চায়, ওরা খেলাফতকে ধ্বংস করতে চায়, ওরা ইসলামকেও ধ্বংস করতে চায়, যারা কোরআনকে নিয়ে মানুষকে প্রতারণা করতে চায়, তারা কেমন মুসলমান, এটা তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো। তোমরা মনে রেখো হযরত আম্মারের আত্মত্যাগ, হযরত ওয়ায়েস কারণীর আত্মত্যাগই তোমাদেরকে এই বিজয়দানে ভূষিত করেছে। তোমরা আমাব কথা শোন, নচেৎ পরিণতি খুবই দুঃখজনক হবে।"

চরম দুর্ভাগ্যের কথা, কোরআন নিয়ে সমরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সৈনিকদের মধ্যে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড পড়ে গেল। সারা সপ্তাহের বিজয়ের অনির্বাণ শিখা যেন নিমিষেই নিভে গেল। হযরত আলীর জীবনে এইরূপ পরিস্থিতি আর কখনো এসেছে বলে মনে হয় না। যখন সেনাবাহিনী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তাঁকে চাপ দিতে দিতে এমন পর্যায়ে এলো, তখন তিনি যেন নিজেই বন্দী। নিয়তির কি নিষ্ঠুর

পরিহাস, আম-সেনাবাহিনী সেনাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছে – তাদের নির্দেশ পালনের জন্য। তখনো বিজ্ঞ আলী, বিচক্ষণ আলী বুক চাপড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছেন – "ওটা নিছক ধোঁকা, কোরআনকে নিয়ে ধোঁকা, ওরা ধোঁকাবাজ, তোমরা ওদের ধোঁকাবাজিতে পড়ো না।" কিন্তু কোনই কাজ হলো না। সেনাবাহিনী বলতে গেলে তাঁকে বাধ্যই করলো সেনাপতি আশতারকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ পাঠাতে।

গণ্ডমূর্খ সেনাদল কখন কি গোঁয়ারতুমি করে বসে, কে বলতে পারে। তখন নিরুপায় হযরত আলী আপন নিরাপদের জন্যই বাধ্য হলেন সেনাপতি আশতারকে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিতে। সেনাপতি আশতার খলিফার এই পত্র বা নির্দেশ পাওয়া মাত্রই একেবারেই বজ্রাহত হলেন। এই সময়ে এই নির্দেশ কেন, একমাত্র খলিফার জীবন বিপন্ন ভেবেই সেনাপতি আশতার আর কালবিলম্ব না করেই যুদ্ধ থামিয়ে খলিফার সকাশে হাজির হয়ে বললেন – এই মুহূর্তে যুদ্ধ থামানো মৃত্যুর শামিল হলো, আসলে যুদ্ধ যা হবার হয়েই গিয়েছিল, এখন শুধু চলছিল আত্মসমর্পণের পালা। সেনাপতি আশতার ঊর্ধ্বশ্বাসে সকলকে দুটো কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন – "ওদের প্রস্তাব প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়, ওরা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায় বলেছে, তোমরা জান, আমরা কত শতবার শান্তি চেয়েছি, তারা কি মেনেছে ? মানেনি, এখন আমি বলছি – তারা যুদ্ধ থামাতে বলছে, এখন কোনও যুদ্ধ তো নেই, এখন আত্মসমর্পণের পালা চলছে, সুতরাং আত্মসমর্পণের পালা চুকে যাক, আমরাও শান্তি চাই।" কিন্তু সেনাপতি আশতারের অরণ্যে রোদন করা হলো। আত্মসমর্পণের পালা বন্ধ হয়ে গেল। যে যার শিবিরে স্বাধীনভাবেই ফিরে চলে গেল। চির প্রতারক আমর ইবনুল আসের প্রতিভাপ্রসূত প্রতারণার পতাকাই উড্ডীয়মান হলো।" দুনিয়া প্রতারণার স্থল, প্রতারণা ব্যতীত জয় করা যায় না।" – হাদিস।

মলিন মুখে বসে গেলেন শের-ই-খোদা হযরত আলী, ম্লান মুখে মেনে নিলেন বিশ্বাসঘাতক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা গোষ্ঠীর প্রস্তাব। মুয়াবিয়ার হাতে ছিল প্রতারক আমর ও ঠক মারওয়ান, এবং হযরত আলীর হাতে ছিল জগদ্বিখ্যাত সাহাবী আম্মার প্রমুখ। হযরত আলী জীবনে কোনদিনই অন্যায়ের সাথে সন্ধি করেননি, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন আমর ও আব্দুল্লাহর শয়তানি, কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যবশত, এমনি এক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন,

অভদ্রা বর্ষাকাল
হরিণী চাঁটে বাঘের গাল।

কোরআন মোতাবেক মীমাংসা প্রস্তাব ঃ

এতদিন মুয়াবিয়া-আমর-মারওয়ান-আব্দুল্লাহ প্রমুখ হযরত আলীর সাথে ঠকবাজি খেললেন। এবার স্বয়ং আল্লাহর কোরআনের সাথে ধাপ্পাবাজি আরম্ভ করলেন। সব থেমে গেল। হযরত আলীর মন দমে গেল। মুয়াবিয়ার মন চাঙ্গা হলো। আমর বাহবা পেল। আব্দুল্লার স্বস্তি এলো। মারওয়ান পান চিবালো। সেনাপতি মালিক আশতার জীবনের মত আঘাত পেলেন। ঘরে-বাইরে 'মীরজাফর' থাকলে কাজ করা যায় না। ঘরে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও বাইরে ছিল আমর । এটা ধীরে ধীরে দিনের মত পরিষ্কার হয়ে আসবে।

হযরত আলী এবার আশয়াস ইবনে কায়েসকে আমির মুয়াবিয়ার নিকট পাঠালেন – বর্শার ডগায় কোরআন বেঁধে সমরে উত্তোলনের প্রকৃত কারণ কি । যদিও তিনি জানতেন – শান্তি নয় স্রেফ শয়তানি। তবুও পাঠালেন তাঁকে। মুয়াবিয়া দূতকে বললেন – "আমরা কোরআন অনুযায়ী আমাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে নিতে চাই। আমরা দু'পক্ষ হতে মাত্র দু'জন শালিসী নিযুক্ত করব। তাঁরা পবিত্র কোরআন মোতাবেক বিচার করে দেবেন।" দূত এসে হযরত আলীকে ঐ সব কথা বললেন। হযরত আলী বিলক্ষণ সম্মতি জানালেন। মুয়াবিয়াকে হযরত আলীর সম্মতির কথা জানানো হলে মুয়াবিয়া তাঁর একান্ত পরামর্শদাতা আমরকে জিজ্ঞাসা করলেন – "এবার কি করবো বলো?" আমর – "তোমার পক্ষ হতে আমাকে শালিসী নিযুক্ত করো। আমি তোমাকে খলিফা বানিয়েই ছাড়বো।" তখন মুয়াবিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে হযরত আলীকে তাঁর শালিসীর নাম (আমর) জানিয়ে দিলেন। হযরত আলী নাম জানতে পেরেই বুঝতে পারলেন – চক্রান্তের চূড়ামণি বিচার করবে, বিচার বা মীমাংসা কতটা প্রহসনে পরিণত হবে, তা তিনি সম্যকভাবেই অবহিত হলেন।

হযরত আলীর পক্ষে শালিসী ঃ

পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পরিণতি। ঐ নিষ্ঠুর, ঐ ক্রূর পরিণতির দিকে হযরত আলীর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা দিনের পর দিন অসহায়ভাবেই এগিয়ে যেতে থাকলেন। খলিফার আপন গোষ্ঠীর মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়েছিল শয়তান আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার কিছু মানুষ। পরিস্থিতি এমনি ঘুরপাক ও ঘোরালো হয়ে গিয়েছিল যে, তখন হযরত আলীর জন্য আর কিছু করারও ছিল না।

এই ঘোর অন্ধাকারচ্ছন্নময় পরিস্থিতিতে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন – "কাকে শালিসী নিযুক্ত করবো।" উত্তর এলো – 'আবু মুসা আশয়ারি'। উত্তরে

খলিফা বললেন – "তিনি তো আমার বিরোধীপক্ষের মানুষ, তাঁকে আমি কি করে আমার পক্ষ হতে শালিসী নিযুক্ত করতে পারি। আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করছি।" তখন উত্তর এলো – "তিনি তো আপনার আত্মীয়, তাঁকে শালিসী নিযুক্ত করা হবে না।" খলিফা বললেন – "আমর কি মুয়াবিয়ার আত্মীয় নয় ? তখন উত্তর – "সিরীয়বাসীরা কি করেছে, তা আমরা দেখতে রাজি নই, আমরা আমাদের কাজ করবো।" তখন খলিফা বললেন – "তাহলে আমি মালিক বিন আশতারের নাম উল্লেখ করছি।" সঙ্গে সঙ্গে বাধা এলো তিনি তো আপনার সেনাপতি, তিনি হতে পারেন না।" তখন খলিফা অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে বললেন – "সব জাহান্নামে যাও, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করো না, নাম পাঠিয়ে দাও।" অবশেষে তারা তাদের কুমতলব অনুযায়ী আবু মুসা আশয়ারির নাম পাঠিয়ে দিলো। এতে চঞ্চলমতি স্বার্থান্বেষী কুফাবাসীদেরও হাত ছিল, কুফা-চরিত্র চিরদিনই আস্থাহীন। কুফাবাসীরা খলিফাকে মদীনা থেকে গালভরা বাণী শুনিয়ে একদিন নিয়ে এলো। আজ কথায় কথায় মতবিরোধ করছে।

হোদাইবিয়ার পুনরাবৃত্তি ঃ

আমর ইবনুল আস খলিফার দরবারে এলেন সন্ধিপত্র প্রস্তুত করার জন্য। সন্ধিপত্রের লেখক ছিলেন এবার আহনাক। লেখক "আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী" লেখা মাত্র আমর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন - "আমরা যদি তাঁকে ঐ নামে মেনে নিতাম, তাহলে তো কোন ঝামেলাই থাকতো না। সুতরাং হযরত আলীর নামের পূর্বে 'আমিরুল মোমেনিন' লেখা চলবে না।", লেখক আহনাক বললেন – 'আমি কাটবো না'। আমর বললেন – 'না কাটলে মানবো না'। তখন হযরত আলী, একদিন মহানবী যেমন নিজ হাতে হযরত আলীর লেখা মীমাংসার খাতিরে কেটে দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে নিজ হাতে মীমাংসার খাতিরে আহনাকের লেখা কেটে দিলেন। এই সময় হযরত আলীর মনে কত কথাই না এক সাথে জেগে উঠলো। সেদিনের সেই মক্কাপ্রাঙ্গণে আজকের এই কুটিল কুচক্রের দালালগণ ও অগত্যা মুসলমানরা কোথায় ছিলো। আজকের এই নরাধম দালালগণ সেদিন মহানবীরও প্রাণনাশ করতে কম চেষ্টা করেনি। তবুও শের-ই-খোদা শান্তির খাতিরে মহানবীকেই অনুসরণ করলেন। অথচ এই পাপীদের প্রত্যেকেই মহানবীর মহা শত্রু রূপে হাজির ছিল হোদাইবিয়ার ঐ প্রাঙ্গণে।

সন্ধিপত্র ঃ হলফনামা ঃ

এই সন্ধিপত্র সম্পাদিত হলো আলী ইবনে আবু তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে। হযরত আলী কুফাবাসী ও তাঁর অন্যান্যদের পক্ষ হতে এবং

মুয়াবিয়া সিরীয়বাসী ও তাঁর অন্যান্যদের পক্ষ হতে বিচারক নির্বাচন করলেন। আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদিস মোতাবেক বিচার করার জন্য দু'জনকে নিযুক্ত করলাম। আবু মুসা আশয়ারি এবং আমর ইবনুল আস। তাঁরা কোরআন ও হাদিস মোতাবেক বিচার করবেন।" এই সন্ধিপত্র সম্পাদিত হলো সাঁইত্রিশ হিজরীর সতেরোই সফর (৬৫৯ খ্রীঃ)। উভয়পক্ষের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সন্ধিপত্রে সই করলেন। কিন্তু সেনাপতি মালিক আশতার এতে সই করলেন না। অতঃপর সবার সম্মুখে শালিসীদ্বয় শপথ পাঠ করলেন – "আমরা আল্লাহর নামে শপথ করছি পবিত্র কোরআন মোতাবেক ন্যায়ভাবে এই বিবাদের মীমাংসা করবো। রসুলের উম্মতগণকে আর বিবাদে ও যুদ্ধে পতিত করবো না।"

অতঃপর হলফনামাতে শর্ত থাকলো— এই দুই শালিসীয়ানকে এই বিরোধ মেটাতে চার থেকে ছয় মাস সময় দেওয়া হলো। তাঁরা এই সময়ের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করবেন। বিচার ঘোষণা করার স্থান নির্বাচিত হলো কুফা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী স্থান 'জন্দলের' নিকটবর্তী 'আযরহ' প্রান্তর। যখন শালিসীয়ানদ্বয় বিচার নিষ্পত্তির চূড়ান্ত ঘোষণার নিমিত্ত ওখানে রওনা হবেন, তখন তাঁদেব সাথে আপন আপন গোষ্ঠীর চার শত মানুষ থাকবে। এরা হবে আপন আপন গোত্রের জনপ্রতিনিধি।

সন্ধিপত্র তৈরি হলো। উভয়পক্ষের যথারীতি সই হলো। চারদিন পর এটা চূড়ান্ত রূপ নিল। উভয়পক্ষ আপন আপন কপি নিলেন। এবং উভয়পক্ষই আপন আপন রাজধানী কুফা ও দামেস্কে ফিরে গেলেন শূন্য হাতে নব্বই হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। হযরত আলী বহুবার এই হত্যাকাণ্ডটিকে এড়াবার নিমিত্ত একটি মীমাংসার জন্য পূর্ণ খেলাফত গঠনে বহুবার বহু আকুতি-মিনতি করেছিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছিল।

খারেজী দলের উদ্ভব ঃ

মুয়াবিযা দলবল-সহ সিরিয়ার পথে রওনা হলেন। তাঁর দলের মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিল না। উৎপাত দেখা দিল হযরত আলীর দলে। কি আশ্চর্য ব্যাপার, যারা একবার হযরত আলীকে জোর করেই বাধ্য করলো যুদ্ধ বন্ধ করতে, তারাই আবার কুফা যাত্রার প্রাক্কালে বায়না ধরলো ঐ সন্ধিপত্র অস্বীকার করে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করে মুয়াবিয়াকে পথিমধ্যে আক্রমণ করা হোক। হযরত আলী একথা শোনামাত্র আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন – "আমি তোমাদের যুদ্ধ বন্ধ না করার জন্য সিফ্‌ফিন প্রান্তরে কত অনুরোধ, কত উপদেশ, কত কথাই না বলেছি, তোমরা যখন আমার কথায় কোন মতেই কর্ণপাত না করে আমাকেই

হত্যার হুমকি দিলে, তখন আমি অত্যন্ত অনিচ্ছার সাথেই, একেবারেই নিরুপায় হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলাম। পরে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধিপত্র তৈরি হলো, উভয়পক্ষের সই হলো। একপক্ষ আপন পথে বাড়ি রওনা হলো। এই সময় আমি আর কি করে বলতে পারি সন্ধি মানি না। এটা হবে বিশ্বাসঘাতকতা। তোমরা জেনে রেখো – আলী কোনদিনই ঐ কাজ করে না। সন্ধির দেওয়া সময় ছ'মাস অপেক্ষা করতেই হবে।"

এই কথা বলে হযরত আলী কুফা রওনা হলেন। পথিমধ্যে সৈন্যদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক বেড়েই চলল। একদল বলল – সন্ধিপত্র ঠিকই আছে, অন্য দল বললো – এটা তো শরিয়তের ব্যাপার, কোরআন হাদিস ঠিক করবে, শালিসী কেন ? প্রথম দল বলল – "তোমরাই তো যুদ্ধ বন্ধ করতে সকলকে বাধ্য করেছিলে, এখন চুপ করো।"

এই দ্বিতীয় দলটি যারা সন্ধিপত্র অস্বীকার করলো, তারাই ইতিহাসে 'খারেজী দল' নামে অভিহিত। এদের মধ্যে আরো একটি দল ছিল, যারা বিনা বাক্যে হযরত আলীর মতামতকে মেনে নিতো, তাদের বলা হতো – 'রাফেজী সম্প্রদায়'। খারেজী শব্দের অর্থ দলত্যাগী।

এই স্ববিবোধ ঝগডা মিটবার নয়, তাই দুই পক্ষের বাদানুবাদ চরমে পৌঁছাল। অবশেষে চূড়ান্ত রূপ নিল বিবাদে। হযরত আলী এই দুই বিবদমান ঘোডাতে চেপে কুফাতে হাজির হয়ে লক্ষ্য করলেন, দ্বিতীয় দল চরম পন্থা নিতে প্রস্তুত। একদিন তাদের ভুল ও চরম পন্থা নেওয়ার জন্যই হযরত আলীকে সিফ্‌ফিন প্রান্তরে যুদ্ধ থামিয়ে স্বজ্ঞানেই মাবাত্মক ভুল করতে হয়েছিল। আজ আবার তারা আবদার ধরেছে স্বজ্ঞানে আবার আর একটি সর্বাত্মক ভুল করুন। এবার খলিফা বালখিল্য বালক দলকে এক ধমকে বুঝিয়ে দিলেন – "মন চায় চুপ করে বসে অপেক্ষা কর, না হয় যেখানে খুশি চলে যাও। মনে রেখো শের-ই-খোদা বেঈমান না।"

হযরত আলীর কড়া জবাবে ঐ বালখিল্য দলের বারো হাজার সৈনিক মরুয়া নামক স্থানে প্রস্থান করল। এরাই ইসলামের ইতিহাসে খারেজী বা বহিষ্কার নামে পরিচিত। এরা মরুয়াতে উপস্থিত হয়ে শপথ নিল – "আনুগত্য কেবল আল্লাহর, কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের কোন খলিফা বা আমির থাকবে না। আমরা জয়ী হলে আমাদের কাজ মুসলমানদের পরামর্শ ও মতানুযায়ী পরিচালিত হবে। হযরত আলী ও আমির মুয়াবিয়া দু'জনই সমান দোষী।

খারেজী দল ও হযরত আলী ঃ

হযরত আলী কুফার মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালনে তিনি কালবিলম্ব না করেই ঐ সমস্ত ঘরে গমন করলেন, যে বাড়িতে মানুষ আর যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে এলো না, তিনি ঐ সমস্ত বাড়িতে গমন করে প্রত্যেককে সান্ত্বনা দিলেন, তাদের সংসার চলার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর বিদ্রোহী খারেজীদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তাদের বোঝাবার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে তাদের নিকট পাঠালেন। আব্দুল্লাহ আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাদের পথে আনতে পারলেন না। কিন্তু বিজ্ঞ আব্দুল্লাহ আঁচ করতে পারলেন যে, খলিফা স্বয়ং এলে কাজটা হতে পারে। তাই তিনি খলিফাকে আমন্ত্রণ জানালেন ওখানে একবার যাওয়ার জন্য। খলিফা তথায় গমন করে তাদের সকলকে শান্তভাবে বোঝালেন।

খারেজী দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবনে কাওয়ার খলিফাকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি কেন মানুষেব মধ্যস্থ স্বীকার করলেন, যার ফলে আপনার ঐরূপ সিদ্ধান্তই আমাদের বিরোধী হতে বাধ্য করেছে। আমি মনে করি আমির মুয়াবিয়া নব্বই হাজার মুসলমানের প্রাণের জন্য দায়ী, বিদ্রোহী আচরণে দোষী। এক্ষেত্রে কোরআন সঠিক নির্দেশ দিয়েছে ঐ রূপ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।" এবার খলিফা বললেন – "আল্লাহর কসম করে বলো, মুয়াবিয়ার পরাজিত সৈন্যগণ যখন বর্শাগ্রে কোরআন গেঁথে শান্তি প্রস্তাব দিল, তখন কি আমি তোমাদের বলিনি, এটা একটা পরিষ্কার প্রতারণা। তোমরা যুদ্ধ বন্ধ করো না। তখন তোমরাই আমাকে যুদ্ধ বন্ধ কবতে বাধ্য করোনি ? তোমরাই কি আমাকে শালিসী মানতে বাধ্য করোনি ? তবুও আমি শালিসীদ্বয়কে শপথ করিয়ে নিয়েছি যে, তারা কোরআন হাদিসের বিরোধী রায় দিলে আমি তা মানতে বাধ্য নয়। আমি সন্ধিপত্রে তাঁদের এতটুকুই স্বাধীনতা দিয়েছি যে, তাঁরা শুধু জনগণকে পবিত্র কোরআনের বিধানটুকু পড়ে শুনিয়ে দেবেন।" কাওয়ার বলেন – "তাহলে ছ'মাস সময় দেওয়ার অর্থ কি ?" খলিফা – "এতে জনগণের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তা নিরসন হতে পারে।" খারেজীগণ তখন খলিফার মনের পবিত্রতা, স্বাধীনতা, মানবতা সবকিছুই সম্যক উপলব্ধি করে খুশি হলো। খলিফা তাদের একজনকে গভর্নরও নিযুক্ত করলেন। পরিশেষে সকলেই সানন্দে খলিফার সাথে আবার কুফা যাত্রা করলেন। আব্দুল্লার ধারণা সত্যে পরিণত হলো, খলিফার আগমনও সার্থক হলো। সকলেই কুফা পৌঁছলে খলিফা আব্দুল্লাহকে তাঁর আপন স্থান বসরাতে গিয়ে গভর্নরের দায়িত্ব ফিরে নিয়ে আপন কাজে মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দিলেন।

সিফ্‌কিনের সন্ধি

চরম ও চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা

এবার আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে, বেদনার সাথে, চরম হতাশার সাথে, বুকফাটা বিষন্নতার সাথে, সর্ব শরীরের শিথিলতার সাথে ঐ ভয়াবহ মারাত্মক জিনিসটি লক্ষ্য করবো, যা খোলাফায়ে রাশেদিনের যবনিকাপাত করে ইসলামের পবিত্র খেলাফতকে বধ করে ইসলামের ইতিহাস ও সমগ্র মুসলিম জাহানকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত ও কালিমালিপ্ত করেছে। কুখ্যাত আমর ইবনুল আস একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে, একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ হয়ে সবার ঊর্ধ্বে একজন সাহাবী (মহানবীর সঙ্গী) হয়েও দুনিয়ার লোভ ও লালসায় পড়ে পদ ও পদবির মোহে জীবনের পরিণত বয়সে, বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, গোধূলী লগ্নে পা দিয়ে, এক পা ঘরে ও এক পা গোরে রেখে কুফা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী স্থান জন্দলের নিকটবর্তী আযরহ নামক স্থানে খলিফা হযরত আলী ও আমির মুয়াবিয়ার বিচ্ছেদ ও কলহ মাঝে, ইসলামের খেলাফতের দ্বন্দ্ব নিরসনে, মুমূর্ষু খেলাফতকে বাঁচানোর পরিবর্তে খেলাফতের মীমাংসা কালে তিনি যে নৃশংস ভাবে পবিত্র খেলাফতকে বধ করে দিলেন, তা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলের নিকট, তামাম মুসলিম জাহানের নিকট, সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এক চরম চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।

বিচার প্রহসন ঃ

সকলের প্রত্যাশিত অপেক্ষমাণ কাল দীর্ঘ ছ'মাস সময় অতিবাহিত হলে – আবু মুসা আশয়ারি ও আমর ইবনুল আস যথাস্থানাভিমুখে আপন আপন চারশো প্রতিনিধি-সহ আরবী শাবান মাসে রওনা হলেন। এই যাত্রাকালে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, যেমন – আব্দুর রহমান বিন আবুবকর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং কুফার বিখ্যাত বোজর্গ ব্যক্তি শরিহ বিন হানিফ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এঁদের মধ্যে সর্বজনমান্য শরিহ বিন হানিফকে হযরত আলী বিদায়বেলায় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা আমরকে স্মরণ করিয়ে দিতে বললেন। 'তাসাউফ জড়', 'জ্ঞানের দরজা' হযরত আলীর মন যেন ওঁর সম্পর্কে আগেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল, তাই তাঁকে শেষবারের মত সতর্ক করে সাবধানবাণী পাঠালেন। বাণীগুলো — আল্লাহ্ বলেন ঃ

১। যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার শক্তিদান করবেন।" ৮ ঃ ২৯

২। "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার কর। অবশ্যই

আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম উপদেশ দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।" কোরআন ৪ ঃ ৫৮

৩। "তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো ও পাশ কাটাও, তবে তোমরা যা করছো, সে-বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" ৪ ঃ ১৩৫

৪। "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অটল থাকবে। . . তোমরা সুবিচারে অন্যথা করো না, তোমরা সুবিচার কর। এরই নাম 'তাক্ওয়া' বা আত্মসংযম।" ৫ ঃ ৮

৫। "নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও কল্যাণ করতে নির্দেশ দেন।' ১৬ ঃ ৯০

মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

"পঁয়ষট্টি বছরেব নফল এবাদত (অতিরিক্ত আবাধনা) অপেক্ষা একটি ন্যায় বিচাব শ্রেষ্ঠ।"

হযরত আলীর আপন বার্তা ঃ

১। "হে আমর, পবিত্র কোরআনকে ভুলে যেয়ো না।

২। ন্যায় ও নীতিকে বিসর্জন দিও না।

৩। পবকালকে ইহকালেব জন্য বিক্রি করো না।"

সন্ধিপত্রে চুক্তি ছিল— দু'জন শালিসীয়ান তাঁরা কোরআন-হাদিস মোতাবেক বিচার করে বিচাবের রাযটা উপস্থিত জনগণকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু কার্যত দেখছি তা হলো না। আমরের চক্রান্তে ও গভীর ষড়যন্ত্রে আরম্ভ হলো বিতর্কসভা। বৃদ্ধ আবু মুসা আশযারি আমরের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। এ ভয় হযরত আলী পূর্বেই কবেছিলেন। কিন্তু চঞ্চলমতি বেকুফ কুফাবাসীদের দৌরাত্ম্যেও কিছু করতে পারেননি। তাঁব আশঙ্কা শেষে অঘটনেই পরিণত হলো।

আমব — মুযাবিয়া কোরেশ বংশের সন্তান, মহানবীর পত্নী উম্মে হাবিবার ভ্রাতা, সাহাবী. ওহী লেখক, সুদক্ষ মানুষ।

আবু মুসা — সততা ও সাধুতাই মানুষের আসল গুণ, আমবা এখন একজন তৃতীয় সৎ ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করতে পারি। আমি মনে করি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যোগ্য ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ অতিরিক্ত ধ্যানমগ্ন ও নির্জন জীবনযাপন করতেন। এমনকি একদিন তাঁর স্ত্রী স্বয়ং মহানবীকে নালিশ জানান যে, তাঁর স্বামী সারা রাত্রি এবাদত বন্দেগী করেন, তাঁর প্রতি খেয়াল রাখেন না। তখন মহানবী আব্দুল্লাহকে ডেকে বলে দিলেন – "তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক আছে।" সমগ্র আববে তিনি একজন সাধু ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন।

আমর — আপনি ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহর নাম করছেন। আপনি তো আমার পুত্র আব্দুল্লার নাম করতে পারেন।

আবু মুসা — তোমার পুত্রও ভালো মানুষ, কিন্তু তুমি নিজেই তো দ্বন্দ্বের মূল ব্যক্তি হয়ে গেছো।

আমর — রাজ্যশাসন খুব বড় ব্যাপার, এখানে মুয়াবিয়াই একমাত্র উপযুক্ত মানুষ। আপনি তাঁকেই সমর্থন করুন। তিনি খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি।

আবু মুসা — আমর আল্লাহকে ভয় করো। স্বয়ং মহানবী বলেছিলেন – "যারা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছে, তারা তো অগত্যা মুসলমান, তাদের গভর্ণর বা কোন উচ্চপদ দেওয়া যাবে না, এবং যারা বদর যুদ্ধে যোগদান করেছে, তাদের সম্মান সবার উর্ধ্বে।" সুতরাং যাকে গভর্ণর করাতেই বাধা, তাকে খলিফা করা হবে কেমন করে ? এবং হযরত আলী কেবল মাত্র বদর যুদ্ধে যোগদানই করেননি, অধিকন্তু তিনিই ইসলামের পতাকাবাহী। অতএব জ্ঞানে-গুণে-ধ্যানে ও সর্ব ব্যাপারে আলীই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সাথে খলিফা পদে মুয়াবিয়া কেন, অন্য কারোরই তুলনা চলে না। আর যদি তোমরা বলো খলিফা ওসমানের কাসাস (মৃত্যু দাবি) গ্রহণের কথা, তাহলে তো স্বয়ং ওসমানের পুত্র আমরই আছেন, মুয়াবিয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং মুয়াবিয়া কোনদিক থেকেই খলিফা হওয়ার যোগ্য নয়।

আমর — হে মুসা, আপনি জ্ঞানী মানুষ, আপনাকে আমার কিছু বোঝাবার নেই। আমি কেবল মাত্র আপনাকে একটি কথাই অনুরোধ করছি যে, আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, মুসলমানরা আজ বিপদাপন্ন, খেলাফত সঙ্কটাপন্ন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত ঐ দু'জনকেই বাদ দিয়ে মুসলমানদের হাতে তাদের অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে তারা আপন ইচ্ছানুযায়ী একজনকে খলিফা নির্বাচিত করতে পারে।

আবু মুসা — আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

অতঃপর আবু মুসা তাঁর আপন লোকদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে অনুরোধ ও সতর্ক করলেন – "আপনি কিছুতেই প্রথমে কিছু বলবেন না। আল্লাহর কসম, আপনি প্রথম কিছুই ঘোষণা করবেন না। আমিরুল মোমেনিন হযরত আলীর একান্তভাবেই মনে হয়েছে আমর প্রতারণা করবেই। আল্লাহর কসম, আপনি প্রথম কিছুই ঘোষণা করবেন না।"

এদিকে আমর মিলিত হলেন তাঁর আপন লোকদের সাথে, এবং কিভাবে সরলমতি বৃদ্ধ আবু মুসাকে প্রতারিত করে মুয়াবিয়াকে খলিফা করবেন, তা সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন। সকলেই খুব খুশি হলো, বুড়োর বদ্ চালে।

অতঃপর আবু মুসা ও আমর একত্রিত হলেন। আমর বললেন – "আপনি আমার গুরুজন, আপনাকে সকল মানুষ শ্রদ্ধা করে, আপনার কথা সকল মানুষ মন দিয়ে শ্রবণ করে ও মান্য করে। আপনি সকলের বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, আপনার জ্ঞান-গরিমার কোন শেষ নেই। আপনি মুখ দিয়ে যা বলেন, সমগ্র দেশবাসী তা মেনে নেয়। কেবল মাত্র আপনার মুখের একটু কথার দরকার।" এইভাবে চতুর আমর সাত পাঁচ করে, উল্টোপাল্টা ভাবে বুঝিয়ে বুড়োটাকে চিত করে ফেললেন। আপনি শুধু দাঁড়িয়ে বলে দিন, আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে অনুসরণ করবো। আপনি শুধু একটি কথা বলুন – "আমি আলীকে খেলাফত পদ হতে বরখাস্ত করলাম, আমরও এইভাবে মুয়াবিয়াকে বরখাস্ত করবে। তখন আপনারা একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচিত করবেন।" অথর্ব বৃদ্ধ মুসা এইটুকুই বুঝতে পারলেন না যে, মুয়াবিয়া তো খলিফাই না, তাহলে তাকে কি করে খলিফা পদ হতে বরখাস্ত করবে। এ প্রশ্নই ওঠে না।

আবু মুসা — হে মুসলিম ভাইসকল, আমরা দু'জনে বহু চিন্তা-ভাবনা করলাম, বহু আলোচনা করলাম, একটি ভাল উপায় বের করেছি। একটি সমাধান পেয়েছি। আমরা উভয়ই খুবই আনন্দিত। এখন আমি আপনাদের সামনে সেই সমাধান রায় পেশ করছি – "আমি হযরত আলীকে খলিফার পদ হতে তুলে নিলাম।"

আমর — "হে জনগণ, আপনারা সকলেই সাক্ষী আছেন যে, আবু মুসা হযরত আলীকে খলিফার পদ হতে বরখাস্ত করেছেন। আমিও তাঁর রায় মেনে নিয়েই হযরত আলীকে বরখাস্ত করলাম, এবং ঐ শূন্যপদে আমি মুয়াবিয়াকে মনোনয়ন করলাম। আজ হতে মুয়াবিয়া খলিফা হলেন।"

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ আবু মুসার মূর্ছিত হওয়ার উপক্রম হলো। কিছু মানুষ তাঁর মুখে পানি ছেটোতে থাকল। কিছু মানুষ বিশ্বের অন্যতম প্রতারক আমরকে হত্যা করার জন্য ছুটলো, বাকি সমস্ত মানুষ এক কণ্ঠে বলতে শুরু করলো – বিশ্বাসঘাতক আমর, প্রতারক আমর, মিথ্যাবাদী আমর, কপট আমর, মোনাফেক আমর, কাজ্জাব আমর। অর্থাৎ যার মুখে যা এলো, তাই বলতে লাগলো। তখন জগৎকলঙ্ক আমর ছুটে গিয়ে মুয়াবিয়ার দলবল সিরিয়াবাসীদের মধ্যে মিশে গেছে। বৃদ্ধ আবু মুসা এই বিশ্বনিন্দিত ঘটনার পর শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় আর বেশিদিন বাঁচেননি।

এই শালিসীটির মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। খেলাফতকে মজবুত করা। কিন্তু দেখা গেল উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হলো। একজনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, তিনি চতুর মুয়াবিয়া। কেননা তিনি চেয়েছিলেন হাতে কিছু সময়, যার মধ্যে আপন ভাবী প্রস্তুতিটাকে পাকিয়ে নেবেন। তাঁর কাজ

সমাধা হলো। কিন্তু খলিফা আলীর পক্ষে বিচারের নামে চরম প্রহসনে চূড়ান্ত প্রতারণাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। সুচতুর মুয়াবিয়া, পরাজিত মুয়াবিয়া ছলে-বলে-কৌশলে প্রতারণায়-প্রবঞ্চনায়-বজ্জাতি ও জালিয়াতিতে আপন পরাজয়কে মূর্খের আত্মতুষ্টির সন্ধানে বিজয়ে পরিণত করলেন ঠকবাজ আমরের দ্বারা। এককথায় ক্ষমতালোলুপ মুয়াবিয়া ছ'মাসের বিরাট ছলনার মাধ্যমে আপন ঘর গুছিয়ে নিলেন। অন্যদিকে, সরল সহজ সত্যের চিরনির্ভীক সেনা হযরত আলীর এই ছ'মাসে সৈন্যদের মধ্যে গৃহদ্বন্দ্বের কোন সীমা থাকল না। সুতরাং এই পরিবেশে মহান আলী হলেন দুর্বল এবং মনুষ্যত্ববিহীন মুয়াবিয়া হলেন সবল। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ-মীমাংসায় শান্তি তো এলোই না, শতগুণে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠল। যতদিন মানুষ আছে, ততদিন তাদের দ্বন্দ্ব ও মীমাংসা থাকবে, এই সূত্রে বহু মানুষের চিরদিন স্মরণে থাকবে, মুসলিম জাহান চিরদিন মনে রাখবে, কুফা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী স্থান জন্দলের নিকট আযরুহ নামক ময়দানে খলিফা হযরত আলী ও আমির মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের যে মীমাংসা-রায়, তা আমর কর্তৃক একটি ঐতিহাসিক চরম ও চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার দৃপ্ত ঘোষণা, নির্লজ্জ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা।

ভাবো যারে কালো তুমি সেই তব ভালো
ভাবো যারে ভালো তুমি সেই তব কালো।
তিনি তো মঙ্গলময়, তুমি কি জান না
করেন মঙ্গলই শুধু কেন হে মান না।
না পেরে বুঝিতে তব নিগূঢ় বিধান
হায় হায় করে বলি কি হলো মহান। ২ঃ২১৬

দশম অধ্যায়

হযরত আলী ও খারেজী সম্প্রদায়

খারেজী বিদ্রোহ ঃ

সিফ্‌কিফের যুদ্ধে বিজয় যখন হাতের মুঠোতে তখন এই খারেজী দলই হযরত আলীকে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করেছিল। আবার যুদ্ধ থামিয়ে যখন শালিসী মানতে নামলেন, তখন এই খারেজী দলই বলে উঠল — অতর্কিতে সিরিয়া আক্রমণ করুন। তখন আলী বললেন - 'ওরূপ কাজ তো বিশ্বাসঘাতকের, আলীর নয়।' সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে মীমাংসার সর্তানুযায়ী ছ'মাস অপেক্ষা করার পর মীমাংসা যখন একেবারেই বিশ্বাসঘাতকতায় শূন্যে বিলীন হয়ে গেল, তখন আলী পুনরায় পূর্ববৎ বিদ্রোহী মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালাবার জন্য সকলকে আহ্বান জানালেন। ইতিমধ্যে খলিফা খারেজীগণকে বুঝিয়ে কুফাতে এনেছিলেন। এবার খারেজীগণ নতুন চালে খলিফাকে উত্তর করল - 'আপনি খেলাফতের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক মেনে নিয়ে ইমান হারিয়েছেন, সুতরাং আপনি প্রথম ভুল স্বীকার করুন ও তওবা (ক্ষমাপ্রার্থনা) করুন।' খলিফা বললেন — আমি বলেছি কোরআন ও হাদিস মোতাবেক মীমাংসা মেনে নেবো। এতে কোন ভুল বা অন্যায় নেই। সুতরাং 'তওবা' করার প্রশ্নই ওঠে না। খারেজীগণ বলল - 'লা হাক্‌মা ইল্লা বিল্লাহে - আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নির্দেশদানের অধিকার নেই'। এইভাবে নানা বাদানুবাদ, কথা কাটাকাটির মধ্যেই সভা ভন্ডুল হয়ে গেল।

অতঃপর হযরত আলী মসজিদে গিয়ে একটি ভাষণ আরম্ভ করলেন। তৎক্ষণাৎ মসজিদের এক প্রান্ত হতে একজন বিদ্রোহী খারেজী বলে উঠল ঐ একই কথা - 'লা হাকমা ইল্লা বিল্লাহ'। তখন খলিফা বললেন - 'হে ভাইসকল, তোমরা লক্ষ্য করো ওরা কিভাবে কোরআনের অপব্যাখ্যা আরম্ভ করেছে। কিভাবে আমাকে বিপদাপন্ন করার চেষ্টা করছে। যতদিন ওরা আমার সাথে ছিল, আমি ওদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছি। ওদের আমি গনিমতের মালে অংশ দিয়েছি।আমি ওদের কোন দিনই মসজিদে আসতে নিষেধ করবো না। আমি ওদের সাথে কোনদিন যুদ্ধ ঘোষণা করবো না, বা যুদ্ধও করবো না যতক্ষণ ওরা আমাকে ওকাজে বাধ্য না করে। তবে তোমরা সকলেই জেনে রেখো - আমি জেহাদ করছি ও করবো কেবল ইসলামের জন্য, অন্যায়ের ও অসতের বিরুদ্ধে। অসতের হাতে হাত মিলিয়ে আমি কোনদিনই কোন কাজ করিনি এবং করবো না। রাজ্যের জন্য নয়, সত্যের জন্যই আমার সংগ্রাম, এই সংগ্রামে শহিদ হওয়া ও আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া একই বস্তু।" এই বলে তিনি মসজিদ হতে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর বিদ্রোহী খারেজীগণও গোপনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের গৃহে মিলিত হলো। এবং গোপন সম্মেলনে পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত নিলো। প্রথম কুফা ত্যাগ করা, দ্বিতীয় হযরত আলীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। তৃতীয় নিজেদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, চতুর্থ নিজেদের মধ্যে নেতা নির্বাচন করা, পঞ্চম হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়া। এইভাবে ঐ সভাতেই আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাবকে নেতা নির্বাচন করে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

নাহরাওয়ানে গোপন ঘাঁটি ঃ

বিদ্রোহী খারেজীদের এই সিদ্ধান্ত তাদের অন্যান্য সকলকে সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর তারা যে যেখানে ছিল, ধীরে ধীরে দলে দলে গোপনে নাহরাওয়ানে মিলিত হতে থাকলো। নাহরাওয়ান ছিল মাদায়েনের অন্তর্গত একটি সুরক্ষিত পার্বত্য এলাকা। যখন খলিফা জানতে পারলেন যে, সকল বিদ্রোহী খারেজীগণ খলিফার বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানে মিলিত হচ্ছে। তিনি সেখানকার গভর্নর সায়াদকে নির্দেশ দিলেন ওদের গতিরোধ করতে। খলিফার নির্দেশক্রমে গভর্নর সায়াদ 'করজ' নামক স্থানে ওদের গতিপথ অবরুদ্ধ করলে দুই পক্ষে প্রবল সংঘর্ষ বাধল। সারাদিন যুদ্ধের পর খারেজীগণ তাদের পরাজয় অনিবার্য জানতে পেরে রাতের অন্ধকারে দজলা নদী অতিক্রম করে উত্তরদিকে ধাবিত হয়। বসরার বিদ্রোহী খারেজীগণ সম্পর্কেও খলিফা তথাকার গভর্নর আব্দুল্লাহকে একই নির্দেশ দিলে গভর্নর আবুল আসওয়াদকে তাদের গতিপথ অবরোধের জন্য নিযুক্ত করেন। তখন খারেজীগণ একইভাবে রাতের আঁধারে ফোরাত নদী অতিক্রম করে পলায়ন করে। এইভাবে তারা যে যেখানে ছিল, সকলেই নাহরাওয়ানে মিলিত হলো।

হযরত আলীকে কাফের ফতোয়া ঃ

যখন বিদ্রোহী খারেজীগণ সকলেই নাহরাওয়ানে একত্রিত হয়ে নিজেদের সুসংরক্ষিত বলে মনে করল, তখনই তারা খলিফার বিরুদ্ধে নানা রকমের হুমকি দিতে আরম্ভ করলে খলিফা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হলেন। ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা, সমগ্র মুসলিম জাহানের লোমহর্ষক কাহিনী, যখন খারেজীগণ পাগলের ও উন্মাদের মত স্বয়ং শের-ই-খোদা হযরত আলী ও তাঁর খেলাফতের তামাম মুসলমানগণকে কাফের বলে ফতোয়া দিল। এই দলটিই ছিল প্রথম হতেই মোনাফেক বেঈমান। এদের ষড়যন্ত্রই ছিল জলঘোলা করে সেই ঘোলা জলে আপন স্বার্থসিদ্ধি লাভ, ইসলামের খতম। এরা ইসলামকে খতম করতে

পারলো না ঠিকই, কিন্তু ইসলামের পবিত্র খেলাফতের খতমে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে প্রবল সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়াল। এরা যদি খলিফার সাথে যেমন ছিল, তেমনি ভাবে থাকতো, তাহলে ইসলামের ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিতো। এদের একটি বিশেষ গুণ ছিল, এরা ছিল অকৃত্রিম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, নিপুণ ও মরিয়া যোদ্ধা। কখনো ইরাকীদের মত অস্থির ও চঞ্চল ছিল না। জীবন-মরণ পণ করতে জানতো। শেষকালে চরম ভুলবশত মরণেই পা বাড়ালো।

খারেজী বিদ্রোহ দমন ঃ

ইতিমধ্যে খারেজীগণ পঁচিশ হতে ত্রিশ হাজারে পরিণত হল। এই সংখ্যাটাও তাদের মাথাটাকে আরো একটু উত্তপ্ত করে দিল। তাঁরা ভাবলো খলিফা আলীর বসরা ও কুফায় কতকগুলো নিরীহ মেয়ে-মার্কা সৈনিক তাদের সাথে পেরে উঠবে না। এই মনের জোরে তারা অত্যন্ত দাম্ভিক হয়েই হযরত আলীর বিরুদ্ধে অমানুষিক কাজ আরম্ভ করল। যখনই যেখানে সুযোগ পেতো বিশাল খেলাফতের নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করতে শুরু করল। বিজ্ঞ খলিফা তখন সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতিকরণের জন্য তিনি বিভিন্ন গভর্নরকে জানিয়ে দিলেন সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁর সাথে কুফাতে মিলিত হতে। তিনি নিজে কুফাবাসীদের বারবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কেননা আমির মুয়াবিয়া ইতিমধ্যেই অনেক সময় পেয়ে গেছে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। হেনকালে বসরা হতে তিন হাজারের মত একটি বাহিনী-সহ গভর্নর আব্দুল্লাহ খলিফার সাথে মিলিত হওয়াতে কুফাবাসীগণ নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে চল্লিশ হাজারের মত এক বিশাল বাহিনী গঠন করলেন।

খলিফার পত্র প্রেরণ ঃ

খলিফা শেষবারের মত খারেজী নেতা আব্দুল ওয়াহাবের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে তাঁকে তার দলবল-সহ সিরিয়া অভিযানে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করলে আব্দুল্লাহ উত্তরে লিখলেন – "আপনি যে সিরিয়া অভিযান করছেন, ওটা আপনার নিজের ব্যাপার। আমরা আপনার সাথে মিলিত হয়ে আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, যদি আপনি আমাদের শর্ত মেনে নেন, অন্যথায় আমরা আপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করব। আমাদের শর্ত – আপনাকে স্বীকার কবতে হবে যে আপনি কাফের হয়েছেন এবং তওবা করে ক্ষমা চাইবেন।" খলিফা এই পত্র পাওয়ার পর খারেজীদের একেবারেই ত্যাগ করে সিরিয়া অভিযানে প্রস্তুত হতে থাকলেন।

নতুন পরিস্থিতিতে সিরিয়া অভিযান স্থগিত ঃ

"মানুষের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত।" ৮১ ঃ ২৯। খলিফা আলী সর্বান্তঃকরণে সকল দিক থেকেই সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হেনকালে এমনি একটি ঘটনা ঘটে গেল তাঁকে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো। মহান যত বড়ই হোন, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার শক্তি কারো নেই। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি স্বয়ং আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন। প্রকারান্তে যাকে নিয়তি বা ভাগ্যও বলা হয়ে থাকে। আমরা বারবার লক্ষ্য করছি পরিস্থিতি ও পরিবেশ হযরত আলীর অনুকূলে গেল না। ভাগ্যও তাঁর সহায় হলো না। ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধের বিজয়ী বীর পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে আজ যেন রণক্লান্ত। সমর যাঁর শিরায় শিরায় ধাবিত, সংগ্রাম যাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে স্পন্দিত, তিনি আজ রণক্লান্ত। যে কোন পাঠক এ সত্য সহজে অনুধাবন করবেন, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে হয়তো বা আহতও হবেন। পরিস্থিতি পরিবেশের জন্য পরিশেষে আপাত অসত্যের জয় ঘোষিত হলো।

খড় কুটো ভেসে যায় প্রবল বানে
মানুষ বাহিত হয় নিয়তির টানে।
তোমারই ইঙ্গিতে চলে নিখিল ধরা
নিয়তির হাতে বাঁধা মানুষ মোরা।
পরিস্থিতি পরিবেশ তব হাতে গড়া
মানুষের ধর্ম সেথা গড়িয়ে পড়া।

পরিস্থিতি পরিবেশ না কর হেন
প্রবঞ্চনায় প্রতারণায় না পড়ি যেন।
পরিস্থিতি পরিবেশ এমন কর
সকল কাজই হোক সহজতর।
পরিস্থিতি পরিবেশ না কর হেন
কারো হাতে নাহি হই হয়রান যেন।

পরিস্থিতি পরিবেশ না হোক হেন
কোন জনেই নাহি করি পেরেশান যেন।
অনুকূলে নাহি যায় পরিস্থিতি যার
বড়ই করুণ হয় ভাগ্য তাহার।
প্রতিকূলে গড়ে উঠে পরিবেশ যার
কোন মূল্য নাহি তার বিশাল যোগ্যতার।

কখনো মানব তার মহান মর্যাদায়
কখনো নোংরা জনে জীবন হারায়।
মানব জীবন বড়ই সমস্যা সঙ্কুল
পরিস্থিতি পরিবেশ কর অনুকূল।
না পেরে বুঝিতে তব নিগূঢ় বিধান
হায়-হায় করে বলি কি হলো মহান।

কোরআন — ২ ঃ ২১৬, ২০ ঃ ২৫, ২৬, ২৪ ঃ ১১
৪১ ঃ ৪৬, ১১৩ ঃ ১৫, ১১৪ ঃ ১–৬

খারেজীগণ কর্তৃক খলিফার দূত হত্যা ঃ

হযরত আলী কেন সিরিয়া অভিযান স্থগিত করলেন। খারেজীগণের বর্বরতা, চরম সীমালঙ্ঘন শের-ই-খোদাকে বাধ্য করল সিরিয়া অভিযান বন্ধ করে খারেজী অভিযান পরিচালনা করতে। ঘটনাটি ছিল বড়ই মর্মান্তিক, বড়ই পাশবিক। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জালাব নিজ কাজে বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে নাহরাওয়ানের নিকটবর্তী হলে খারেজী গোত্রের কিছু মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তারা তাঁকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সরল মনে সরাসরি উত্তর দেন। তাবা তাঁকে চার খলিফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সকলেরই উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করেন। তখন তারা বিশেষভাবে হযরত আলীর কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন – "হযরত আলী তো শের-ই-খোদা, জ্ঞানের দবজা। তখন বর্বব খারেজীগণ বলে – "আপনি একথা বললে আপনাকে আমরা হত্যা করবো।" তখন সাহাবী বলেন – "আমাকে তোমরা মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ। আমি আমাব জীবন অপেক্ষা রসূলের বাণীকে অনেক বেশি ভালবাসি। ওকথা তো আমার না, রসূলের বাণী। আমি বলবই। তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো।" তখন বর্বর খারেজীগণ ঠান্ডা মাথায় নিরপরাধ সাহাবীকে একাকী পেয়ে ঐ স্থানেই হত্যা কবল।

এই ভীষণ সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি খারেজীদের নিকট দূত পাঠালেন। কেন তারা এহেন অপরাধ করল। দূত তাদের নিকট এসে তার আগমনের কথা বলা মাত্র, তারা আর এতটুকুও দেরি না করেই দূতকেও অতীব নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করল, জঙ্গলের খুনীরাও যা করতে পারে না। এই ভয়াবহ সংবাদ হযরত আলীর নিকট পৌঁছানোর পরই তিনি তাঁর সহজাত সিংহবিক্রমে জেগে উঠলেন, যেমন একদিন জেগে উঠেছিলেন সাহাবী হযরত আম্মার ও হযরত ওয়ায়েস কারণীর শাহাদতে। তিনি বললেন – "এ হেন অন্যায় আমি বরদাস্ত করতে পারি না। খারেজীদের হাতে আজ মুসলমানরা চরমভাবেই বিপদাপন্ন।"

অন্যান্য সকলেই খলিফার নিকট গমন করে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সিরিয়া অভিযান বন্ধ করে খারেজী অভিযান পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানালেন। কেউ কেউ একথাও উত্থাপন করলেন যে, আমরা সিরিয়া অভিযানে বের হয়ে গেলে খারেজীগণ হঠাৎ কুফা আক্রমণ করে মহিলা ও শিশুদের এক রাতে খতম করতেও দ্বিধাবোধ নাও করতে পারে, তাদের আচরণ এমনি পশুবৎ হয়েছে। খলিফা তাঁদের সাথে এবং তাঁরাও খলিফার সাথে খারেজী অভিযানে একমত হলেন। যথাসময়ে অভিযান বের হলো।

নাহ্‌রাওয়ানের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে খলিফা জানতে পারলেন খারেজীগণও অগ্রসর হচ্ছে তাঁর সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য। খলিফা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্তপাত এড়াতে চেয়েছিলেন। দুই সেনাবাহিনী কাছাকাছি হওয়ার পর খলিফা নিজেই তাদের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন – "আমি অহেতুক রক্তপাত পছন্দ করি না, তোমরা আমার নিকট তোমাদের ঐ লোকদেব পাঠাও, যারা অহেতুক মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমি তাদের বিচার করবো। আমি সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু বাধ্য হলাম তা আপাত ত্যাগ করতে তোমাদের নিষ্ঠুর আচরণে। আশা করি আল্লাহ্ তোমাদের সুবুদ্ধি দেবেন।"

খলিফাকে হত্যার হুমকি ঃ

খারেজীগণ খলিফার পত্র পেয়ে নিজেদের মাথা ঠিক রাখতে পারলো না। এমন একটি জবাব দিল, যা চিন্তাও করা যায় না। খলিফা তাদের খুব অনুনয়-বিনয় করেই পত্র দিয়েছিলেন, যাতে কোন রক্তপাত না ঘটে। কিন্তু খারিজীগণ চরম অজ্ঞতাবশত অত্যন্ত অবহেলার সাথেই স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করে সাধারণ মুসলমানদের হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে স্বয়ং খলিফাকেই হত্যার হুমকি পাঠালো"—"আমরা আপনার ভক্ত বা অনুসারীদের হত্যাকে মোবাহ (যা করলে পাপ ও পূণ্য কোনটাই হয় না) মনে করি। বর্তমানে আপনার হত্যাকেও মোবাহ মনে করছি।"

খারেজী উৎপাত স্তব্ধ ঃ

হযরত আলী এ হেন ধারণাতীত ও অপমানজনক পত্র পেয়েও মাথা ঠিক রেখে আরো একবার বোঝাবার জন্য তাদের নিকট গমন করে বোঝাবার চেষ্টা করলে তারা সদলবলে হযরত আলীর সম্মুখে নানা ধরনের অপমানজনক কথা উত্থাপন করে পাগলের ন্যায় চেঁচামেচি ও চিৎকার আরম্ভ করে দিল। যাতে কারো ইচ্ছা থাকলেও সে যেন হযরত আলীর কথা শুনতে না পায়। তখন তাদের শুধু এইটুকুই বললেন যে, আবার আমি ফিরে আসছি, আমি মর্মাহত তোমাদের কথা ভেবে।"

অতঃপর মহান আলী কিছুদূর পিছিয়ে এসে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন যে —"হে আল্লাহ্, আমি নিরুপায় তুমি অন্তর্যামী তারা আমার কথা শুনলো না, আমি জানি এই যুদ্ধে তারা শেষ হয়ে যাবে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই মহান আলী তাদের দশ হাজার খারেজীকে একেবারেই পরিবেষ্টন করে ফেললেন। যুদ্ধ করা অথবা প্রাণ দেওয়া ব্যতীত পালাবার কোনই উপায় ছিল না। খলিফার মাত্র সাতজন শাহাদত বরণ করলেন এবং তাদের দশ হাজারের মধ্যে দশজনও রেহাই পেল না। এখানেই খারেজী উৎপাত খতম হলো।

রণক্লান্ত সৈনিক মাঝে হযরত আলী ঃ

মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ঃ

হযরত আলী বিবামবিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কি করে ইসলামের পবিত্র খেলাফতকে আবার প্রতিষ্ঠা করা যায়, কি করে ইসলামের বিলীয়মান ধারাকে আবার বলবান করা যায়। এর জন্য খলিফার চোখে দিবারাত্রি ঘুম নেই। তিনি বুঝতেই পেরেছিলেন খেলাফতের শুকনো ধারাটি প্রাণহীনভাবে চলছে। প্রকৃত খেলাফত অস্তমিত হয়েছে খলিফা ওসমানের খেলাফতের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। তাই তিনি তাঁর প্রাণের আকুলতা ও ব্যাকুলতা নিয়ে যা কিছুই করছেন খেলাফতের প্রাণ ও পবিত্রতাকে উদ্ধার করার জন্য। সেখানে খারেজীগণকে পরাজিত করা ও মুয়াবিয়াকে পরাস্ত করা তাঁদের নিকট গৌণ ব্যাপার ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাণহীন খেলাফতে যথার্থ প্রাণসঞ্চার করা। এই একমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি যেন তাঁর দিনের বিশ্রাম ও রাতের নিদ্রাকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

খারেজী বিদ্রোহ দমন করার পর তিনি সিরিয়া বিদ্রোহ মুয়াবিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে সত্বর নখলিয়া নামক স্থানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলে হযরত আশয়াস বিন কায়েস খলিফাকে অনুরোধ করলেন, সৈন্যবাহিনী রণক্লান্ত, তাদের কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন, সুতরাং আপনি কিছুদিন যুদ্ধ বিরত রাখুন।" খলিফা আপন মনের, আপন প্রাণের তাগিদে যে অনুপ্রেরণা পাচ্ছিলেন, অনুরূপ প্রেরণা আশা করছিলেন সেনাবাহিনীর নিকট হতে। কিন্তু সকলেই শের-ই-খোদা আলী ছিলেন না, জ্ঞানের দরজা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন সাধারণ সৈনিক। জামাল, সিফ্ফিন ও নাহরাওয়ানে পর পর যুদ্ধ করে তাঁরা যেন রণক্লান্ত। তাই যুদ্ধে এসে গিয়েছিল অনীহা, উদ্যমহীনতা। খলিফা সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করলেন নখলিয়াতে শিবির স্থাপন করতে। তাঁরা তাঁর অনুরোধ রক্ষাও করলেন কর্তব্যের খাতিরে। কিন্তু প্রাণের তাগিদ না জাগলে যুদ্ধ করবে কে। কয়েকজনকে জোর করে একত্র করা যায়, কিন্তু একাত্ম কবা যায না। এখানেও

তাই হলো। সৈনিকরা একের পর এক নানা কারণে-অকারণে শিবির ত্যাগ করে বাড়ি ফিরলেন। তখন শিবির প্রায় শূন্য হয়ে এলো। এই রূপ ধরনের কাছাকাছি ঘটনা স্বয়ং আল্লাহর রসূল মহানবীর জীবনেও দ্বিতীয় বদর ও তাবুক অভিযানে ঘটেছিল। সুতরাং এরূপ ঘটনা হযরত আলীর জীবনে অস্বাভাবিক বলে কিছু ছিল না। এটাই মানব সমাজের অতি সাধারণ প্রথা ও চিরন্তন ধারা। খলিফা অতি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই শিবির তুলে দিয়ে দ্বিধা জড়িত পদে চিন্তিত মনে শের-ই-খোদা কুফা ফিরে গেলেন।

কেন কুফা এসেছিলেন ঃ

কুফা পৌঁছিয়ে তিনি কুফার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের ডাক দিলেন। সকলেই সমবেত হলে, তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বললেন — কি তাঁর বাসনা, কি তাঁর অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, আকাঙ্খা। সকলেই বুঝলেন মনের দিক থেকে তিনি ঝরণার পানি অপেক্ষাও পবিত্র ও পরিষ্কার। তাঁর মনের অভিমানও খুলে দিলেন সকলের সম্মুখে। কেন তিনি পবিত্র মদীনা ত্যাগ করে কুফা এসেছিলেন। কেন তিনি মহানবীর রওজা মুবারক ত্যাগ করে এখানে এলেন। কেন তিনি জ্ঞানের সাধনাকে বিসর্জন দিয়ে এ কাজে যোগদান করলেন। বারবার উল্লেখ করলেন — মদীনা ত্যাগ তাঁর জন্য বড়ই হৃদয় বিদারক ছিল। পরিশেষে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি মক্কা হতে মদীনা এসেছিলেন ইসলামের জন্য, আবার আজ মদীনা ত্যাগ করছেন সেই ইসলামেরই জন্য। অতঃপর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলের সাথে কথা বলে নিরাশ হয়েই হযরত আলীর নিকট ফিরে এলেন। খলিফা ভাতের লক্ষণ তেলেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এক অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর উত্তরের জন্য আপন মনকেও প্রস্তুত রেখেছিলেন। তাঁরা এসে উত্তর দিলেন – "হে খলিফা, এখন যুদ্ধ বন্ধ থাক।"

সৈনিকদের মধ্যে শেষ ভাষণ ঃ

অতঃপর খলিফা বিকারহীন মন নিয়ে বিকারগ্রস্ত সৈন্যদের শেষবারের মত আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

"হে প্রিয় কুফাবাসীগণ, মনে রেখো একদিন সিরিয়া তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে। সে জয় তাদের শক্তির আধিক্যের নিমিত্ত হবে না, হবে নেতার প্রতি আনুগত্যের জন্য। অথচ তাদের নেতা জালেম, অত্যাচারী। আমি আল্লাহর পথে মোজাহিদ। তাদের নেতাকে তারা ভয় করে, কিন্তু আমি তোমাদের ভয় করি ও ভালবাসি। আমি তোমাদের খলিফা, তোমরা আমার নির্দেশ পালন করবে, কিন্তু আমি তোমাদের নির্দেশ পালন করছি। আমি তোমাদের আল্লাহর পথে আহ্বান জানাচ্ছি, তোমরা কিন্তু অলসতায়, অমনোযোগিতায় ডুব দিচ্ছো।

লক্ষ্য কর– আমি তোমাদের খলিফা, আল্লাহর আজ্ঞাবহ, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না। কিন্তু সিরিয়াবাসীদের নেতা আল্লাহর নাফরমান, অথচ তারা তার আজ্ঞাবহ। আল্লাহর কসম, মুয়াবিয়া যদি তোমাদের সাথে তাদের পরিবর্তন করে, আমি কতই না খুশি হতাম। তোমাদের দশ জনের বদলে তাদের মত একজনকে পেলেও আমি খুশি হতাম।

তোমরা পবিত্র কোরআনের ঐ কথা ভুলে যাচ্ছ – "আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা বোঝে না। তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু দেখে না। তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু শোনে না। তারা পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়, তারা উদাসীন। ৭ ঃ ১৭৯।

তোমাদের চরিত্র বড়ই চঞ্চল, যার মধ্যে কোন দৃঢ়তা নেই, যে কারণে তোমাদের মধ্যে বিপদে কোন আস্থা রাখা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভর করা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল উটের ন্যায় তোমাদের আয়ত্তে আনা যায় না। তোমরা সকলেই জান, আমি আল্লাহ্ অপেক্ষা কাউকেই প্রিয় জানি না। রসুল ব্যতীত কারো অনুসরণ করি না। সৎপথ ব্যতীত চলি না। অসত্যের সাথে আপস করি না। অথচ তোমরা আমার সাথে না থেকে আজ আমাকে একাকী ছাড়ছো।

এবার আমি কয়েকটি শেষ কথা উচ্চারণ করবো ঃ—

১। হে মুসলমানগণ, তোমরা সকলেই রসুলের বংশধরদের প্রতি সুনজর রেখো।

২। রসুলের বংশধর তোমাদের বিপদগামী করবে না।

৩। তারা যদি নীরবতা ও নির্জনতা অবলম্বন করে, তোমরাও করতে পারো।

৪। তারা যদি ময়দানে নামে, তোমরা সঙ্গে থেকো।

৫। তাদের আগে পা বাড়িও না, তাহলে পথভ্রষ্ট হবে।

৬। তাদের পেছনেও পড়ে থেকো না, তাহলে ধ্বংস হবে।

৭। তোমরা দু'দিনের দুনিয়ার লোভে পড়ে দ্বীনকে ত্যাগ করো না। তোমার দ্বীনই তোমাকে তোমার মহাদুর্দিনে রক্ষা করবে।"

হযরত আলীর এই অমূল্য ভাষণ কুফাবাসীদের অন্তরে কোন রেখাপাত করতে পারল না। বরং তাদের মনোভাব, চঞ্চলতা, অদূরদর্শিতা, অনীহা প্রভৃতি খলিফাকে দিনের পর দিন মনের দিক থেকে হতোদ্যম ও হতাশ করে তুলেছিল। অথচ অন্যদিকে মুয়াবিয়া দিন দিন নতুন সাজে নব উদ্যমে নব নব পদক্ষেপ রাখছিলেন। জিজ্ঞাসা — কেন এমন হলো। মূলত তিনটি কারণ লক্ষ্য করছি—

১। হযরত আলী যা আশা করছিলেন, সেই অগ্নিযুগের ইমানের (বিশ্বাসের)

উত্তাপ আর ছিল না। সততার প্রতি, সত্যের প্রতি সেই অনুরাগ আর ছিল না। মহানবীর প্রত্যক্ষ প্রভাব হতে দেশবাসী বহু দূরে সরে এসেছিল। মহান সাধক ও সাহাবীগণের প্রায়ই পরলোকগমন করেছিলেন। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অতি বার্ধক্যবশত প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। এঁদেরও অধিকাংশই আবার তখনও মদীনাতে জীবনের শেষদিনগুলো গুনছিলেন। হযরত ওসমানের খেলাফতের শেষার্ধে সকল সাহাবীই খেলাফতের অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে সকল কিছু থেকেই একেবারেই নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের পবিত্র খেলাফত সত্যিকারে এখানেই প্রাণহীন হয়েছিল। পরে কিছুদিনের মধ্যে বিশাল প্রাণহীন মহীরুহটি (খেলাফত) শিকড় সমেত চিরদিনের জন্য ঝরে পড়ে গেল। যেখানে মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও আরো কয়েকজন মরুঝড় ও ঝঞ্ঝাবায়ুর কাজ করল প্রথম প্রাণহীন করতে, পরে তাকে উপড়ে ফেলে দিতে।

২। দ্বিতীয়, কুফাবাসীদের চরিত্র বড়ই চঞ্চল ও দুর্বল ছিল।

৩। তৃতীয়, তখন প্রয়োজন ছিল অগাধ ধনসম্পদের। সৈনিকদের দু'হাতে ধন বিতরণ করতে পারলে অনেকটা কাজ হয়তো হতো, যেমনটি মুয়াবিয়া করেছিলেন। মুয়াবিয়া হযরত ওসমানের সময় হতেই ধনকুবের হয়ে বসেছিলেন। অধিকন্তু পদচ্যুত আমিরগণ সেই ধনভাণ্ডারকে পাহাড় থেকে পর্বতে পরিণত করেন। কিন্তু আলীর হাতে কিছুই ছিল না, এবং তিনি এ কাজ পছন্দও করতেন না। কুফাবাসীদের ইমানের কোন জোর ছিল না। আবার খলিফার পয়সারও জোর ছিল না। জোর থাকলেও খলিফা বাইতুল মালের অর্থাৎ সাধারণের পয়সা অন্যায়ভাবে কাউকেই দিতেন না।সুতরাং কুফাবাসীগণ কুপমন্ডুকের ন্যায় বসেগেল।

চরম অনুশোচনার সাথে দ্রুত পতনের পথে আমরা লক্ষ্য করলাম ও করব। পরিস্থিতি পরিবেশ ও ভাগ্য হযরত আলীর সহায় হলো না, অনুকূলে গেল না।

মিশর পতনের সকরুণ ইতিহাস (৬৬০ খ্রীঃ) ঃ

কিভাবে হযরত আলী কোন পরিস্থিতিতে মিশর হারালেন, কিভাবে আমির মুয়াবিয়া কোন পথে মিশর লাভ করলেন, সেই মর্মান্তিক ঘটনার লোমহর্ষক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ —

হযরত আলী খেলাফত গ্রহণ করার পর অত্যন্ত উপযুক্ত মানুষ কায়েস ইবনে সায়াদকে মিশরের মত জটিল স্থানে গভর্নর নিযুক্ত করে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। হযরত আলী তাঁর সমগ্র জীবনে যা কিছুই করতেন খোলা মনে খোলা প্রাণে। এবং আমির মুয়াবিয়া এক গ্লাস পানিও জীবনে পান করতেন না ছলনা ব্যতীত।

মুয়াবিয়া স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন — যে কোন প্রকারেই হোক মিশর দখল করতে হবে। এই পথে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কূটনীতি শিরমণি, চক্রান্তের চূড়ামণি আমরের সাথে বসলেন। ঠিক হলো পর পর তিনটি পথ — প্রথম লোভ ও প্রলোভনের পালা, দ্বিতীয় ভয় ও ভীতির পালা, তৃতীয় কূটপথ ও ষড়যন্ত্রের পালা। মুয়াবিয়া জানতেন হযরত আলীকে ঠাণ্ডা করতে হলে প্রথম মিশরকে পেতেই হবে। এবং মিশরকে পেতে হলে সেখানকার গভর্নর অসাধারণ মানুষ কায়েসকে পেতেই হবে, নতুবা তাঁকে ওখান থেকে সরাতেই হবে।

প্রথম পদক্ষেপ — মুয়াবিয়া মিশরের গভর্নর কায়েসকে একটি পত্র লিখলেন বেশ গুছিয়ে। পত্রে যত রকমের লোভ-প্রলোভন পদ-পদবি সবই ছিল। শুধু একটি মাত্র দাবি ছিল – "তুমি আমাকে হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সাহায্য করো।" কায়েস উত্তরে জানালেন – "হযরত আলী অতি উচ্চস্তরের মানুষ ও মুসলমান এবং খলিফা। ওসমান হত্যার ন্যায়বিচার তিনিই করবেন, তাঁকে সাহায্য না করে তাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করা চূড়ান্ত মুনাফেকি বা নির্জলা প্রতারণা। মুনাফেক মুশরেক অপেক্ষাও হীন।"

দ্বিতীয় পদক্ষেপ — এবার হুমকির পালা এলো। মুয়াবিয়া লিখলেন – "কায়েস, আমি তোমাকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। তুমি তা গ্রহণ করো। অন্যথায় বিপদে পড়বে। আমার সেনাদলের কথা নিশ্চয় তোমার জানা আছে।" এবার উত্তরে কায়েস বললেন —"মুয়াবিযা, তুমি আমাকে তোমার সেনাদলের ভয় দেখিয়ে খুবই বোকামির পরিচয় দিয়েছ। মনে রেখো, আমার সাথে লড়তে এসে যদি প্রাণটি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারো, তাহলে নিজেকে চরম ভাগ্যবান মনে করো। তুমি কি আশা করো যে, আমি হযরত আলীর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ খলিফা ও রসুলের জামাতা, সারা দুনিয়ার মান্য ব্যক্তিকে ত্যাগ করে তোমার মত এক পথভ্রষ্টকে অনুসরণ করবো।"

তৃতীয় পদক্ষেপ – লোভ-প্রলোভন, ভয়-ভীতি সবকিছুই যখন ব্যর্থ হলো, তখন মুয়াবিয়া গোপন ষড়যন্ত্র, ছল ও চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। মিশরে কিছু মানুষ তখনও হযরত আলীর হাতে বয়াত করেনি। কায়েস সময়ের অপেক্ষায় তাদের ওপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টিও করেননি। খলিফার কোন কোন পরামর্শদাতা কায়েসকে চাপ সৃষ্টির জন্য চাপ দেন, কিন্তু কায়েস পরিস্থিতি বিবেচনা করে তা অগ্রাহ্য করেন। এতে কেউ কেউ খলিফাকে পরামর্শ দেন কায়েসকে পদচ্যুত করতে। কিন্তু খলিফা তা অগ্রাহ্য করেন। সুচতুর আমির মুয়াবিয়া বুঝতে পারলেন খলিফার দরবারেও কায়েসের কিছু বিরোধী আছেন। তিনি এবার এটাকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার মুয়াবিয়া আমরকে দিয়ে একটি পত্র তৈরি করলেন। পত্রটি যেন কায়েস মুয়াবিয়াকে লিখছেন তিনি আর হযরত আলীর সাথে থাকতে চান না। মুয়াবিয়াকে খলিফা রূপে পেতে চান ইত্যাদি। পত্রটিকে সুকৌশলে হযরত আলীর হাতে পৌঁছিয়ে দিলে, আলীর ঐ কায়েস-বিরোধী পরামর্শদাতাগণ তখন সজোরে কায়েসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখলেন। খলিফা আলীর মত মানুষও যেন আর চিন্তা করার কোন অবকাশ পেলেন না। মানব সমাজে মানুষের জীবনে কয়েকটি দুর্বল স্থান আছে, যেখানে অতি সহজেই হঠকারিতা ঘটেই থাকে, যেমন— যুবক স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ সহজেই স্থান পায়, আর রাজচরিত্র। কে কখন সিংহাসন কেড়ে নেয়। এই সন্দেহজনক প্রবণতা ও মনের স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং সন্দেহসূচক মানসিকতা অনেক সময় রাজা-বাদশাদের অনেক মারাত্মক সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে দেয়। খলিফা হারুনের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ খলিফা ও আপন ভগিনী রাজনন্দিনী আব্বাসা ও আপন প্রধানমন্ত্রী, দুধ ভাই, সারা জীবনের একান্ত অকৃত্রিম বন্ধু জাফরের মধ্যে পরিণয় সূত্রের সন্দেহপ্রবণতায় সমগ্র বার্মেকী পরিবারটিকে জগতের বুক হতে একেবারেই সরিয়ে দিলেন। হযরত আলী পরার্মশদাতাগণের কথানুযায়ী অতুলনীয় যোগ্য ব্যক্তি কায়েসকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে মহম্মদ বিন আবুবকরকে গভর্নর নিযুক্ত করে (মুয়াবিয়ার আশাকে পূর্ণ করে) আপন সর্বনাশ ডেকে আনলেন।

কায়েস মদীনাতে ঃ

মহম্মদ মিশরে হাজির হয়ে খলিফার পত্র কায়েসকে দেখানো মাত্র তিনি কোন রূপ আপত্তি না জানিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আর কালবিলম্ব না করেই মদীনা গমন করলেন। তখনও মদীনার আবহাওয়া শান্ত ছিল না। অশান্ত আবহাওয়ায় কায়েস অস্বস্তিকর পরিবেশে দিন কাটাতে থাকলেন। এ সংবাদ মুয়াবিয়ার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন। কপট সর্দার বন্ধু আমরকে জানালেন— তাঁর বদ প্রতিভাপ্রসূত পরিকল্পনা কাজে লেগেছে, কায়েস পদচ্যুত। অতঃপর দু'জনে আবার পরামর্শ করলেন কি করে কায়েসকে দামেস্ক আনা যায়। মহাচতুর মারওয়ানকে এই কাজে মদীনা পাঠান হলো। মারওয়ান আদা জল খেয়ে নেমে পড়লেন কায়েসের পেছনে। বিজ্ঞ কায়াস লক্ষ্য করলেন— এরা পারে না এমন কাজ নেই, প্রয়োজনে অবলীলায় হত্যাও করবে। তাই তিনি গোপনে মদীনা ত্যাগ করে কুফাতে হাজির হলেন। একথা যখন মুয়াবিয়ার কর্ণকুহরে পৌছল, তিনি বলে উঠলেন — এ অপেক্ষা এক লক্ষ সৈনিকের মৃত্যু সংবাদ এলেও ভাল হতো।

হযরত আলীর সাথে কায়েসের সমস্ত কথা হলো। এখন খলিফা বুঝতে পারলেন সত্যাসত্য। সঙ্গে সঙ্গে মর্মপীড়ার কোন সীমা থাকল না। পরামর্শদাতারা যাই বলুন, হযরত আলীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কায়েসের মত অসাধারণ ব্যক্তির বরখাস্ত খলিফার হঠকারিতারই নামান্তর মাত্র। যাই হোক খলিফা কায়েসকেই তাঁর মূল পরামর্শদাতা নিযুক্ত করে নিজ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে যোগ্য মানুষকে যোগ্য সম্মান দান করলেন। ভুল মানুষের চিরসঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষের চিরসাথী। সংশোধনটাই বড় কথা।

মহম্মদ বিন আবুবকর ও খণ্ডযুদ্ধ ঃ

মহম্মদ মিশরের দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যারা তখনও খলিফার হাতে বয়াত করতে ইতস্তত করছিল, তিনি তাদের ওপর জোর চাপ সৃষ্টি করাতে তারা একেবারেই বেঁকে বসল। কি সর্বনাশ। এদিকে সির্ফ্ফিনের যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠেছে। খলিফা মহম্মদকে মিশর হতে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। তখনও খলিফা জানেন না, অনভিজ্ঞ মহম্মদ মিশরে কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। সিফ্ফিনের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই মহম্মদ মিশরে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেছে। বারবার খণ্ডযুদ্ধ চলল। কোন বারেই মহম্মদ জয়ী হলেন না। অধিকন্তু খলিফার নির্দেশমত সিফ্ফিনের যুদ্ধে মিশর হতে কোন সৈন্যও পাঠাতে পারলেন না।

আমির মুয়াবিয়া ও মুয়াবিয়া ইবনে খদিজ ঃ

আমিব মুয়াবিযা হযরত আলীর বিরুদ্ধে মিশরে একটি শক্ত ঘাঁটি তৈরি করার জন্য মুয়াবিয়া ইবনে খদিজ নামক জনৈক দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে বহু সহস্র দীনার উপহার দিলেন। এই মুয়াবিয়া ছিল আমরের বন্ধু। আমরের মাধ্যমে এটি ঘটল। বিজ্ঞ কায়েস এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য অতি ধীর পদক্ষেপ রাখছিলেন। সকলকে বন্ধুভাবাপন্ন করার চেষ্টাও করছিলেন। যখন খলিফার কর্ণগোচর হলো মহম্মদের অবস্থা অতি শোচনীয়, তখনই তিনি বুঝতে পারলেন কায়েসকে বরখাস্ত করাটা কত বড় ভুল হয়েছে।

সেনাপতি মালিক আশতার খুন ঃ

খলিফা মর্মে মর্মে দারুণ অনুশোচনা ভোগ করে অবশেষে এর সঠিক প্রতিবিধানার্থে মিশরে স্বয়ং মালিক আশতারকেই গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং মালিক যথাসময়ে মিশরের পথে যাত্রা করলেন। মুয়াবিয়ার গুপ্তচরবৃন্দ একথা সময়মতই মুয়াবিয়ার দরবারে হাজির করে দিলে মুয়াবিয়া প্রথমত প্রমাদ গুনলেও বন্ধু আমরের পরামর্শে প্রাণে পরক্ষণেই শান্তি পেলেন। স্থির হলো— মালিককে মিশরের মাটিতে পা দিতেই দেওয়া হবে না। পথিমধ্যেই তার প্রাণনাশ করা হবে। সেনাপতি আশতার যখন পথিমধ্যে এক কৃষকের বাড়িতে রাত্রির মত আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন মুয়াবিয়ার দলবল সেখানে হাজির। প্রথমত

কৃষকে বহু স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আশতারকে বিষ প্রয়োগে প্ররোচিত করে। কৃষক কোনক্রমেই গোপন ষড়যন্ত্রে অতিথির প্রাণনাশে সম্মত না হলে অতীব অতর্কিতে আশতারের মত এক মহান বীরকে বধ করা হলো।

অন্যায় ষড়যন্ত্র গোপন আঘাত
একটি মহান বীরে করিল নিপাত।

শেষের করুণ কাহিনী ঃ

দুনিয়ার বুক হতে মহাবীর আশতারকে বিদায় দিয়ে মুয়াবিয়া, আমর ও মিশরের ইবনে খদিজের আনন্দের কোন সীমা নেই। এই ভয়াবহ সংবাদ যখন খলিফার নিকট পৌছাল, তখন তিনি নির্বাক। এহেন পাষণ্ডগিরি কাজ ওরা করতে পারবে, খলিফা তা ধারণাও কবতে পারেননি। অথচ তিনি জীবনে শতবার শত সুযোগ পেয়েছিলেন ঐ পশুমানব ছাগলগুলোকে শেষ করার জন্য কিন্তু রণরাজ সিংহের ধর্ম তা নয়। তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছিলেন কেবল মাত্র বীরের ধর্ম ত্যাগ কবতে পারেননি। তাই মহান আলী, মহাবীর আশতারের বিদেহী অমর আত্মা আজও বীরের সম্মান পাচ্ছে। মর্মাহিত মিশরের তদানীন্তন গভর্নর মহম্মদকে পত্রে জানালেন— "তুমিই এখন ওখানে গভর্নর থাক। আল্লাহর ওপর নির্ভর করে সাহসের সাথে, বুদ্ধিব সাথে আপন কর্তব্য পালন কর।"

এদিকে মুয়াবিয়া আমরের সাথে কুটিল ও জটিল সব রকমের পরার্মশ সমাধা করেই মিশরেব মুয়াবিয়া ইবনে খদিজকে বার্তা পাঠালেন— "মহম্মদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ কর। বিখ্যাত আমর ইবনুল আস বিশাল বাহিনীসহ তোমার সাহায্যার্থে মিশর যাত্রা কবেছে। মহম্মদ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে মুয়াবিয়ার সাথে পরাজয় বরণ করেছে। মহম্মদ যখন এই অবস্থায় তখনই জানতে পারলেন আমর ইবনুল আসের আগমন কথা। সঙ্গে সঙ্গে কেনানা ইবনে বশিরকে মাত্র দু'হাজার সৈন-সহ আমরের গতি রোধ করতে পাঠালেন। পথিমধ্যে সংঘর্ষ বাধল। আমবের সুদক্ষ ছ'হাজার সিবয়ান সেনা কেনানাকে সদলবলে নিহত করলো।

অপরিণামদর্শী মহম্মদের কথা বা পত্র আবার চিন্তিত খলিফার নিকট পৌঁছালে খলিফা খুবই হতাশার সাথে মালেক ইবনে কাবের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেইমান কুফাবাসীগণ আজ মহাদুর্দিনে তাঁকে মদত না দিয়ে পিছিয়ে গেলো, বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিল। খলিফা একদিন তাদের ঠিকই ভর্ৎসনা করেছিলেন — তোমরা একদিন আবু তালিবের পুত্রটিকে শত্রুর মাঝে একাকী ছেড়ে পালাবে। অথচ তোমরাই আমাকে কথা দিয়ে মদীনা থেকে এনেছিলে। অবশেষে খলিফা মাত্র দু'হাজার সাধারণ সেনাকে মালেকের নেতৃত্বে পাঠালেন। কিন্তু খলিফার উদ্বেগের কোন সীমা থাকলো না। তিনি যেন বুঝতে পারলেন— কোন এক মরুঝড় মিশরকে শেষ করে দিল। তিনি যেন তাঁর দিব্য

চোখে দেখতে পেলেন— মহম্মদের অদূরদর্শিতা কুফাবাসীদের উদাসীনতা বনাম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কোন পর্যায়ে আজ নিয়ে গেল।

খলিফার প্রেরিত সামান্য সেনা-সহ মালেক ইবনে কাবের মিশর পৌঁছাবার পূর্বেই মিশরের মাটি খলিফার হস্তচ্যুত হয়ে গেল। বিদ্রোহী মুয়াবিয়ার সাথে মহম্মদ এমনভাবে বারবার নাকানি-চুবানি খাচ্ছিলেন। এরপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া দেখা দিল। আমরের দামেস্ক হতে মিশরের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুয়াবিয়ার শক্তি আরো শত গুণে বেড়ে গেল। তাঁকে আর অদূরদর্শী মহম্মদের সাথে যুদ্ধ করতেই হলো না। সরাসরি মহম্মদকে অবরুদ্ধ করলেন। তার রাজপ্রাসাদ বন্দীগারে পরিণত হলো। মহম্মদকে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনী একটি গাধার পিঠে চাপিয়ে শহর পরিক্রম করালো, অতঃপর অতি লাঞ্ছনার সাথেই মুয়াবিয়ার নিকট হাজির করলে মুয়াবিয়া মহানবীর চির ছায়া ইসলামের প্রথম খলিফা ও ত্রাণকারী হযরত আবুবকরের পুত্রকে ও বিবি আয়েশার আপন ভাইকে যে নৃশংস ও অমানবিকভাবে হত্যা করলো, তা ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। মহানবীর সাহাবা হয়ে যাঁরা এইভাবে মহানবীর সমকালীন মাসুম বাচ্চাগুলোকে হত্যা করেন, তাঁরা কোন্ মুখে সাহাবীর মর্যাদা আশা করেন। ঐ অমানুষিক পথে মহম্মদকে হত্যা করার পর তাঁর প্রাণহীন দেহটিকে আর এক সাহাবী আমরের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হলে তিনি অতি উল্লাসভরে অনেক অকথ্য কথা উচ্চারণ করেই নির্দেশ দিলেন মৃতদেহটিকে অশ্বের চামড়ায় আবৃত করে পুড়িয়ে দিতে। আদেশ কার্যকরী হলো। একজন সাহাবী হয়ে একজন মরা মানুষকে যদি এইভাবে দাহ করতে পারেন, তিনি কতটা ইসলামপন্থী ! তিনি কি সমগ্র মুসলিম হতে মনুষ্য সমাজের চির কলঙ্ক নন। তিনি কি মহানবীর সমরনীতি জানতেন না ! কিসের সাহাবী !

তুমি যে বীরসঙ্গী , শ্রেষ্ঠ মুসলমান
নিজ হাতে নাহি কর, নিজ অপমান '

মর্মাহত মানুষ আলী ঃ

মিশরের বুকে এই অমানুষিক ঘটনার কথা যখন মানবতার দূত, মানুষ্যত্বের পূজারী হযরত আলীর নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি মিশর পতনের জন্য যতখানি মর্মাহত হলেন, মানবতাব পতনের জন্য তা অপেক্ষা শতগুণে মর্মাহত হলেন। মহম্মদের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তিনি যতখানি বেদনাহত হলেন, মনুষ্যত্বের সকরুণ মৃত্যুর জন্য তা অপেক্ষাও সহস্র গুণে বেদনাহত হলেন। প্রেরিত মালেককে কুফা ফিরে আসতে নির্দেশ পাঠালেন। তখনও মালেক পথিমধ্যে।

পথিমধ্যে মালেক হোজাজের নিকট মিশরের ঐ লোমহর্ষক ঘটনা শ্রবণ করেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যে খলিফার দূত পৌঁছলে আবার কুফা মুখে প্রত্যাবর্তন করেন। মহম্মদের অদূরদর্শিতায়, মুয়াবিয়ার প্রতারণায়,

আমরের প্রবঞ্চনায়, কুফাবাসীদের বালখিল্যতায় মিশরের মাটিতে ইসলামের পবিত্র খেলাফতের রবি প্রথম অস্তমিত হলো।

বসরার অশান্তি (৬৬০ খ্রীঃ) ঃ

মিশর পতনের পর মুয়াবিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে দেশের সর্বত্র অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য হযরত আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচারের নিমিত্ত বহু বেতনভূক কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তাদের কাজ ছিল খলিফার বিরুদ্ধে এবং মুয়াবিয়ার পক্ষে দেশে-দেশে গ্রামে-গঞ্জে নানা প্রকার মিথ্যা রটনা করা। শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করা, বিচলিত খলিফাকে আরো বিব্রত করা। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সারা দেশজুড়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মুয়াবিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে আপন বিবেকেরই প্রাণদন্ড যোগে যে ছল-চাতুরীর আশ্রয়ে হযরত আলী বনাম ইসলামের খেলাফতেরই প্রাণ নিলেন, তা কোরআনের দৃষ্টিতে কুফরী ব্যতীত কি ! পবিত্র কোরআন তো তাঁর হাতে জুয়া খেলার তাস ও ছেলেমেয়েদের তামাসায় পরিণত হয়েছিল সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে।

আমির মুয়াবিয়া যখন ঐভাবে নানা অপকাজে ব্যস্ত, খলিফা আলী তখন ঘরে বাইরে শত্রু নিয়ে ব্যস্ত। ঘরে খারেজীগণ ও অপদার্থ কুফীগণ এবং বাইরে মহা চক্রান্তের শিবমণি মুয়াবিয়া। মিশর পতনের পর তাঁর মানসিক অবস্থা এরূপ হলো যে তিনি আর কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতেও ভালবাসতেন না। লোকচক্ষুর অন্তরালে আবার সেই আপন সাধকজীবনে যেন ফিরে যাচ্ছিলেন। খলিফার এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে বসরার গভর্নর তাঁর একান্ত আপনজন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস খলিফার নিকট কুফাতে গমন করে খলিফার মনের দিকটা শান্ত করার ও সামলাবার চেষ্টা করতে থাকলেন। এদিকে আমির মুয়াবিয়া শকুনের মত সদাই দৃষ্টি রেখেছিলেন কোথায় কি হচ্ছে।

মুয়াবিয়া যখনই জানতে পারলেন বসরার ময়দান শূন্য। সঙ্গে সঙ্গে খালি মাঠে গোল দেওয়ার জন্য কতিপয় বেতনভূককে তথায় পাঠালেন। তাঁরা সেখানে বনি তামিম গোত্রের সাথে বহু টাকার বিনিময়ে এক চুক্তিতে তাঁদের দল সেখানকার অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জিয়াদ বিন সামিয়াকে অবরুদ্ধ করলেন। জিয়াদ প্রাণভয়ে রাষ্ট্রীয় মিম্বরখানি সঙ্গে নিয়ে অন্য গোত্রে আত্মগোপন করলেন। বাইতুল মাল চলে গেল বিরোধীদের হাতে, এটা তাঁর আত্মসমর্পণেরই নামান্তর ছিল। জিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা খলিফার কর্ণগোচরে আনলে, খলিফা কালবিলম্ব না করেই ইবনে জারিয়াকে বসরা প্রেরণ করেন। হতভাগ্য জারিয়া সেখানে অকালে প্রাণ হারালে খলিফা তৎক্ষণাৎ ইবনে কোদামা তামিমিকে বসরা পাঠালে ইবনে কোদামা মুয়াবিয়ার চর আব্দুল্লাহ ইবনে হাজরামিকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করলো গর দলবল-সহ এক অবরুদ্ধ দুর্গে। মুয়াবিয়ার অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো, বসরাতে শান্তি ফিরে এলো।

পারস্য ও কেরমানের অশান্তি ঃ

একের পর এক মুয়াবিয়া অশান্তির আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছেনমনের অনাবিল শান্তিতে এবং খলিফা আলী নানা ঝুটঝামেলার মধ্যে ঐ অশান্তির আগুনগুলোকে একের পর এক নিভিয়ে যাচ্ছেন।এবার পারস্য ও কেরমানে আগুন জ্বলে উঠল। মুয়াবিয়া তাঁর একদল অনুচরকে পাঠালেন সেখানকার দলপতিগুলোকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে হাত করার জন্য। অনুচরবৃন্দ আপন কাজে সফল হলে সকলকে একত্রিত করে একদিন খলিফার গভর্নর সহিল ইবনে হানিফকে পারস্য হতেই বিতাড়িত করে। পারস্যে একজন শক্ত মানুষের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু খলিফার শক্ত মানুষগুলো একের পর এক মুয়াবিয়ার গুপ্তচর কর্তৃক ইহলোক ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ প্রয়োজন ছিল মহাবীর মালেক আশতারের মত একজন মানুষের। কিন্তু মিশরের পথে তিনিও প্রাণ হারান মুয়াবিয়ার গোপন আঘাতে।

খলিফা অতি সত্বর তাঁর উপদেশমণ্ডলীর সভা আহ্বান করলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস খলিফাকে পরামর্শ দিলেন জিয়াদ বিন সামিয়াকে পারস্যের গভর্নর করে পাঠানো হোক। জারিয়া ইবনে কোদামাও এই প্রস্তাব সমর্থন করলে খলিফা তাঁকে পারস্যের গভর্নর করে পাঠান। জিয়াদ একদল সুশিক্ষিত সেনা-সহ পারস্যের মাটিতে পা দেওযার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে বেধে গেলে জিয়াদের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের একেবারেই পরাস্ত করে সকলকে বন্দী করে প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিলে তারা খলিফার নিকট প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করলেখলিফা সেনাপতি জিয়াদকে নির্দেশ দেন একটু সহানুভূতির সাথে বিচার করতে। তারা খলিফার হস্তক্ষেপে প্রাণে রক্ষা পেয়ে কৃতজ্ঞতাবশত নিজেরাই শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিলে পারস্যে শান্তি ফিরে আসে।

হেজাজের অশান্তি, মদীনার বুকে নরপশুর নৃত্য ঃ

মুয়াবিয়ার জন্মগত প্রকৃতি তাঁকে কালা, বোবা ও অন্ধ করেছিল, এবং তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি তাঁকে দেশজুড়ে অশান্তির অনন্ত আগুন জ্বালাতে জুগিয়েছিল অফুরন্ত শক্তি। তাই তিনি কোথাও প্রদমিত, প্রশমিত হতেন না। বসরা-পারস্য-কেরামান প্রভৃতি স্থানে বারবার চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েও মুয়াবিয়া অশান্তির হাল ছাড়লেন না। এবার হেজাজ-মক্কা-মদীনার পালা। এগুলো ছিল অতর্কিতে হত্যা ও লুটতরাজ মাত্র। যা করে থাকে সাধারণত দস্যু ও খুনীর দল। যারা মানুষের চামড়া পরে কালা, বোবা ও অন্ধ ও পশু মানব।

অতঃপর মুয়াবিয়া তাঁর এক সুযোগ্য শিষ্য নোমান ইবনে বশিরকে তিন হাজার সৈন্য-সহ আইনুত তামারের দিকে প্রেরণ করলে নোমান বিনা বাধায় সেখানে কয়েকমাস ধরে লুঠতরাজ, খুনখারাবি করে বহু ধনসম্পদ-সহ দামেস্কে ফিরে এলো। চারিদিকে বিরোধ-বিদ্রোহ-অশান্তি-অন্যায় খলিফাকে যেন একেবারেই হতমান করে তুলল তাঁর চিন্তাজগতে। তিনি অন্যায়কে রুখে দিতেও কোথাও অন্যায়ের আশ্রয় দিচ্ছেন না, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র।

মুয়াবিয়া দু'হাতে প্রচুর ধনসম্পদ পেয়ে এবার সুফিয়ান নামক জনৈক প্রখ্যাত ধড়িবাজকে মাদায়েন আক্রমণ ও লুণ্ঠনে পাঠালেন। মহানবীর ঠিক পূর্বে আরবে এই সবই ছিল সিদ্ধপ্রথা, যা আজ মুয়াবিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খলিফা এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই এগিয়ে গেলেন। সুফিয়ান তখন ধূর্ত শৃগালের ন্যায় দ্রুত গা-ঢাকার পথে। এ যাত্রায় মাদায়েন মুয়াবিয়ার লুটেরাবাহিনীহতে কোন রকমে রক্ষা পেল।

মুয়াবিয়া নিরস্ত হওয়ার মানুষ নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বসর ইবনে আরতাতকে কয়েক হাজার সৈন্য-সহ স্বয়ং হেজাজ-মক্কা-মদীনা লুট করতে পাঠালেন। তখন সেখানকার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। তিনি তখন খলিফার দরবারে কুফাতে। মুয়াবিয়া এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না। বসর মক্কা ও মদীনাব মধ্যে প্রবল সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলো। বাইতুল মাল হতে বহু ধনরত্নও সংগ্রহ করলো। অতঃপর মদীনাবাসী সকলকে মহানবীর নিজ হাতে গড়া মসজিদে নববীতে আহ্বান করলো। দুরাত্মা দুরাচার নবীজীর মিম্বরেও দাঁড়িয়ে পড়ল, আরম্ভ করলো ভীষণ তর্জন-গর্জন। সাধারণ মানুষ ভয়ে সব একেবারেই জড়োসড়ো। হুকুম দিল —"সকলেই মুয়াবিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। নতুবা আমার এই মুক্ত তরবারি তোমাদের মীমাংসা করে দেবে এখনই।" সমস্ত মানুষ কম্পিত হৃদয়ে দুরু দুরু বুকে দু'হাত ওপরের দিকে তুলে জানিয়ে দিলো 'আনুগত্য', এবং এক কণ্ঠে সকলেই যেন নীরবে বলে উঠলো – "হে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলের দুষমন, এ অবস্থায় তোর মুয়াবিয়ার প্রতি কেন, তোর কুকুরের প্রতিও আনুগত্য থাকবে।"

পশুমানব বস্‌রের পিপাসা এখানেও মিটলো না। তিনি গভর্নরের প্রাসাদে গমন করে দেখলেন গভর্নর নেই, এমনকি তাঁর বেগমও তখন প্রাসাদের বাইরে অন্য কাজে বেরিয়েছেন। ভিতরে কেবল মাত্র কর্মচারীবৃন্দ ও দাসদাসী এবং পরিচারিকা ও গভর্নরের দুই শিশুপুত্র মাত্র। জন্তুমানব বসর ঐ প্রাসাদের সকলকেই একেব পর এক হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই চলতে

থাকল বধযজ্ঞ, নিধনযজ্ঞ, হত্যার তাণ্ডবলীলা। সকলেই ক্ষমা চাইলো, প্রাণভিক্ষা চাইলো। সবকিছুই ব্যর্থ হলো। পশুমানবের পশুর ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হলো। রাজপুরী শ্মশানপুরীতে পরিণত হলো।

অমানবিক ঘটনার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত – কালা-বোবা-অন্ধ বসর ঃ

অতঃপর বসর গভর্নর ওবায়দুল্লার কেউ কোথায় এই রাজপ্রাসাদে আছে কিনা সরাসরি তদন্ত করতে আরম্ভ করলো। পরিশেষে প্রাসাদের মধ্যে সিঁড়ির নিচে এক অন্ধাকারময় স্থানে এক পরিচারিকা একাকী অতি ভয়ে মলিন মুখে মৃত্যুর সাক্ষাৎ যম বসরের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করেছিল। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঐ পরিচারিকা গভর্নরের দুই নাবালক শিশুপুত্রকে দেখাশোনা করতো। সে রাজপ্রাসাদের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করে মৃতপ্রায় অবস্থায় ঐ শিশুপুত্র দুটোকে নোংরা ছেড়া কাপড়ে ঢেকে তারই পাশে দণ্ডায়মান ছিল। যখন সে কশাই বসরের দৃষ্টিতে পড়লো, তখন প্রায় বাক্হীন. জ্ঞানহীন মুমূর্ষু এক অসহায়া নারী। সে চেষ্টা করতে পারত অন্যদিকে পালিয়ে যেতে, কিন্তু ঐ দুই শিশু ফেরেস্তা, শিশু দেবতার জন্য তা পারেনি। তার অপরাধ ছিল এখানেই।

সাক্ষাৎ যমের চোখে বিধৃত হলো অসহায়া নারী। আরম্ভ হলো অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন। আকুল ভাবে কেঁদে উঠলো এক অসহায়া নারী। তার ক্রন্দনে শিশু দুটো প্রকাশ পেয়ে গেলো। এবার আরম্ভ হলো মনুষ্য জগতের নজিরবিহীন ঘটনা। পামর বসর জানতে পারলো বাচ্ছা দুটো গভর্নরের। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলো 'হত্যা কর'। সেনাবাহিনী নীরব, পরিচারিকার আকুল ক্রন্দন — ওদের মেরো না, আমাকে মারো। বসরের নির্দেশ — 'হত্যা কর'। নারীর বুকফাটা রোদন — 'ওদের হত্যা করো না, আমাকে কর, ওদের পরিবর্তে আমি আমার জান ও প্রাণ ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা ওদের ছেড়ে দাও। ওরা অতি শিশু, কিছুই বোঝে না, তোমরা নবীর শহর মদীনার সমস্ত মানুষকে হত্যা করো, ওদের হত্যা করো না, ঐ ফেরেস্তাদের গায়ে হাত দিলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে, তোমরা আল্লাহর গজব সহ্য করতে পারবে না, তোমাদের বংশে কেউই থাকবে না।' যখন নরপশুর মন কিছুতেই টললো না, তখন নিরুপায়া নারী শেষ অনুরোধ করলো – 'আমার সামনে ওদের গায়ে হাত দিও না, ওদের হত্যা করো না, আগে আমাকে হত্যা কর, পরে ওদের করো। আমি আল্লাহর নিকট ওদের সঁপে দিয়ে যাবো। এইটুকু সুযোগ তোমরা আমাকে দান করো, বাকি তোমরা সবই করো।' অসহায়া নারীর কোন কথাই নরাধমকে নরম করতে পারলো না। যখন কোন সৈনিকই মায়ের

কোলের ঐ দুই আল্লাহর ফেরেস্তাকে খুন করতে এগিয়ে এলো না, তখন তামাম সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্টতম জীব বসর খতম করতে এগিয়ে এলো। তরবারি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুমূর্ষু পরিচারিকা মৃত্যুর কোলে শুধু একবার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো – 'আল্লাহ্ তুমি জালেমকে ক্ষমা করো না।' তিনটি প্রাণহীন দেহ পড়ে রইল।

নরমেধ যজ্ঞ শেষ করে শান্তির সাথে ফিরে গেল নরমেধ যজ্ঞের প্রধান পাণ্ডা মুয়াবিয়ার খুনী দূত বসর। প্রাসাদে ফিরে এলেন গভর্নর ওবায়দুল্লার বেগম, ঐ দুই হতভাগ্য শিশুর হতভাগিনী জননী। তিনি প্রাসাদে প্রবেশের পর যেভাবে করুণ আর্তনাদে ভেঙে পড়লেন, যেভাবে ব্যাকুল স্বরে বাচ্চাদের ডাকতে লাগলেন, যেভাবে মৃত বাচ্চাদের কোলে তুলে নিলেন, যেভাবে রক্তমাখা শিশুদের চুমু খেলেন, যেভাবে বাচ্চাদের সাথে গড়িয়ে পড়লেন, যেভাবে শিশুদের সাথে জ্ঞানহারা হলেন, যেভাবে পাগলিনীর ন্যায় পথে পথে ঘুরলেন, যেভাবে ঐ খতমের মাতন রচনা করলেন, যেভাবে ঐ খুনীর খবর খোদার আরশে পৌঁছিয়ে দিলেন, যেভাবে জনে জনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমরা আমার বাচ্চা দুটির খবর দাও, তারা কি শুক্তির মাঝে মুক্ত রূপে লুকিয়ে আছে।' বিশ্বে এমন কোন ভাষাই এখনও তৈরি হয়নি, যা ঐ মায়ের মনের ছবিটি তুলে ধরতে পারে। তবুও আরব সাহিত্যে ঐ মায়ের আর্তনাদ ও আহজারি আজও অম্লান।

আজিও কানেতে বাজে শিশুর ক্রন্দন
পুত্রহারা জননীর ব্যাকুল রোদন
'কেউ কি দেখেছ মোর বাচ্চা কারো কাছে
তারা কি শুক্তির মাঝে মুক্ত রূপে আছে।'
বুঝিল না পশু-মানব মায়ের ব্যথা
কোল হতে কেড়ে নিল শিশু-ফেরেস্তা।
মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্রে গুপ্তচরগণ
নিধন কবল কত মানব-রতন।

এই ভয়াবহ সংবাদ হযরত আলীর নিকট পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিকারার্থে তিনি জারিয়া ইবনে কোদামাকে মদীনা পাঠালেন। জারিয়া কয়েক সহস্র সৈন্য-সহ ওখানে হাজির হওয়ার পূর্বেই জীবজগতের সাথেও যার তুলনা করা যায় না সেই নিকৃষ্টতম পদার্থ বসর মদীনা ত্যাগ করে। মদীনাতে আবার শান্তি ফিরে এলো। হযরত আলী ঐ দুটো বাচ্চার কথা শুনে শিশুর মত কেঁদে উঠেছিলেন। এবং ওপরের দিকে হাত তুলে বিচারভিক্ষা করেছিলেন।খলিফার বিচারপ্রার্থনা ব্যর্থ যায়নি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বসর প্রথম কালা হয়, পরে বোবা হয়, তারপর অন্ধ হয়, এবং সুদীর্ঘ দিন ঐ জড়পদার্থের ন্যায় এই জগতেই তার নরকের স্বাদ ও মদীনার ঐ নারকীয় স্মরণ চলতে থাকে। নরাধমের নরক কাকে বলে, নিখিল বিশ্ব দেখুক বিশ্ব-অভিশপ্ত বসরকে।

একাদশ অধ্যায়

শের-ই-খোদার শাহাদত বরণ

খলিফা হযরত আলী খেলাফতে নানা দুর্যোগ, নানা দুর্বিপাক লক্ষ করে বিরক্ত হচ্ছিলেন, বিব্রত হচ্ছিলেন, তবুও কোনদিনই বীরের ধর্ম ত্যাগ কবেননি, বা করার বাসনাও তাঁর মনে জাগেনি। মুয়াবিয়ার অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র ও শয়তানিতে একটি বড় ধরনেব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চল্লিশ হাজার সেনা তাঁর পতাকাতলে একত্রিত হলো খেলাফতকে ষডযন্ত্র ও শয়তানি থেকে রক্ষা করার জন্য।

সিবিয়াব দামেস্কে খলিফার তিনটি বড জাতের শত্রু ছিল— মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও আমর। এর মধ্যে যেটি ধাডিজাতেব, সেটি মুয়াবিয়া। মিশরে ছিল খারেজী দলের আস্তানা। এরাও ছিল খলিফার ঘোর শত্রু। মাদায়েনের নাহরাওয়ানের যুদ্ধে প্রায় সব খারেজীই খতম হয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল মাত্র নয় জন। এদের তিনজন ছিল ধাডি জাতের – আব্দুর রহমান ইবনে মুলজেম মুরারি, আমব ইবনে বকর তামিমি, বকব ইবনে আব্দুল্লাহ তামিমি। শয়তানের ধাডীগুলো ষডযন্ত্রে কেউই কম ছিল না। এই শ্রেণীব মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করলে পাপ কোনদিনই তাব পূর্ণতা লাভ করতে পারতো না। আবার হজবত আলীর মত মানুষ জন্মগ্রহণ না করলে পৃথিবীতে মহামানব ও মহাপুরুষেব ভূমিকা খালি থেকে যেতো। মনুষ্যত্বেব প্রদীপ প্রসার লাভ করতো না, মানবতার শিখা চরম শিখরে উন্নীত হতো না। হযরত আলীতে ঘটেছিল কর্মবীর ও জ্ঞানবীরের মহামিলন।

এখানে আমরা পাচ্ছি তিন গোত্রের তিনটি ইচ্ছা। কুফাতে বসে মহান আলী ইচ্ছা কবছেন ইসলামের খেলাফতকে সুন্দব করতে, দামেস্কে বসে মুয়াবিয়া ইচ্ছা করছেন ইসলামি খেলাফতের ধ্বংস ঘটিযে বংশগত সিংহাসন লাভ করতে, মিশবে খারেজী দলপতিগণ ইচ্ছা করছেন খলিফা আলী ও আমিব মুয়াবিয়া দু'জনকেই হত্যা করে খারেজী মতবাদ স্থাপন কবতে । খারেজীদের মতবাদ ছিল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। এটা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে না। কিন্তু মতবাদটি অতি ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। আল্লাহ্ তো কোনদিন নিজে এসে কোন কাজ করেন না বা করবেন না। নবী রসুল ও মানুষের দ্বারাই সব করান বা করাবেন। এই জন্যই তো কোরআন বলছে – "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।" ২ ঃ ৩০ । সুতরাং হযরত আলী খারেজীদের ঐ মতবাদ কোরআনের বিরুদ্ধ বলে সরাসরি খারিজ করে দিযেছিলেন। এবং মুয়াবিয়া চাচ্ছিলেন খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র। সেটিও তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

সিরিয়ার মাটিতে দামেস্কতে বসে মুয়াবিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করছেন সারা খেলাফতে অশান্তি ও অরাজকতার আগুন জ্বালিয়ে দিতে। তাঁর চেষ্টা ছিল অতি প্রবল, এবং গতি ছিল অতি প্রচন্ড। যেমন করেই হোক হযরত আলীকে খেলাফত ছাড়া, প্রয়োজন হলে দুনিয়া ছাড়া করতেই হবে। এই পথে তাঁর ন্যায়-অন্যায়ের কোন ব্যবধানই ছিল না। এবং খারেজীগণ হেজাজের মাটিতে মক্কাতে বসে পরিকল্পনা নিতে থাকলেন কি করে তিনজনকে অর্থাৎ হযরত আলী, আমির মুয়াবিয়া ও আমরকে বধ করা যায়।

হত্যার শপথ ঃ প্রথম আমর ইবনে বকর শপথ গ্রহণ করে বলল – "আমি মিশরের শাসনকর্তা আমরকে বধ করার দায়িত্ব নিলাম"। বকর ইবনে আব্দুল্লাহ বলল – "আমি আমির মুয়াবিয়ার দায়িত্ব নিলাম"। তৃতীয়জন কে হবে। সকলেই সকলের মুখ দেখতে থাকলো। কে হযরত আলীর হন্তা হবে, মুখে যে যাই বলুক, অন্তরে সবাই ছিল কম্পবান। সকলেরই মনে পড়ছিল নবীজীর ভবিষদ্বাণী। সুতরাং এহেন গুরুভার, গুরুদায়িত্ব কে নেবে। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর মিশরবাসী হতভাগা আব্দুর রহমান ইবনে মুলজেম জগৎকলঙ্কের চিরকালিমাটি আপন কপালে তুলে নিয়ে চির কুখ্যাত গোপনসভার নিস্তব্ধতা ও নীরবতা ভেঙে প্রকম্পিত হৃদয়ে বলে উঠলো – "আমি আলীর দায়িত্ব নিলাম।" সারা বিশ্বের এই ভয়াবহ দুষ্কর্মটি সমাধা করার জন্য দিনক্ষণ ঠিক হলো ১৭ রমজান ফজরের নামাজের পূর্বক্ষণ ভোরবেলা, ৪০ হিজরী, ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ।

সুন্দরী কাত্তান ঃ তিন ভাবী ঘাতক— আমর, বকর ও আব্দুব রহমান মিশর, দামেস্ক ও কুফাতে হাজির হলো। আব্দুর রহমান কুফাতে খাবেজী গোত্রের কট্টরপন্থী এক পরিবারে আশ্রয় নিল। ঐ পরিবারে কাত্তান বিনতে সাজনা নাম্মী এক পরমা সুন্দরী যুবতী ছিল। আব্দুর রহমান ঐ যুবতীর প্রেমে পড়লো। সুন্দরী বুদ্ধিমতীও ছিল, সে বুঝতে পেরেছিল আব্দুর রহমান এখন তাব প্রেমে বা তাকে পাওয়ার জন্য পাগল। এই পাগলটিকে দ্বারা যে কোন কাজ করানো সহজ। সুন্দরী কাত্তান ভালভাবেই জানতো, আব্দুর রহমান যে কাজে নামছে, তাতে ফল যাই-ই হোক, তার মৃত্যু অবধারিত। সে আর সশরীরে কোনদিনই ফিরে আসবে না।

সুন্দরী কাত্তান তাকে বললো – "আমার একটিই মাত্র মোহরানা (বিবাহ যৌতুক)। যদি পারো, তাহলে আমাকে পাবে। আব্দুর রহমান বলল— কি ? সুন্দরী – 'আলী হত্যা'। রহমান – 'আমি তো ঐ জন্য এসেছি। তাহলে তোমার আমার উদ্দেশ্য একই। তোমার সাথে আমার পরিচয় না হলেও আমি ঐ কাজে এগিয়ে যেতাম। এখন তোমার মত এক সুন্দরীকে পাওয়া আমার সৌভাগ্য হয়ে থাকল। আমি আমার ও তোমার উভয়েরই একই লক্ষ্যে স্থির থাকলাম।' সুন্দরী কাত্তান

আব্দুর রহমানের শত অনুনয়বিনয়েও পূর্বেই তাকে কোন দুর্বল মুহূর্তে দেহদান না করেই বুদ্ধির প্রয়োগে প্রেমিককে ভেড়া বানালো। প্রেমিকা সেজে বুদ্ধিমতি নারী প্রেমিকের পরিণতি জানত, তাই দেহদানে বিরত ছিল। রাজচরিত্র ও নারীচরিত্র বোঝা বড়ই কঠিন।

হযরত আলীর অন্তর ঃ এই করুণতম নাটকের দুটো দৃশ্যই আমরা এক অনিমেষ দৃষ্টিতে অবলোকন করছি। একদিকে লক্ষ্য করলাম হত্যার চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে হযরত আলীকে হত্যার। যেখানে যোগ দিয়েছে প্রেম বনাম কাম-রিপু, যে রিপুর নিকট সমস্ত রিপু পরাজিত। রাজনৈতিক জুয়াখেলা তো আছেই, অধিকন্তু গভীর প্রেম ও প্রণয় নারীদেহের কামনা ও বাসনার অন্ধ উত্তেজনা করুণতম ঘটনাটিকে করেছে বেগবান, নিষ্ঠুরতম কাহিনীটিকে করেছে করুণতম। এ হলো হন্তাকারীর প্রথম দৃশ্যের প্রস্তুতি পর্ব। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম পর্বে আমরা দেখবো একটি দুর্লভ মানবচিত্ত, অনাবিল মানব অন্তর, মহামানবের বিশাল হৃদয়, তাসাউফের বিশুদ্ধ জড়, জ্ঞানজগতের আবারিত দরজা হযরত আলীকে।

হযরত আলীর অন্তরটি ছিল আকাশজোড়া, মনটি ছিল দুধে ধোয়া, হৃদয় ছিল অতি নির্মল। তাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর উজ্জ্বল হৃদয় দর্পণে ভাবী কালের বহু কিছু ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় ভেসে উঠতো, মানস চোখে দেখে নিতেন মানুষ কি কবতে চাচ্ছে বা যাচ্ছে। দিব্যজ্ঞান (ইলমে লাদুন্নী) এরই নাম। এই জ্ঞান সম্পর্কে কোরআন বলে – "যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞানশিক্ষা দিয়েছিলাম।" ১৮ ঃ ৬৫।

এমনি প্রহরী তুমি মানব অন্তরে
দিবা নাই রাত্রি নাই তোমার প্রহরে।
দাও মোরে দেখিবারে দিব্য নয়ন
আসমানজমিনজোড়া তোমার আসন।
২ ঃ ২৫৫, ২০ ঃ ১১০

ইবনে সায়াদ ঃ ইবনে সায়াদ বলেন – "হযরত আলী বলতেন, আল্লাহ্র কসম। রসূলে করিম বলতেন – আমার মৃত্যু (হত্যার মাধ্যমে) শাহাদতে।" আব্দুর রহমান ইবনে মুলজেম দু'বার তাঁর নিকট বয়াত হতে গিয়েছিল, তিনি দু'বারই ফিরিয়ে দেন, তৃতীয় বারে সে উপস্থিত হলে আপন দাড়িতে হাত রেখে বলেছিলেন – আল্লাহর কসম, এই জিনিস নিশ্চয়ই রক্তে রঞ্জিত হবে। তখনো পর্যন্ত হন্তাকারী নিজেই জানে না, বা তখনো কোন সিদ্ধান্তই নেয়নি হত্যার। কিন্তু হযরত আলীর হৃদয়দর্পণে ভেসে উঠেছিল ভাবী হন্তাকারী আব্দুর রহমান। যেমন মহানবীর হৃদয়-দর্পণে দূর অতীতে একদিন ভেসে উঠেছিল হযরত আলীর শাহাদত বরণ। হযরত

আলী যখন খুবই বিরক্ত হতেন, তখন বলতেন – "ঐ হতভাগ্যকে কে আসতে বাধা দিচ্ছে, কে আমার হত্যার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। হে আল্লাহ্, আমি ওদের প্রতি বিরক্ত, ওরাও আমা হতে চায় দূরত্ব, এবার আমাকে (ওদের হতে) বিদায় দাও, মহাবন্ধনে মুক্তি দাও, তোমার সাথে মিলতে দাও।"

আমিরুল মোমেনিন হযরত আলীর অন্তিম ক্ষণগুলো ঃ

ঐ মহান আল্লাহর শপথ, যিনি সামান্য বীজ হতে অঙ্কুর এবং সামান্য অঙ্কুর হতে অসামান্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আপন দাড়িতে হাত রেখে বললেন– এটা অবশ্যই রক্তে রঞ্জিত হবে। হতভাগা দেরি করছে কেন ? জনগণ – "আমিরুল মোমেনিন, আপনি আমাদের তার নাম বলুন, আমরা এখনই তার গর্দান নেব। খলিফা – "এমন অবস্থায় কি করে তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে এখনও আমাকে হত্যা করেনি।" জনগণ – "তাহলে আমাদেব জন্য একজন খলিফা ঠিক করে দিন।" "আমি তোমাদের সেই অবস্থাতে ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় রসুলে করিম আমাদের ছেড়ে গেছেন।" জনগণ – "এ অবস্থায় আপনি আল্লাহ্কে কি বলবেন ? খলিফা – "বলবো, হে আল্লাহ্, আমি ওদেব মধ্যে তোমাকে রেখে এসেছি। তুমি ইচ্ছা করলে ওদের সংশোধন কবো, অথবা ধ্বংস করো।"

খলিফার দাসী উম্মে জাফর বলেন – "আমি আমিরুল মোমেনিনের হাত ধুয়ে দিচ্ছিলাম। তখন তিনি শহিদ হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি, আপন দাড়িতে হাত রেখে বলতে লাগলেন – "তোর জন্য দুঃখ, তুই তাড়াতাড়ি রক্তে রঞ্জিত হবি।" এই সময় মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি এসে খলিফাকে বললেন – "আপনি সতর্ক থাকবেন, আপনাকে মুরাদ গোত্রের কোন লোক হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।" খলিফাকে হত্যা করার কথাটি প্রায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম গোত্রের নাম জানা গিয়েছিল, পরে হত্যাকারীর নামও জানা গেল। একদিন আশরাফ নামক এক ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইবনে মুলজেমকে দেখলো সে একটি তরবারি শান দিচ্ছে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো– এখন তো কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই, তুমি তরবারি শান দিচ্ছো কেন ? সে উত্তবে বলল – "একটি উট জবাই করবো।" অতঃপর আশরাফ আর দেরি না করেই কথাটি বা ঘটনাটি খলিফার কর্ণগোচর করলে খলিফা বললেন —"সে তো এখনো আমাকে হত্যা করেনি।" ঠিক এই সময় আব্দুর রহমান একদিন খলিফার মুখোমুখি পড়ে যান। যখন খলিফার মুখ দিয়ে এমন একটি কবিতা চরণ বের হলো, যা মৃত্যুর সাথে খুবই অর্থবহ। ভাবার্থ–

জানে নাকো জীব জীবনের পথে জীবনের পটভূমি
গড়িতেছ মোর চলার পথে পূবের অধ্যায় তুমি।

এই হত্যাকাণ্ডের কথাটি যখন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন মানুষ দু'জনকে দুটো প্রশ্ন করলো। এই সম্পর্কে ঘাতক আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল— যা হবার তা হবেই। খলিফাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেন ওকে হত্যা করছেন না ? খলিফা — যে আমার হত্যাকারী, তাকে আমি কি করে হত্যা করবো ?

শাহাদতের সেই মহা দিন ঃ

১৭ রমজান শুক্রবার, ভোরবেলা ৩৯ হিজরী, ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ। হতভাগা আব্দুর রহমান তার অপর দুই সঙ্গী আশ্য়াস ও শাবীবকে সঙ্গে নিয়ে সারা রাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় মসজিদে অপেক্ষা করতে থাকলে, ঐ দরজার নিকট যে দরজা দিয়ে খলিফা মসজিদে প্রবেশ করতেন।

এদিকে মহান খলিফার মহা জীবনের আজ ছিল শেষ রাত্রি। তিনি যেন আজ কোন অজানা কারণে রাত্রিতে ঘুমাতে পারলেন না। তাঁর চোখের মধ্যে তন্দ্রা ও নিদ্রাব শুধুমাত্র আসা–যাওয়া ছিল, কিন্তু কেউই স্থায়ী হয়নি। মহাজীবনের দীপ নির্বাণলাভে ধীরে ধীরে শেষ মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা চির নিদ্রার জন্য আজকের নিদ্রাও স্থির থাকতে পারলো না। সেও যেন বিচলিত, বিব্রত। অস্পষ্ট তন্দ্রা ও নিদ্রা, অতীতের বহু ঘটনাব অবারিত স্মরণ, এরই মাঝে রাত্রির অবসান প্রায়। পুত্র ইমাম হাসান নিকটে এলে বললেন—

মহানবীর সাক্ষাৎ ঃ "বৎস্য ! আজ রাত্রে আমার এতটুকুও ঘুম হয়নি। মাঝে মাঝে একটু একটু তন্দ্রার মধ্যে ছিলাম। ঐ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আজ তোমার মা-জান ও নানাজানকে দেখলাম। এবং বললাম–ইযা রাসুলুল্লাহ আপনাব উম্মতগণ আমাকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। অতঃপর তিনি বলেলন — "তুমি আল্লাহব নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে মুক্তি দেন।" অতঃপর আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম— "হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ওদের অপেক্ষা উত্তম সঙ্গী দান করো, এবং ওদের আমা অপেক্ষা অধম সঙ্গীর হাতে নিক্ষেপ করো।" হযরত হাসান বলেন— "এই সময় পিতা আবার তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। যখন মোয়াজ্জিন ইবনুল বান্না ডাকাডাকি করছেন, তখন আমি আমার পিতার হাত ধরে জাগিয়ে তুললাম। অতঃপর মোয়াজ্জিন সম্মুখে, আব্বাজান মধ্যে এবং আমি পশ্চাতে থেকে মসজিদাভিমুখে রওনা হলাম। পিতা তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসমত সকলকেই নামাজের জন্য ডাকতে থাকলেন। অন্য এক বর্ণনায়—মোয়াজ্জিন পরপর তিনবার

আসার পর আব্বাজান অতি কষ্টে উঠলেন ও মসজিদের দিকে রওনা হওয়ার পথে যে কবিতাটি আবৃতি করলেন, তার অর্থ—মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। মৃত্যু অবশ্যই তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। সে উপস্থিত হলে, তুমি তাকে ভয় করো না।

লুটিয়ে পড়ে জীবন তরী, জীবননদীর জানে না কেউ
এপার হতে ওপারে নিচ্ছে, কখন সে যে কেমন ঢেউ। ৩১ঃ৩৪

শাহাদতের সেই মহাক্ষণ ঃ

পবিত্র মাস রমজান, পবিত্র দিন শুক্রবার, পবিত্র ক্ষণ ফজর নামাজ, দিনের শুভারম্ভ, তখনও ভোরের অন্ধকার বিরাজমান, তখনও কোন পাখির কিচিমিচি ভোরের সঙ্গীত শুরু করেনি। তখন দিনের আলো কাউকে চিনতে দেয়নি। তখনও প্রভাত সমীরণ সৃষ্টিলোকে প্রবাহিত হয়নি। তখনও শিশুর দল রাজপথে কোলাহল করে উঠেনি, তখনও দিনের রবি তার আগমনের পূর্বাভাসে পূর্বদিগন্ত আলোকিত করে তোলেনি। তখনও অমাযামিনীর অন্ধকারে ধরা আচ্ছন্ন, কেবল আমিরুল মোমেনিন প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত, তিনিই যেন তাঁর শুভ প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভাতকালীন সকল কাজের দ্বারোদঘাটন করবেন। আপন বাড়ি হতে বের হয়ে পদক্ষেপ রাখলেন পবিত্র মসজিদ প্রাঙ্গণে। ইসলাম জগতের শেষ খলিফা মসজিদ প্রাঙ্গণে সবেমাত্র কয়েক পা ফেলেছেন, আলো-আঁধারের মাঝে, হেনকালে ঐ তিন মহা পাপাত্মা আব্দুর রহমান, আশয়াস ও শাবীব নামাজীর বেশে চোরের মত নিজেদের চিরস্থায়ী ভাবে আপন হাতে আপনাদের চির ঘৃণিত ও চির নিন্দিত হয়ে চির বন্দিত মানুষটিকে লক্ষ্য করে, ইহকাল ও পরলোক সকল কালকে ধূলিসাৎ করে, মহাকালের মহা কলঙ্কটিকে আপন আপন কপালে তুলে নিয়ে এক সাথে তিনটি অভিশপ্ত মানব জাহান্নামের অতল আগুনে ঝাঁপ দিল।

তিনটি আরবীয় তরবারি এক সঙ্গে চমকিয়ে, ঝলসিয়ে ও গর্জিয়ে উঠল শের-ই-খোদার মাথার ওপর। সমগ্র জীবনে এই প্রথম ও শেষ, শের-ই-খোদা তরবারির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অভিশপ্ত আশয়াস লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, ঘৃণিত শাবীব আঘাত হানল, নিন্দিত জীব আব্দুর রহমান আঘাতপ্রাপ্ত, রক্তাত, ভূপতিত আল্লাহর সিংহকে কপালে এত জোরে আঘাত হানল, মস্তকের গভীর প্রান্ত পর্যন্ত তরবারি সঞ্চারিত হলে শের-ই-খোদা সেই সহজাত সিংহবিক্রমেই বলে উঠলেন — "আল্লাহর কসম, আজ আমি কৃতকার্য। ইসলামের খেদমতে সবকিছুই দিয়েছিলাম, একটি শুধু বাকি ছিল— প্রাণ, তাও আজ অকাতরে অবলীলায় দিলাম।"

একটি নিকৃষ্ট জীব ঃ

তিনজনের একজন ঘাতক আশয়াস পালাতে সক্ষম হলো, শাবীব ওখানেই জনগণের রোষানলে প্রাণ হারালো। শেষ ঘাতক আব্দুর রহমান তরবারি ঘুরিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে বীর মুগিরা ইবনে নওফেল দুরাচারকে কম্বল ছুড়ে ধরে ফেলল। এবং সজোরে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারল। আহত খলিফাকে গৃহে আনা হলো। আততায়ীকে সম্মুখে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন —"হে আল্লাহর দুষমন, আমি কি কোনদিন তোর কোন উপকার করেছি?" উত্তর — "বহু উপকার করেছেন।" খলিফা —"আজ তুই এই কাজ করলি ? উত্তর— "আমি চল্লিশ দিন যাবৎ আমার এই তরবারিকে শান দিয়েছি, এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি — এর দ্বাবা তোমার একটি নিকৃষ্ট জীব হত্যা হোক।" খলিফা– "আমি মারা গেলে আমার নির্দেশেই এই তরবারি দ্বারা একমাত্র তোকেই বধ করে তরবারিটিকেই হত্যা (ধ্বংস) করবে। তুই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিস— "একটি নিকৃষ্ট জীব হত্যা হোক। আল্লাহ্ তোর প্রার্থনা কবুল করেছেন। তোর অভিশপ্ত তরবারিটি মাত্র দু'জনকেই হত্যা করলো। এখন বুঝতে পারলি— দু'য়ের মধ্যে আল্লাহর ঐ একটি নিকৃষ্ট জীবটি কে ? স্বয়ং রসুলে খোদা বলে গেছেন— "(আমি) আলী জান্নাতবাসী।"

খলিফার অন্তিম উপদেশ ঃ

শের-ই-খোদা হযরত হাসানকে ডেকে বললেন — "ও আজ বন্দী, বন্দীকে বন্দীর সম্মান দান করো। ভাল খেতে দাও, ভাল বিছানা দাও, ভালভাবে কথা বলো। যদি আমি প্রাণে বাঁচি প্রতিশোধ নেবো, কিংবা ক্ষমা করবো। আর যদি আমি মরে যাই, ওকে আমার পেছনে পাঠাবে, আমি আল্লাহর নিকট জবাব চাইব। বনি আব্দুল মুত্তালিবগণকে আমার সতর্কবাণী, তোমরা এই নিয়ে যেন রক্তপাত আরম্ভ করো না। আততায়ী ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করো না। ওর এক আঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তোমরা ওকে একটি আঘাতই দেবে, বেশি আঘাত দিও না। ওর নাক, কান কাটিবে না, লাশকে বিকৃত করো না। মহানবী বলেছেন— "সাবধান, কারো নাক-কান কেটো না, যদি সে কুকুরও হয়।"

"যদি তোমরা কাসাস (প্রতিশোধ) নিতে চাও, তাহলে ওকে ঐরূপ আঘাত করো, যেমন আঘাত আমাকে করেছে। যদি ক্ষমা করো, তাহলে ওটাই উত্তম। ঐ তরবারি দ্বারা একটি মাত্র ঐ পাপীকেই হত্যা করো। কখনও বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ্ কোন সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" ২ ঃ ১৯০, ৩ ঃ ১৯২, ৫ ঃ ৮৭, ৭ ঃ ৫৫, ১১ ঃ ৪৪, ২৫ ঃ ১৯, ২৭ ঃ ৫২, ৩৭ ঃ ৩০, ৬৬।

একটানা উপরোক্ত কথাগুলো বলার পর আহত খলিফা নীরব হয়ে গেলেন। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। হয়তো বা খলিফা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আবার সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। পাশেই ছিলেন জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি খুবই ধীরে খলিফাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন— খোদা না করুন, আপনি যদি আমাদের ত্যাগ করে চলে যান, তাহলে আমরা কি ইমাম হাসানকে খলিফা নির্বাচন করব ? খলিফা– "আমি তোমাদের এরূপ কোন নির্দেশ দেবো না। নিষেধও করবো না। তোমরা তোমাদের ভালোর জন্য যা ভাল মনে করবে, তাই করো। আল্লাহর রসূল আমাদের যে ভাবে ছেড়ে গেছেন, আমিও তাঁরই পথ অনুসরণ করে তোমাদের সেইভাবেই নেতা নির্বাচনে স্বাধীন ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে যাবো। এ-ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের কথা (গণতন্ত্র) ভুলে যেও না। ৩ঃ ১৫৯, ৪২ ঃ ৩৮।

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে ঃ

হে আমার প্রিয় পুত্রগণ,

১। আল্লাহর কেতাবকে কোন অবস্থাতেই ছেড়ো না।

২। আল্লাহর পথে চলতে কোন বিদ্রূপকারীর বিদ্রূপকে ভয় করো না।

৩। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকো।

৪। গরিবদের কথা সদাই মনে রেখো।

৫। অনাথ-এতিমকে সাহায্য করো।

৬। অসহায়কে সাহায্য করো।

৭। অত্যাচারীর শত্রু হয়ো, নির্যাতিতের বন্ধু হয়ো।

৮। পরকালের পাথেয় রেখো।

৯। ইহকালে সংযমী থেকো।

১০। আল্লাহ্-ভীতি অতি উত্তম জিনিস।

১১। দুনিয়ার পেছনে ছুটো না, যদিও সে তোমাদের পেছনে ছোটে।

১২। যা পাও না, তার জন্য দুঃখ করো, যা পাও তাতে খুশি থেকো।

১৩। মনে রেখো ন্যায়ের পথ আল্লাহর পথ, অন্যায়ের পথ শয়তানের পথ।

তৃতীয় পুত্র মহম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে ঃ

"তোমার ভাইদের প্রতি যে কথাগুলো বললাম, তুমি সেগুলো শুনলে, ওগুলো তোমার জীবনে কাজে লাগবে।

১। তুমি তোমার এই দুই ভায়ের জন্মগত অধিকার ও মর্যাদার কথা কোনদিনই বিস্মৃত হয়ো না, তাদের পরামর্শ ব্যতীত কিছু করো না।

২। ইমাম হাসান ও হোসেনকে– তোমরা জেনো মহম্মদ তোমাদেরই পিতার পুত্র, তোমাদেরই ভাই। তাকে ভালবেসো।

৩। অতঃপর সকলকে– আল্লাহ্কে ভয় করো। সময়মত নামাজ পড়ো।

৪। ঠিকমত যাকাত দিও, ভালভাবে অজু করো, যাকাত না দিলে নামাজ হয় না।

৫। মানুষকে ক্ষমা করো। মানুষকে ক্ষমা না করলে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায় না।

৬। প্রতিবেশীর সাথে সদা সদ্ব্যবহার করো।

৭। অশ্লীলতার কাছেও যাবে না।

৮। ধর্মে বাড়াবাড়ি না করে যুক্তির প্রয়োগ করো।

৯। কোরআনের সাথে সম্পর্ক সুগভীর করো।

১০। কোরআনের স্বাদ আস্বাদন করতে চেষ্টা করো।

সমগ্র জীবনজুড়ে করিও তেলায়াৎ
কঠিন সমস্যা মাঝে পাইবে শাফায়াৎ
বিপদে বন্ধু তব পবিত্র কোরআন
রুখে দেবে অদৃষ্টের অমোঘ বিধান।

২ ঃ ১৮৬, ২৮৬, ৩ ঃ ১৩৯, ২৭ ঃ ৬২, ৩৯ ঃ ৫৩।

অতঃপর খলিফার অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছিল, কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর সকল ছেলেমেয়েদের ডাকলেন এবং আবার বললেন –

১। আল্লাহর এবাদত সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তু।

২। কোন উত্তম বস্তুকে অধম বস্তুর সাথে বিনিময় করো না।

৩। যা পাওনি তার জন্য দুঃখ করো না, যা পেয়েছ তার জন্য শুকোর করো।

৪। কর্মকে ভালবেসো, অলসতাকে ঘৃণা করো।

৫। কোন কাজকেই ছোট মনে করো না।

৬। কোথাও নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিও না।

৭। তোমাদের দু'চোখে ইসলামের ইন্সানিয়াত (মনুষ্যত্ব) ও ইখওয়ানিয়াত (ভ্রাতৃত্ব)-কে আবদ্ধ রেখো।

৮। মনে রেখো আল্লাহর নিকট অতি ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম ভাল ও মন্দ কাজ সবই বিধৃত হয়। ৯৯ ঃ ৭ – ৮

৯। আল্লাহ্ তোমাদের পরকালকে ইহকাল অপেক্ষা ভাল করুন। ৯৩ ঃ ৪।

এইভাবে জীবনের অন্তিমক্ষণে আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী সকলকে আরো অনেক মূল্যবান কথা বললেন। বলতে বলতে বললেন – "হে আল্লাহ্, এবার আমাকে মুক্তি দাও, দুনিয়ার মায়াবন্ধন হতে মুক্তি দাও। তোমার সান্নিধ্যে যেতে দাও।" সর্বশেষে উচ্চারিত হলো কলেমা তাইয়েব – "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" . . . আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই মহম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত দূত। ইন্না . . . ।

দিনটি ছিল শুক্রবার, ক্ষণটি ছিল সন্ধ্যা, দিনের রবির সাথে সাথে দ্বীনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটিও অস্তমিত হলো। ১৭ রমজান ৪০ হিজরী, ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ, তখন বয়স তেষট্টি বছর। অতঃপর পুত্র ইমাম হাসানের নেতৃত্বে কাফন– দাফন সমাধা হলো।

ইসলামজাহান হারাল তার অদ্বিতীয় স্তম্ভ। মুসলিমজাহান হারাল তার এক অতুলনীয় মুসলমান, মানবজগৎ হারাল তার মহামানব, বীরজগৎ হারাল তার বীর সম্রাট, জ্ঞানজগৎ হারাল তার জ্ঞানের দরজা।

অভিশপ্ত ঘাতক আব্দুর রহমানের প্রাণদণ্ড ঃ

দাফনের পর খুনী আব্দুর রহমানকে ইমাম হাসানের সম্মুখে হাজির করা হলো। খুনী বলল-- "মক্কার কাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলাম মুয়াবিয়া ও হযরত আলীকে হত্যা করার জন্য। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি এখনই দামেস্ক গিয়ে মুয়াবিয়াকে হত্যা করে ফিরে আসবো, এবং আপনার হাতে বয়াত হবো। এই প্রচেষ্টাতে আমার মৃত্যু হলেও আমি পশ্চাদপদ হবো না। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।" ইমাম হাসান – "আমি কোনদিন কাউকেই মারার আদেশ বা পরামর্শ দিই না, বাঁচাবার আদেশ ও পরামর্শ দিই। পবিত্র কোরআন নির্দেশ দিয়েছে তোমরা ন্যায় বিচার করো। আমি সেই ন্যায়বিচাবের পক্ষপাতী। হে খুনী, নরকের স্বাদ কত নিকৃষ্ট, তা জানার পূর্বেই তোমাকে তোমার কৃতকর্মের জাগতিক স্বাদ বিচারের মাধ্যমে পেতে হবে।" ৪ ঃ ৫৮, ১৩৫, ৫ ঃ ৮, ১৬ ঃ ৯০, ৯৯ ঃ ৭–৮। অতঃপর বিচার হলো। বিচারে তার প্রাণদণ্ডের শাস্তি ঘোষিত হলো। এইভাবে ঘাতক আব্দুর রহমান প্রাণদণ্ডে দন্ডিত হলো।

শাহাদতের পর দ্বিতীয় দিন ঃ

ইমাম হাসান মসজিদে গেলেন, এবং শোকাভিভূত কণ্ঠে একটি ছোট ভাষণ দিলেন – "ভাইসকল, গতকাল তোমাদের নিকট হতে এমন একজন বিদায় নিলেন, বিদ্যার ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন "জ্ঞানের দরজা", তার সমান বা সমকক্ষ কেউই ছিলেন না, ভবিষ্যতেও আর থাকবে না। তিনি ছিলেন "শের-ই-খোদা"। ইসলামের এমন কোন বিজয় নেই, যেখানে শের-ই-খোদা প্রথমে নেই। ইহকাল ও পরকালের জ্ঞানজগতে ছিলেন অতুলনীয়, আবার ইহজগতের সমরে ছিলেন অদ্বিতীয়। সেই অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় মানব আজ আর নাই। মহানবীর "শেরেখোদা" "জ্ঞানের

দরজা” আর নেই। পৃথিবী আর কোনদিনই ঐ মানুষ পাবে না। মহানবীর অতিব স্নেহের জামাতা, খাতুনে জান্নাতের স্বামী আর নেই। দুনিয়ার মানুষ রোজ হাশর পর্যন্ত ঐ মুখ আর দেখতে পাবে না। তিনি কোনদিনই ধনসম্পদ সংগ্রহ করে যাননি। তাঁর ভাতা হতে মাত্র ৭০০ দেরহাম ঘরে পড়ে আছে।”

হযরত যায়েদ ইবনে হোসায়েন ঃ

“খলিফার অতর্কিত শাহাদতের সংবাদ ওমরের কন্যা কুলসুমের মাধ্যমে মদীনায় পৌঁছাবার পরই সারা মদীনাতে শোকের সীমাহীন কালো মেঘ দেখা দিল। সারা মদীনাতে এমন একটিও জনপ্রাণী ছিল না, যে মদীনার রাস্তায় রাস্তায় আকুল ভাবে কেঁদে বেড়ায়নি। আবাল– বৃদ্ধবনিতা সকলেরই একই অবস্থা। এক সপ্তাহ যাবৎ মদীনার বহু বাড়িতেই উনুন জ্বলেনি। শোকের মাত্রা এতই প্রকট ছিল। সকলেই বলেন – রসূলে আকরমের মৃত্যুতে মদীনার যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, এটা যেন তারই অনুরূপ হলো। সাহাবাগণ দলবদ্ধ হয়ে বিবি আয়েশার গৃহের মুখে চললেন। সেখানে গিয়ে দেখেন বিবি আয়েশা কিছু পূর্বেই সংবাদ পেয়ে গেছেন, এবং শোকে ও দুঃখে এতই মর্মাহিতা হয়েছেন যে, পাথরের মত পড়ে আছেন, এবং তাঁর দু’গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল তিনি মৃত্যুপ্রায়।

হযরত আয়েশা ঃ দ্বিতীয় দিনে বিবি আয়েশা মহানবীর রওজা মুবারকে আসছেন, একথা শুনে সাহাবাগণ ও অন্যান্য মানুষ দলে দলে তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় করলেন। তিনি বাড়ি হতে বের হলেন, শোক এতই গভীর ছিল, কারো সাথে একটি কথাও বলতে পারলেন না। ধীর পদক্ষেপে রওজা মুবারকের দিকে চললেন। হাজির হলেন মহানবীর রওজা শরিফে। মহা আবেগে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন – “হে আবুল কাসেম, হে আল্লাহর রসূল আপনার প্রতি সালাম, আপনার দুই পার্শ্ববর্তী, দুই আপনজনের প্রতি সালাম। আজ আমি আপনাকে আপনার প্রিযতম আপন হতেও আপনজনের মৃত্যু সংবাদ দিতে এসেছি। আজ আমি আপনাকে তাঁরই মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি, যাঁকে আপনি “শের-ই-খোদা”, ‘জ্ঞানের দরজা’ উপাধি দান করেছিলেন। যাঁকে আপনি আপনার প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাতকে বিবাহে দানে করেছিলেন। যাঁর স্ত্রী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানবী। যিনি সর্বপ্রথম ইমান এনেছিলেন আপনার প্রতি, যিনি সর্বপ্রথম মুসলমান, যিনি ইমানের শত পরীক্ষায় অচিন্ত্যনীয়ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি দিনে ছিলেন আপনার দক্ষিণ হস্ত, রাতে ছিলেন বাম হস্ত, তিনি শহীদ হয়েছেন। আমি ক্রন্দনরত, আমি দুঃখিত, আমি শোকে মৃত্যুপ্রায়, আমার অন্তর দীর্ণ– বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আজ যদি কবরের মুখ খুলে যেতো, তাহলে আমরা সকলেই এই একই কথা আপনার পবিত্র মুখ হতেও শুনতাম – “শ্রেষ্ঠতম মানব শহীদ হয়েছে, শ্রেষ্ঠতম বীর শহীদ হয়েছে, শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী শহীদ হয়েছে।”

মা আয়েশার বিলাপ

কাঁপিল আকাশ, কাঁপিল বাতাস,
কাঁপিল আরশ উভ-লোকে
ভাঙ্গিল মক্কা, ভাঙ্গিল মদীনা,
ভাঙ্গিল আরব মহাশোকে।
ছুটিল মানুষ রুদ্ধশ্বাসে
এক সাথে সব ঝাঁকে ঝাঁকে
মা আয়েশা শীর্ষভাগে
দ্বীনের নবীর রওজাপাকে।
বলিলেন কেঁদে মা আয়েশা,
"আপনার স্নেহের শের-ই-খোদা
শহীদ হয়েছেন, দেখেছি যাঁরে,
আপনার সাথে সর্বদা।
গেলেন যখন গারে সওরে
রাখিয়া তাঁরে তব বিছানায়
বলিলেন – 'আলী কোন ভয় নাই,
থাক সারা রাত সুনিদ্রায়।
দুঃখের দিনে ধরিয়াছে ঢাল
সুখের দিনে সুখ চাহে নাই।
আজ হতে যাঁর চলিবে যেকের
তাঁর গুণগান শ্রেষ্ঠতায়।
শ্রেষ্ঠ মানব চলিয়া গেলেন,
সকলের বুকে প্রবল ব্যথা
শুনিতাম মোরা ফাটিলে কবর,
আপনার মুখেও এক-ই কথা।"

দ্বাদশ অধ্যায়

শাসনে-প্রশাসনে হযরত আলীর কৃতিত্ব

শাসন হস্তান্তরের পূর্বাধ্যায় ঃ

হযরত আলী খেলাফতের ভার ও গুরুদায়িত্ব হাতে নেওয়ার পূর্বে খেলাফতের শাসনব্যবস্থা কত যে সকরুণ ছিল, স্বয়ং খলিফা ওসমান হত্যা তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। সারা দেশে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পক্ষপাত, স্বজনপোষণ, গরিব নিধন, ধনীর বর্ধন, সব কিছু মিলে শাসনব্যবস্থাকে একেবারেই লাটে তুলে দিয়েছিল। ফলে খেলাফত হারালো শুধু মহানবীর বিশেষ বিশেষ সাহাবাগণের সমর্থনই নয়, হারালো সারা দেশের জনগণের জন-সমর্থনও। এই অবস্থায় খলিফা শহীদ হওয়ার পর খেলাফতে খলিফার আসনটি শূন্য রইল কয়েকদিনই। যারা দুর্নীতির শত দুয়ার খুলে দিয়ে খেলাফতের বাবোটা বাজিয়েছিল, তারা তখন গর্তে আত্মগোপনে ব্যস্ত, এবং যারা খলিফাকে বধ কবলো তারা তখন ক্ষান্ত। ফলে বিশাল দেশের খলিফার আসনটি শূন্য রইল। এই অভিশপ্তক্ষণে কেউই রাজি নন অভিষেকে। ইসলামের ইতিহাসে কি মর্মান্তিক, কি বেদনাদায়ক করুণতম দৃশ্য । এইরূপ একটি অভাবনীয় অবস্থাব সৃষ্টি হতে চলছিল, সেটা অনেকেই ধারণা করেছিলেন। পুরো দুটো বছর ধবে এ ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের পূর্বাভাস জনরোষে প্রকাশ পাচ্ছিল। সে কথা খুবই তিক্তময় হলেও ইতিহাসে অনুল্লেখিত থাকা উচিত নয়, হযরত আলী বারবাব খলিফা ওসমানকে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন, বহুবার অযাচিতভাবে সাবধান করতে গিয়ে অপমানিতও হয়েছিলেন খলিফার তথাকথিত পারিষদবর্গেব কুমন্ত্রণায়।

হযরত আলীর অনিচ্ছা ঃ আজ খেলাফত টলমল, খলিফাব আসন শূন্য। প্রবীণ সাহাবাগণ একের পর এক ধাওয়া করছেন হযরত আলীর নিকট খলিফাপদ গ্রহণে অনুরোধ জানাতে, জনগণ ধাওয়া করছেন ঐ একই কারণে অনুরোধ জানাতে, হত্যাকারী দলও অনুনয়-বিনয় জানাচ্ছে খলিফার আসন গ্রহণে। হযরত আলী সকলকেই জানিয়ে দিলেন - 'তোমরা দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান কর।' কিন্তু তখন খেলাফত গ্রহণে হযরত আলীর ন্যায় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ঐ গুণসম্পন্ন, ঐ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তি আর একজনও ছিলেন না। তাই সকল দলের অনুরোধে, উপরোধে বিশেষ করে ইসলামের অবস্থা চিন্তা করেই সর্বশেষে বহু অনিচ্ছা সত্ত্বেই হযরত আলী খলিফার পদ বরণ করে ঐ ছন্নছাড়া প্রাণহীন প্রশাসনকে হাতে নিলেন। অতঃপর হযরত ওসমানের খেলাফতে যে সমস্ত কারণে প্রশাসন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল, প্রথমেই অতি কঠোর হস্তে সেগুলোর

বিলোপসাধনে মনোনিবেশ করলেন, যেমন বাইতুল মালের আমানতে খেয়ানত, ব্যক্তি সম্পদের পাহাড় সঞ্চয় ও তার অপচয়, সরকারী পদের অপব্যবহার ও শক্তির অপপ্রয়োগ ইত্যাদি। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থায় জনগণ যে ফায়েদা ও সোনার ফসল তুলতে পেরেছিলেন, হযরত আলী তাঁর অনুসরণ করলেন পঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। এইরূপ একটি জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে তিনি প্রশাসক হিসাবে যে জনদরদী মনের পরিচয় ও প্রশাসনে যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তা সর্বকালের জগৎ-প্রশাসনে একজন সুদক্ষ ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রশাসনে ওমর ও আলী ঃ প্রশাসনে হযরত ওমর ও হযরত আলীর কথা তুলনামূলক ভাবে বলতে গিয়ে এই ফাঁকে ইতিহাসের একটি নিগূঢ় সত্য যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে না ওঠে, তাই খোলা প্রাণেই বলতে হয় – হযরত ওমর পেয়েছিলেন ইসলামের জোয়ার যুগ, অনুকূল পরিবেশ, মহানবীর শুদ্ধস্নাত অগ্নিযুগের সত্যের পথে, ত্যাগের পথে, আল্লাহর স্মরণে জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞাকারী অসংখ্য সাহাবী, প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন মহাতাপস, মহামানব, এবং সুদীর্ঘ বাইশ বছর পর সেখানে হযরত আলী পেলেন – ভাটার যুগ, প্রতিকূল পরিবেশ, সত্যচ্যুত, ন্যায়চ্যুত বিবেকচ্যুত চরম স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী ও ভোগবিলাসীর দল। হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধের নাম নিয়ে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কলাকৌশল ও ক্ষমতালাভের শত ষড়যন্ত্র প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত হওয়া সত্ত্বেও এবং শত প্রতিকূল আবহাওয়াতেও হযরত আলী তাঁর প্রশাসনে অন্যায়ের একটি মাছি গলতেও না দিয়ে একজন পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত প্রশাসক হিসাবে আপন যোগ্যতার ও দক্ষতার, প্রজ্ঞার ও প্রতিভার, সততার ও সাধুতার, অকৃত্রিমতার ও আন্তরিকতার প্রভূত পরিচয় রেখে গেছেন। তাই অভিন্ন না হলেও ওমর ও আলী প্রশাসন ছিল দুই পৃথক পরিবেশভিত্তিক দুটো বিশুদ্ধ শাসনব্যবস্থা এবং প্রসিদ্ধ প্রশাসন-প্রণালী।

শাসনব্যবস্থার সূচনা ঃ

প্রদেশ সমূহ	গভর্নর
১। মক্কা-মদীনা	হযরত আবু আইউব আনসারী
২। বসরা	আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
৩। পারস্য	যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান
৪। তায়েফ	কাসেম ইবনে আব্বাস
৫। কুফা	কেন্দ্র-শাসিত
৬। মিশর	কায়েস ইবনে সায়াদ (পরে হস্তচ্যুত)

খলিফা হযরত আলী তাঁর শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য যেমন সমগ্র দেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, তেমনি শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্যও প্রশাসনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন – ১। ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ, ২। সামরিক বিভাগ, ৩। পুলিশ বিভাগ, ৪। বিচার বিভাগ, ৫। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ ঃ

জমিদারী প্রথার বিলোপ ঃ খলিফা ওসমানের সময় হযরত ওমরের ভূমিনীতি রদ করে নতুন নীতির প্রবর্তন হলে দেশে জায়গীরদার ও জমিদার প্রথার প্রবর্তন হলো। ফলে ভুঁইফোড় অনেকেই রাতারাতি জায়গীরদার ও জমিদার হয়ে উঠলেন। এবং সারা দেশজুড়ে গড়ে উঠলো বিরাট গরিব শ্রেণী। দেশের মানুষ দুটো দলে বিভক্ত হলো – ধনী ও দরিদ্র। ফলে ইসলামের মূল নীতিতে পদাঘাত হলো। এটা কেন হলো। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ খলিফা ওসমানকে ভুল বুঝিয়ে অফুরন্ত অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে তারাই খলিফাকে আবার ভুল বুঝিয়ে উদ্বুদ্ধ করলো জায়গীরদার ও জমিদার প্রথার প্রবর্তন করতে। এই নিয়ে খলিফার সাথে হযরত আলীর বহু বার বহু তিক্তময় আলোচনাও হয়েছিল। ফলে তিনি বারবার খলিফার বিরাগভাজনই হয়েছিলেন। অতঃপর যখন তিনি নিজে খলিফার আসনে বসলেন, তখন আর কোন রূপ চিন্তা না করেই ঐ কায়েমী স্বার্থে কঠোর আঘাত হেনে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে সকল জমি সর্বসাধারণের মধ্যে বিলি-বন্টন ও বিতরণ করলেন। তাঁর নীতি ছিল – "লাঙ্গল যার জমি তার, কৃষক পাবে কৃষি খেত।" এর ফলে দেশের তামাম জোতদার, জায়গীরদার ও জমিদারগণ খলিফার তীব্র বিরোধিতায় নেমে পড়লেন। খলিফা অপামর ধনী শ্রেণীর বিরাগভাজন হলেন, কিন্তু আপন নীতি বিসর্জন দিলেন না। বিজ্ঞ গরিব-দরদী খলিফা জানতেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। এখন দংশন তাঁকে পেতেই হবে। তবে এ কাজে তাঁর আনন্দও ছিল অফুরন্ত বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেয়ে, কেননা তিনি ছিলেন মূলত বিবেকবান মানুষ, ধনবান নন।

ভূমি-রাজস্বের মূল নীতি ঃ

হযরত আলী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন খাজাঞ্চীখানার হিসাব-নিকাশের প্রতি। প্রথম পদক্ষেপেই অসাধু দুর্নীতিপরায়ণ ধান্দাবাজ কর্মচারীদের অপসারণ করে বিভাগের সার্বিক সংস্কার সাধন করে হিসাব রক্ষার নতুন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। পুনর্গঠিত বিভাগ আবার প্রাণ পেল। কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ওসমান ইবনে হানিফ। একদিন খলিফা ঘোষণা করলেন – "রাজস্ব আদায়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে করদাতার সঙ্গতি ও অসঙ্গতির ওপর, অত্যাচার বা জুলুম যেন না হয়। করদাতা কর দেবে জমির ওপর, জমি যদি তার

উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন লক্ষ্য দিতে হবে জমির সামর্থ্য ও জমির মালিকের সামর্থ্যের প্রতি। জমির উর্বরতা ও প্রজার মঙ্গল, এটাই হবে মূল লক্ষ্য।"

বন্টন নীতি ঃ

ভূমি রাজস্ব ও রাজস্ব এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সম্পদ কিভাবে বিতরণ হবে, তিনি যে প্রথার প্রবর্তন করলেন, তা ছিল সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সমবন্টন। এইটাই ছিল তাঁর বন্টন নীতির মূল কথা। অনেক সময় নিজেই পর্যবেক্ষণ করতেন, হিসাব-নিকাশ নিজেই পরিদর্শন করতেন। তিনিই প্রথম প্রবর্তন করলেন সাপ্তাহিক বিতরণ নীতি। এবং এই দিনটি ধার্য করেছিলেন 'বৃহস্পতিবার'। বৃহস্পতিবার ধার্য করার পেছনে কারণ ছিল, শুক্রবারটি ছিল ছুটির দিন। যাতে মানুষ ছুটির আগের দিন আপন আপন অংশ পেয়ে ছুটির দিনটি আনন্দে কাটাতে পারেন। শনিবার ছিল সপ্তাহের প্রথম দিন। শুরু হতো নতুন খাতা।

মহানবীর প্রবর্তিত ইসলামের মূল নীতি মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসলামের তৃতীয় খলিফার সময় মানুষে মানুষে প্রচন্ড ভেদরেখা টানা হয়। হযরত আলী মানুষে মানুষে এই ভেদরেখা বিলোপ করে আরবের অভিজাত শ্রেণী ও আফ্রিকার নিগ্রো ক্রীতদাসকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেন। অংশ করে দিলেন সবার সমান। এই দুই কারণে আরব অভিজাত বংশ হযরত আলীর প্রতি ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলেন।

কোষাধ্যক্ষের অভিযোগ ঃ এই প্রসঙ্গে একবার স্বয়ং খাজাঞ্চীখানার কোষাধ্যক্ষ ওসমান ইবনে হানিফ স্বয়ং খালিফাকেই অভিযোগ করে বলেই ফেললেন —

১। আপনার সমবন্টন নীতির প্রবর্তন,

২। আরব অভিজাত শ্রেণীকে সাধারণের সাথে নিয়ে আসা,

৩। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের দীন-দরিদ্রের সাথে এক করা,

৪। দাস ও মুনিবের অংশকে এক করা,

৫। জোতদার, জায়গীরদার, জমিদার প্রথার বিলোপ সাধন,

৬। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা বন্ধ,

৭। ধনীর অতিরিক্ত ধনেব বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি আপনাকে আরব অভিজাত শ্রেণীর ও ধনী শ্রেণীর শত্রুতে পরিণত করছে। তাঁরা সকলেই আপনাকে ত্যাগ করে আমির মুয়াবিয়ার দরবারে যোগ দিচ্ছে। আপনি কতকগুলো গরিব, দরিদ্র, দীনহীন, অন্ধ খোঁড়া, বিধবা-বৃদ্ধ, সহায়-সম্বলহীন, সাহস-শক্তিহীন, মর্যাদা-মেরুদন্ডহীন মানুষকে নিয়ে কি করবেন ? তারা আপনাকে কি সাহায্য করতে পারে ?"

পুরষোত্তম মহামানব হযরত আলীর ঐতিহাসিক উত্তর ঃ

আমি এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য ও বরদাস্ত করতে রাজি নই ঃ

১। ইসলামি রাষ্ট্রের ধন-সম্পদের সিংহভাগ কেবল ধনীরাই ভোগ করবে।

২। ইসলামি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা কেবল অভিজাত শ্রেণীর মানুষই ভোগ করবে, কখনও না।

৩। রাষ্ট্রের ধন সাধারণের ধন, সাধারণের নিকট থেকে এসেছে। আবার তা সাধারণের নিকটেই ফিরে যাবে।

৪। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ কোনদিন কোন কিছু উৎপাদন করে না।

৫। ধনীর ধন সাধারণের নিকট হতে চুষে নেওয়া মাত্র।

৬। সরকারী কর দেওয়ার পরও, তাদের নিকট যা থাকে, তা প্রভূত ধনরাশি, নচেৎ তারা অমিতব্যয়ী হয় কি করে, অপচয় কি ক'রে করে? ওটাও আমি কেড়ে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতাম, যদি ওটা ব্যক্তিগত ধন না হতো।

৭। মানুষ হিসাবে সকলেই এক, একই সম অংশ পাবে। আমি (খলিফা) তুমি (কোষাধ্যক্ষ) ও তারা (গরিবের দল), কোন পার্থক্য নেই।

৮। প্রভাবশালী মানুষকে বিশেষভাবে বেশি পাইয়ে দেওয়া চূড়ান্ত দুর্নীতি।

৯। ধনীর অতিরিক্ত অবৈধ ধন বাজেয়াপ্ত হবেই।

১০। জোতদার, জমিদার থাকতে পারে না, কেননা জমি তার লাঙ্গল যার, কৃষকই একমাত্র জমির মালিক হবে।

১১। ধনীদের আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলছো, এর জন্য আমি মনে মনে খুশিই হয়েছি। আমি জানি তারা আমাকে বিপথগামী হতে সাহায্য করবে, তবে একথাও ঠিক, আপাত দৃষ্টিতে রাজ্যলাভেও সাহায্য কববে। কিন্তু আমি জানি রাজ্য দেওয়া না দেওয়া আল্লাহর হাতে। ৩ ঃ ২৫, ২৮ ঃ ৫-৬। মানুষের হাতে শুধু রাজ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্ব। আমি আমার সেই দায়িত্বটুকু পরিচালনা করছি কিনা দেখবো।

১২। গরিবরা আমাকে সাহ্যায্য করবে, আমি সেই আশায় ওদের সাহায্য করি না। আমি ভালভাবেই জানি তারা আমাকে সাহায্য করতে অক্ষম, কিন্তু সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। আমি তাকেই সাহাযা করি, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে না। এবং আমি তাঁরই (এক আল্লাহর) সাহায্য চাই, যিনি (আল্লাহ্) কারো সাহায্য চান না। ৪ ঃ ৪৫, ১১২ ঃ ২।

কোষাধ্যক্ষ – "হে আমিরুল মোমেনীন, আমার কথা আপাত ক্ষণিকের, আপনার কথা চিরদিনের, আমার কথা কয়েকজনের, আপনার কথা সর্বজনের, আমার কথা আমাদের জন্য, আপনার কথা সবার জন্য, যতদিন জগৎ আছে, আপনার কথার কোন জবাব নেই।"

রাজস্ব বিভাগ

রাজস্ব বা কর ঃ কর প্রশাসন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ১। আদায় বিভাগ ও ২। বিতরণ বিভাগ। আবার আদায় বিভাগও তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। – ১। ভূমি রাজস্ব, ২। যাকাত ও ৩। জিজিয়া। ভূমি রাজস্ব ও জিজিয়া প্রাদেশিক খাতে খরচ হতো এবং যাকাত সদ্‌কাহ্ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় খাতে খরচ হতো।

রাজস্ব বা করের উৎস ও বিতরণ ঃ

১। ভূমি রাজস্ব - এই বিভাগের কর্মচারীগণ সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। খলিফা আলী এঁদের নিয়োগের ভার প্রাদেশিক গভর্নরকে দিয়েছিলেন। এই কর সোনা ও রূপার মাধ্যমে নেওয়া হতো।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর সর্বপ্রথম আদমসুমারির (লোকগণনা) প্রচলন করেন, এবং চতুর্থ খলিফা আলী প্রথম জমি জরিপের প্রবর্তন করেন। এক জরিপ ২২৬৮ $\frac{৩}{৫}$ স্কোয়ার গজের সম পরিমাণ স্থান। আর একটি জিনিস তিনি সর্বপ্রথম প্রচলন করেন, সেটি আয়-ব্যয়ের খতিয়ান অর্থাৎ বাজেট প্রথা। প্রতিটি গভর্নরকে বাজেট তৈরি করে খলিফার অনুমোদনের জন্য অগ্রিম পাঠাতে হতো। খলিফার আবার বাজেট বিশেষজ্ঞ বা বাজেট পরিষদ ছিল।

খলিফার দরবারে বাজেট পরিষদে দিনের পর দিন বিভিন্ন প্রদেশের বাজেট আলোচনা হতো। আলোচনা কালে আলোচ্য বাজেট প্রেরণকারী গভর্নরকে হাজির থাকতে হতো। ভূমি রাজস্ব ভূমির উর্বর শক্তির ওপর নির্ভর করতো। এখানেও একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ থাকতো। তাঁরাই স্থির করতেন ভূমি কর ভূমির গুণআনুসারে ঃ

১। প্রথম শ্রেণীর জমি প্রতি জরিপে	১১.২	দিরহাম
২। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি "	১	দিরহাম
৩। তৃতীয় " "	১/২	দিরহাম
৪। ফলের বাগান (আঙুর-খেজুর প্রভৃতি) "	১০	দিরহাম

২। যাকাত - যাকাত ও সদ্‌কাহ্ এই কর কেবল মাত্র মুসলমানদেরই দিতে হতো। এ কর উৎপন্ন শস্য বা গৃহপালিত পশু প্রভৃতির দ্বারা দেওয়া হতো। এই কর যাঁরা আদায় করতেন, তাঁরা নিযুক্ত হতেন স্বয়ং খলিফা দ্বারা। এই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করার পূর্বেই খলিফা তাঁর বর্তমান ধনের একটি লিখিত হিসাবনামা জমা নিতেন। প্রয়োজন বোধ করলে পরবর্তী কালে তাঁর বাকি ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতো।

নিম্নলিখিত খাতে বিতরণ হতো ঃ

১। প্রশাসন ২। অনাথ এতিম, গরিব মিসকিন, কানা খোঁড়া, বৃদ্ধ প্রভৃতি ৩। স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী ৪। সেনাবাহিনীর বিধবাগণ ৫। ক্রীতদাস মুক্তি ৬। সরকারী ঋণ পরিশোধ ৭। পথিমধ্যে অসহায় হাজীগণ

হযরত আলীই সর্বপ্রথম তিন ও ছ'নম্বরকে লিখিতভাবে সাহায্যের ও আইনের তালিকাভুক্ত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম লিখিতভাবে আরো একটি জিনিস ঘোষণা করেন – "রাষ্ট্রের আয়ে সকলের অংশ সমান।" গভর্নর থেকে স্বয়ং খলিফা পর্যন্ত একজন দিন-মজদুরের সমান পেতেন। এটা ছিল ইসলামের সাম্য নীতি, এবং খলিফা ছিলেন এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী।

৩। জিজিয়া –

অমুসলমান প্রজাবৃন্দের নিকট হতে যাকাত ও সদ্‌কার পরিবর্তে এই কর আদায় করা হতো। এই করটুকু মিটিয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁদের স্বাধীন নাগরিকত্বের পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করতে পারতেন। এই কর বছরে একবার পরিশোধেয় ছিল। এরও শ্রেণী বিভাগ ছিল।

১। প্রথম শ্রেণী	ঃ	যাঁরা ধনী ও ভূস্বামী	প্রতিজনে	৪৮ দিরহাম
২। দ্বিতীয় শ্রেণী	ঃ	যাঁরা ধনী মধ্যবিত্ত	"	৪২ দিরহাম
৩। তৃতীয় শ্রেণী	ঃ	"	"	১২ দিরহাম
৪। চতুর্থ শ্রেণী	ঃ	ব্যবসায়ী	"	৪২ দিরহাম

এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জিজিয়া মুক্ত ছিল ঃ

১। ভিখারি, পাগল বা ঐ শ্রেণীগত মানুষ

২। যাদের বয়স পঞ্চাশোর্ধ

৩। যাদের বয়স কুড়ির কম

৪। সকল স্ত্রীলোকই

৫। অন্ধ

৬। খোঁড়া বা বিকলাঙ্গ

জিজিয়া নিম্নলিখিত খাতে খরচ হতো ঃ

১। সৈন্যবাহিনী

২। দুর্গ নির্মাণ, মেরামত ইত্যাদি

৩। রাস্তাঘাট

৪। কূপ ও পুকুর খনন

৫। পথিপার্শ্বে সরাইখানা নির্মাণ

৪। বনাঞ্চল কর ঃ

এই করটি পূর্ববর্তী খলিফার সময় আদায় হতো, কিন্তু নথিভুক্ত হতো না। হযরত আলী সর্বপ্রথম একে নথিভুক্ত করে সরকারী আয় বৃদ্ধি করেন। প্রতিবছর প্রতিটি অঞ্চল হতে চার হাজার দিরহামেরও বেশি উদ্ভিদ কর আসতো। এতে সরকারী কোষাগার শক্তিশালী হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু খলিফা বেশ কিছু লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

৫। অশ্ব কর ঃ

পূর্বে অশ্বের ওপর যাকাত দিতে হতো। খলিফা এই প্রথা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর নয় ভেবে ঘোড়ার ওপর যাকাত ধার্য রহিত করেন। এই রহিতকরণের ফল অত্যন্ত শুভ হয়েছিল।

ভূমি ও রাজস্ব বিভাগে হযরত আলী নানা নতুন নতুন নীতির প্রবর্তন করেছেন, কোথাও কোনটি বাতিলও করেছেন। এই বিভাগে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা একদিকে একজন যোগ্যতম প্রশাসকের পরিচয় তুলে ধবে। আবার অন্যদিকে একজন মহামানবের মনের মানসিক ছাপটিও তুলে ধরে। হযরত আলী চরিত্রের মত একটি বিশ্ববিখ্যাত চরিত্রকে, মনীষাকে জানার জন্য তাঁর বিশাল খেলাফতের বহু বিভাগের একটি বিভাগ ভূমি ও রাজস্ব, এর আদায় ও বিতরণের সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ বিধি ব্যবস্থাটুকুই যথেষ্ট। রাজস্ব বিভাগে তাঁর ন্যায় ও সুষ্ঠুর নীতির প্রবর্তন মানুষের ইতিহাস বিশেষ করে গরিবের ইতিহাস কোনদিনই ভুলবে না।

বাইতুল মাল (কোষাগার) ঃ

হযরত আলীর মুখে বাইতুল মালের সংজ্ঞা – "আল্লাহর সম্পদ আমার নিকট জমা আছে জনসাধারণের জন্য। আমি তার মালী মাত্র, মালিক নই, প্রহরী মাত্র, প্রভু নই।"

স্বয়ং মহানবীর সময় মাল জমা পড়ত না, তাই কোন বাইতুল মালও গড়ে ওঠেনি। হযরত আবু বকরের সময় মাল কিছু কিছু আসতো, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিতরণও হয়ে যেতো, এবং তখন হতেই বাইতুল মাল গড়ে উঠল। হযরত আবুবকরে যার সূচনা, হযরত ওমরে তার সম্পূর্ণতা। হযরত ওমর তাঁর কঠিন অসুখে সামান্য কয়েক ফোটা মধুও নেননি বাইতুল মাল হতে শুরার (উপদেষ্টা পরিষদ) অনুমতি ব্যতীত। তাঁর নীতি ছিল এমনি কঠোর। হযরত ওসমানে এসে যে কারণেই হোক বাইতুল মালের ঐ নীতি লঙ্ঘিত হলো। এটাও ছিল বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। কেননা বাইতুল মাল ছিল খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আলী খেলাফতে এসে হযরত ওমর কর্তৃক প্রবর্তিত যাবতীয় নীতিগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

করে আবার প্রাণদান করলেন। বাইতুল মাল ফিরে পেল তার পূর্ব মর্যাদা ও মহিমা আপন নীতিতে ও রীতিতে, সুষ্ঠু বণ্টনে ও সমান বিতরণে। হযরত আলীর এই কঠোর সম বণ্টন নীতিও তাঁকে কম ঝামেলাতে ফেলেনি। প্রায় অধিকাংশ আমির-উমরাগণ স্বার্থে আঘাত পড়ায় বিগড়িয়ে গেলেন। কিন্তু আলী তাঁর কঠোর নীতি থেকে এতটুকুও সরে গেলেন না।

এই সম্পর্কে দুটো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার ইয়ামন হতে বেশ কিছু পরিমাণ মধু দারুল খেলাফতে (রাজধানী কুফাতে) এল। একদিন ইমাম হাসানের বাড়িতে বেশ কিছু সংখ্যক অতিথি এসে গেল। ইমাম বাইতুল মালের প্রহরী কম্বরকে অনুরোধ করে আপন অংশ মত কিছু মধু নিলে ঘটনাক্রমে খলিফার চোখে পড়ায় তিনি পুত্র ইমামকে প্রহার করতে উদ্যত হলে কিছু গণ্যমান্য সাহাবীর মাধ্যমে রক্ষা পান। পুত্রকে সতর্ক করলেন – "তুমি একাকী নিজের অংশ হলেও বাইতুল মাল হতে কোন কিছু নিতে পারো না।" খলিফার সঙ্গে সঙ্গে একটি টাকা দিয়ে বাজার হতে মধু ক্রয় করে ওটা পূরণ করলেন।

একবার খলিফার আপন কনিষ্ঠ ভাই আকিল তাঁর দারিদ্র্যতাবশত খলিফাকে বাইতুল মাল হতে কিছু দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে খলিফা তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখান করায় আকিল বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকলে খলিফা একজনকে ডেকে বললেন – "একে বাজারের ঐ বন্ধ দোকানে নিয়ে যাও, সে ঐ দোকানের দরজা ভেঙে কিছু মাল নেবে।" তখন আকিল বলেন – "আপনি কি আমাকে চুরি করতে বলেন ?" উত্তরে খলিফা বলেন – "তুমিই তো আমাকে বহু মানুষের মাল (বাইতুল মাল হতে) চুরি করতে বলছো। আমি তো তোমাকে একজনের মাল চুরি করতে বলছি। তুমি তোমার জন্য চুরি করবে, ওটা ভাল ? না আমি তোমার জন্য চুরি করব, এটা ভাল ?" আকিল সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তখন আবার অনুরোধ করলেন – "তাহলে আপনি কাউকে বলে দিন, আমাকে সাহায্য করার জন্য।" খলিফা বললেন – "আমি খলিফা না হলে বলে দিতাম, এখন বললে স্বজনপোষণে খলিফা পদের অপব্যবহার করা হবে। সুতরাং ওটাও আমি পারবো না।" তখন আকিল বললেন— "তাহলে আমি আপনার দল হতে আমির মুয়াবিয়ার দলে যোগদান করবো।" খলিফা বললেন – "ওটা তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো, কিন্তু আমি যে কোন কারণেই নীতিচ্যুত হতে পারবো না। অতঃপর আপন ভাই আকিল কুফা ত্যাগ করে সিরিয়াতে মুয়াবিয়ার দরবারে হাজির হয়ে তাঁর দলে যোগদান করে প্রভূত সম্পদের মালিক হন। মুয়াবিয়ার নিকট 'বাইতুল মাল' ছিল আপন ধনাগার। একথা আমরা পূর্বেও সবিস্তারে আলোচনা করেছি। তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কোন নীতির ধার ধারতেন না। কিন্তু হযরত আলী ছিলেন মহান আল্লাহর আদর্শে নিবেদিত প্রাণ।

সামরিক বিভাগ ঃ

হযরত আলী ছিলেন বীরজগতের সম্রাট। তাঁর বীরত্ব আজও প্রবাদ স্বরূপ। মায়ের কোলেই যেন বীর রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে নবীর দেহ রক্ষক হলেন। হযরত আলীর জীবনে এমন কোন যুদ্ধ নেই, যে যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেছেন, এবং মহানবীর জীবনে এমন কোন যুদ্ধ নেই, যে যুদ্ধে হযরত আলী নেই। এই জন্যই হযরত আলীকে জন্মযোদ্ধা ও আমৃত্যু যোদ্ধা বলা হয়। তিনি কিন্তু কয়েকটি স্থানে পরাজয় বরণ করেছিলেন – শঠতা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, চাতুরি, ছলনা, ধোকাবাজি, ধাপ্পাবাজি ও মুনাফেকী প্রভৃতি স্থানে। এগুলোতে তিনি ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশুসম।

সাধারণভাবে তাঁর সেনাবাহিনীতে তিনটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়। অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ ও গুপ্তচর। এদের তিনি দুটো ভাগে ভাগ করেছিলেন – স্থায়ী ও অস্থায়ী, বেতনভুক ও স্বেচ্ছা বাহিনী। স্থায়ীগণ স্থায়ীভাবে বেতন পেতেন, অস্থায়ীগণ যুদ্ধের সময় বেতন পেতেন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধাও পেতেন। যে কোন একটি বাহিনীর ওপর নির্ভরশীলতাকে তিনি কখনও পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন। এই ঘাঁটি গুলো দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ ঘাঁটি ও সীমান্তবর্তী ঘাঁটি। এই ঘাঁটিগুলোর মধ্যে সৈন্য স্থানান্তরিত হতো নিয়মমত। এই সমস্ত দুর্গগুলোকে সৈন্য ও সমর অস্ত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী করা হয়েছিল। খলিফা আলী নিজেই ছিলেন চির সেনাপতি। তাই তিনি জানতেন কোথায় কি প্রয়োজন। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুবই হাল্কা গোছের ও তীক্ষ্ণ, সৈনিকদের পোশাকও ছিল হাল্কা ধরনের।

যুদ্ধ চলাকালে তিনি দ্রুতগতিশীল বাহিনীর ওপরবেশি জোর দিতেন। সেনাবাহিনীকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করতেন ডান, বাম ও মধ্য। অশ্বারোহী উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে ছবির মত পৃথক পৃথক ভাবে রাখতেন। প্রতি দশ জনে, একশো জনে, হাজারে, দশ হাজারে ও লাখে পৃথক পৃথক ভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকতেন। প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব পালন করতেন। সৈনিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান, জলবায়ু, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বেতন-ভাতা, ছুটি সকল কিছুর সুবন্দোবস্ত ছিল। সকল দুর্গেই এবং যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক মারা গেলে তাঁদের বিপন্ন পরিবারবর্গকে যথাযথভাবে সাহায্য করা হতো।

এতদ্ব্যতীত সমর ও সমর নীতি সম্পর্কে খলিফার কিছু নির্দেশও ছিল –

১। মনে রেখো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

২। আল্লাহর রহমত ব্যতীত কোন বীরই জয়লাভ করতে পারে না।

৩। সমরক্ষেত্রে মহানবীর সমরনীতিকে বিস্মৃত হয়ো না। (দ্রষ্টব্য মহানবী)

৪। যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করাটাকে মূল উদ্দেশ্য মনে করো না, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা।

৫। যখন যুদ্ধ করবে একাগ্রমনে করো, আবার বিশ্রামের সময় ঠিকমত বিশ্রাম নিও। কোনটা কোনটাকে যেন অতিক্রম না করে, দু'য়েরই প্রয়োজন আছে।

৬। যারা যুদ্ধ প্রাঙ্গণ ছেড়ে দিয়েছে, তাদের হত্যা করা অবৈধ।

৭। যে জীবন ভিক্ষা চায়, তাকেও হত্যা করা অবৈধ।

৮। কোন অসামরিক ব্যক্তিকে আঘাত করা অবৈধ।

৯। যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলেও কোন নারী, বৃদ্ধ বা শিশুকে আঘাত করো না।

১০। কোন মৃত সেনাকে রাগবশত বিকালঙ্গ করবে না।

১১। মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো না, কেননা তুমি ভয়ে যেখানেই যাবে, মৃত্যু সেখানে যেতেও ভয় করে না।

১২। বেসামরিক মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিও না, বা তাদের হতে কোন উপহার নিও না।

১৩। মুসলমানদের জীবনই একটি যুদ্ধক্ষেত্র: এই যুদ্ধক্ষেত্রে দুটো জিনিসের জন্য যুদ্ধ করতে হয়— ১। দেশ রক্ষার জন্য ও ২। আপন আদর্শ রক্ষার জন্য।

১৪। দেশ রক্ষার যুদ্ধ যতই বড হোক, আদর্শ রক্ষার যুদ্ধ তা অপেক্ষা অনেক বড়। এই জন্যই দেশ রক্ষার যুদ্ধকে জেহাদে আসগর বা ছোট যুদ্ধ, এবং আপন রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জেহাদে আকবর বা বড় যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে কখনও পরাজয় স্বীকার করো না। এ যুদ্ধের প্রতিটি বিজয়ী সেনা 'শহীদ'। যদিও তার মৃত্যু ঘটে আত্মীয় স্বজনের মাঝে আপন বিছানায়। তার শয্যাই হবে সমর, এবং সে হবে শহীদ। শহীদের জন্য দোজখের (নরক) আগুন হারাম বা অবৈধ।

স্বদেশের সিংহাসন উচ্চ করিগড়ো
এই কথা মনে রেখো, সত্য আরো বড়ো। —রবীন্দ্রনাথ

১৫। যুদ্ধক্ষেত্রকেও আল্লাহর উপাসনালয় ও বিচারাগারে পরিণত করো।

ইসলামি শাসনে দেশের ও প্রদেশের খলিফা ও গভর্নরকে একসাথে তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হতো – ১। প্রশাসনের প্রধান দাযিত্ব। ২। মসজিদের উপাসনা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব (অর্থাৎ নামাজে ইমামতি করা)। ৩। সমরে সেনাপতি হওয়া। এই জন্য বলা হয়ে থাকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানকে মুসলিম হতে হবে। কেননা তাঁকে নামাজ পরিচালনা করতে হবে। তবে মুসলিম প্রধান যদি বেনামাজী হন, তাঁর তখন প্রধান হওয়ার কোন অর্থই থাকে না।

নানা প্রতিকূল অবস্থাতে থেকেও হযরত আলী পর পর তিনটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন — জামাল, সিফফিন ও নহরওয়ান। তিনটিতেই বিজয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যদি ক্ষণচঞ্চলমতি ইরাকীগণ চরম শৈথিল্য না দেখাতো, ভীষণ উদাসীন হয়ে না পড়তো, তাহলে মহাবীর হযরত আলীর সুনিপুণ সামরিক ব্যবস্থা ও তাঁর প্রবাদতুল্য বীরত্বে, অসাধারণ বিচক্ষণতায় এবং প্রজ্ঞা ও জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞায় ইসলামের ইতিহাস নিঃসন্দেহে সারা বিশ্বের কয়েক শতাব্দীর জন্য এক অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো, যেখানে মানবতার দীপ ইসলামের প্রদীপে দীপ্ত হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয়নি, পরবর্তীকালে হয়েছিল মুসলমানদের গতানুগতিক রাজ্যবিস্তার।

তুচ্ছ করি জগতের রাজ-সিংহাসন
অক্ষত রেখেছ এক হৃদয় আসন।
যত ক্ষোভ যত দুঃখ যত রাগারাগি
যা কিছু করেছ তুমি মনুষ্যত্ব লাগি।
দেখিয়াছ তুচ্ছভরে রাজ্য ভাঙা গড়া
দেখনি মানবকুল মনুষ্যত্ব ছাড়া।
সকল বীরের বীর আলী হায়দার
পেয়েছ নবীর খেতাব শের-ই-খোদাব।

পুলিশ বিভাগ ঃ

খলিফা আলীর পূর্বে খেলাফতে পুলিশ বিভাগ বলে কোন নিয়মিত বিভাগ ছিল না। খলিফা ওমর রাত্রীকালীন পাহারার জন্য কিছু মানুষকে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে দেশে যখন অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো, মানুষ যখন মহানবীর অগ্নিযুগের পরশ হারাতে বসলো, মহানবীর প্রভাব যখন সমাজজীবনে দিন দিন দূরবর্তী হতে থাকলো, মানুষ যখন আপন ইচ্ছার দাশে পরিণত হতে থাকল, এমন কি হযরত ওসমানের খেলাফতকালে দেশে ভূ-সম্পত্তিগত যে পরিবর্তন দেখা দিল, বাইতুল মালের বিলি বন্টনে যে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিল, তাতে সাধারণ মানুষ হতে বেশ কিছু নামকরা সাহাবীগণের চরিত্রেও তাঁদের মানসিক অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এর পরিণতি ও সুদুর পরিণাম সমাজজীবনে মোটেই ভাল হয়নি। সুদক্ষ ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে হযরত ওমর যে সামাজিক চিত্র ও চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন, খলিফা ওসমানের অতিরিক্ত বদান্যতা, উদারতা ও দুর্বলতায় তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়লে পুলিশ বিভাগের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মহানবীর পূতঃ পবিত্র ভাবধারাকে ধরে রাখার

মত সামাজিক পরিকাঠামো তখন আর ছিল না। সামাজিক এই প্রয়োজনে হযরত আলীর হাতে গড়ে উঠল ইসলামি রাজ্যের প্রথম স্থায়ী পুলিশবাহিনী। সমাজের এই ক্রমবিলীয়মান অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য খলিফা আলী কেবলমাত্র পুলিশবাহিনী দিয়েই নয়, সকল দিক থেকেই জীবন-মরণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

হযরত আলীর পুলিশবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত এক শক্তিশালী বাহিনী। এই নতুন বাহিনীর দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুতর, এবং কর্তব্যও ছিলো অত্যন্ত কঠোর। খলিফা এই বাহিনীর জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বাহিনীর উদ্দেশ্যকে সমাজজীবনে সফল করার জন্য সদাই সতর্ক থাকতেন। পুলিশবাহিনীর প্রধান কাজ ছিল – দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সকল মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা। শহর থেকে সুদূর গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত এঁদের নিয়োগ করা হতো। এই বিভাগে কতকগুলো ভাগও ছিল। সমাজে কোথাও অন্যায়, অবিচার, জুলুম, অবৈধ কার্যকলাপ দেখা মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করতেন। প্রতিটি প্রদেশে এই বিভাগ প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রথম এই বিভাগের সর্বময় কর্তাব্যক্তিকে খলিফা নিজেই নিয়োগ করতেন। প্রধানকে বলা হতো 'সাহেবুশ্ শুরত' – পুলিশের সর্বাধিনায়ক। এই পদ যিনি প্রথম অলঙ্কৃত করেছিলেন, যিনি ইসলামি রাজ্যের প্রথম পুলিশ প্রধান, তাঁর নাম – মালেক ইবনে হাবীব।

হযরত আলী বাইতুল মালে হস্তক্ষেপ করে, জমিদারী প্রথা লোপ করে, সকলের প্রাপ্য অংশ সমান করে বহুজনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এবং নতুন করে স্থায়ী পুলিশ বিভাগের প্রবর্তন করেও কম মানুষের অসন্তুষ্টি অর্জন করেননি। সেদিনের পুলিশ কেবল মাত্র কতকগুলো চোর-ডাকাতকেই পাকড়াও করতো না, কোথাও কোন অপব্যয়, অপসংস্কৃতি, অপচয় ইত্যাদি দেখলেও তার আর রেহাই ছিল না। পুলিশের ওপর দায়িত্ব ছিল – সমাজের স্থাপত্যজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণী বা পশু পক্ষী জগৎ, নদী-নালা খাল-বিল প্রকৃতি জগৎ ও মনুষ্য জগতের। এই সমস্ত জগতের যে কোন একটিতে কোথাও কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গ দেখলে তাকে গ্রেপ্তার করা হতো। এবং কাজীর সম্মুখে বিচার চলতো।

হযরত আলীর প্রবর্তিত পুলিশবাহিনী মহানবীর যুগকে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও সমাজের দ্রুত ক্রমঅধঃপতনকে রুখে দিয়েছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল। গরিব দীন-দরিদ্রের ওপর ধনীর শাসানি বন্ধ হয়েছিল। এক কথায় সমাজে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিল।

বিচার বিভাগ ঃ

বিশ্ব বিচারাগারে ইসলামের বিচারপ্রথা প্রবাদতুল্য স্থান দখল করেছে। বিচার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলে –

১। "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায়বিচার কর।

২। তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।
সূরা নিসা – ৪ ঃ ৫৮, ১৩৫

৩। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সাক্ষীদানে অটল থাক, তোমরা সুবিচার কর। শত্রুতাহেতু সুবিচারের অন্যথা করো না। সূরা মায়েদা – ৫ ঃ ৮

৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও মানব কল্যাণের জন্য নির্দেশ দেন।
সূরা নহ্‌ল – ১৬ ঃ ৯০

পৃথিবীর ইতিহাসে যত ন্যায়পরায়ণ শাসক জন্মেছেন, হযরত আলী তাঁদের অন্যতম। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে জীবন দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যায়ের সাথে হাত মেলাননি। খেলাফতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় বাসা বেঁধেছিল, তার প্রতিশোধার্থে তিনি নিজ হাতেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন একজন স্বয়ং সুদক্ষ বিচারক। ন্যায়বিচারে তিনি ছিলেন চির আপসহীন সংগ্রামী মানুষ। মহানবীর সাথে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতেই যে জীবন শুরু করেছিলেন, সেই বালক জীবন আজ বার্ধক্যে ন্যায়েরই সংগ্রামে। বার্ধক্যের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়েও ন্যায়ের সংগ্রাম ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে এতটুকুও সরে যাননি। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ নির্জলা ন্যায়ের সৈনিক সত্যিই বিরল। সমগ্র জীবনে এমন একটি পদক্ষেপও রাখেননি, যেখানে ন্যায়ের কোনরূপ অবমাননা ঘটেছে। কখনও কপর্দকহীন মানুষ, কখনও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, এই সমস্ত সামাজিক উত্থান-পতন, জীবনের সুসময় বা দুঃসময়, কখনও তাঁব অটল চিত্তের, মহান হৃদয়ের জীবনের ধ্রুব লক্ষ্যের ও মহান জীবনের মহানুভবতার তিলতম পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যে কোন ঘটনারাশি তাঁর মহান জীবনস্রোতে পড়ে কুটোর মত ভেসে গেছে। এইরূপই ছিল তাঁর বিবেকজাত বিচারপ্রজ্ঞা।

ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও কাহিনীর একটিকে কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। সিফফিনের যুদ্ধে অতি ব্যস্ততার জন্য হারিয়ে যায় তাঁর অসাধারণ লৌহবর্মটি। খলিফা বহু খোঁজাখুঁজি করেও আর সেটিকে পেলেন না। একদিন হঠাৎ এক ইহুদীর শরীরে লক্ষ্য কবে তাঁকে বললেন – 'এ বর্মটি আমার, তুমি কোথায় পেলে ? ইহুদী – 'আমার শরীরে যখন আছে, তখন এটি আমারই। তখন খলিফা প্রধান বিচারপতি শরীহর দরবারে নালিশ করলেন। উভয় পক্ষ হাজির হলে বিচারপতি খলিফাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ও তাঁকে বসতে একটি আসন দিলেন। তখন খলিফা বললেন – "আমি খলিফা রূপে আপনার দরবারে আসিনি,

এসেছি বাদীরূপে। আপনি বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতি সম-ব্যবহার করলে ন্যায় কাজ হবে"। বিচারক সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

বিচার আরম্ভ হলো। খলিফা বললেন ওটা আমার বর্ম। বিচারক – "আপনার কোন সাক্ষী আছে।" খলিফা –"হাসান ও আমার গোলাম কম্বর ওটা চেনে।" বিচারক – "তাঁরা তো আপনার ছেলে ও চাকর, ও সাক্ষী চলবে না।" খলিফা হেরে গেলেন। ইহুদী বর্মটি পেয়ে গেলেন। এবার আদালতের বাইরে আরম্ভ হলো ন্যায়ের জয়। ইহুদী খলিফার নিকট হাজির হয়ে বললেন – "মাননীয় খলিফা, আপনি দেশের সর্বময় কর্তাব্যক্তি, শাহানশাহ। আপনি যদি নালিশ না করেই আমার মত একটি মানুষের গালে একটি চপেটাঘাত কষে দিয়ে বর্মটি নিয়ে নিতেন, কারো কিছু বলার ও করার ছিল না। কিন্তু আপনি তা করেন নি। বিচারে আমি জিতলাম। সেখানেও আপনি বিনা দ্বিধায় বিচার মেনে নিয়ে দরবারে ফিরলেন। এখানেও আপনি ইচ্ছা করলে আপনারই নিয়োজিত বিচারকের দ্বারা বিচার অন্যরূপ করাতেও পারতেন। তাও করলেন না। বিচারের মর্যাদা রক্ষা করলেন। আমি আপনার মত মানুষ জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। এ বর্মটি আপনারই, আপনি দয়া করে নিন। এবং আপনি দয়া করে আমাকে আপনার ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত করুন।" এবার খলিফা বললেন – "কেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে ? তোমাকে তো কেউ জোর করেনি।" ইহুদী – "আমি আপনার ধর্ম দেখে আপনার ধর্ম গ্রহণ করছি না, আমি ঐ ধর্মই গ্রহণ করছি, যে ধর্ম হযরত আলীর মত মানুষকে জন্ম দিতে পেরেছে ও গড়ে তুলতে পেরেছে। আপনি যদি অন্য ধর্মাবলম্বী হতেন, আমি সেই ধর্মই গ্রহণ করতাম।" এমনি ছিল হযরত আলীর আচরণ। বর্তমান যুগে ইসলাম দ্বারা মুসলিম চিনতে হয়, কিন্তু মুসলিম দ্বারা ইসলামকে চেনা যায় না।

বিচার বিভাগ সম্পর্কে হযরত আলী কতকগুলো নীতি নির্ধারণ করেছিলেন ঃ

১। কোরআন, হাদিস ও আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কাউকে বিচারক করা হতো না।

২। সমাজের মর্যাদাসম্পন্ন ও আস্থাভাজন না হলে কেউই বিচাবক হতে পারতেন না।

৩। রজু দৃঢ় চরিত্র ব্যতীত কেউই বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করতে পারতেন না।

৪। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান বোঝার ও তার দ্রুত মীমাংসার ক্ষমতাও থাকতে হতো।

৫। কোন তোশামোদপ্রিয় বা লোভী ব্যক্তিকে বিচারক করা হতো না।

৬। আপন ভুলকে স্বীকার করার মত মানসিকতাও ছিল বিচারকের যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি।

৭। বিচারকগণকে দরবারে খুবই উচ্চসম্মান দেওয়া হত।

৮। বিচারককে এমন বেতন দেওয়া হতো, যাতে তাঁরা নিশ্চিন্তভাবে সংসার চালাতে পারতেন।

৯। সকল বিচারককেই কোরআন ও হাদিসের মূল নীতিগুলোকে বিচারকালে স্মরণ রাখতে হতো।

১০। বিচারের আপিল হতো খলিফার দরবারে।

হযরত আলী ছিলেন ন্যায়বিচারের চির মূর্ত প্রতীক, ন্যায়ের পথে নিবেদিত প্রাণ, বিচারে অবিচলিত মানুষ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-গোত্র নির্বিশেষে সকলকেই বিচারের ক্ষেত্রে একই নজরে দেখতেন।

শিক্ষা বিভাগ ঃ

হযরত আলী নিজেই ছিলেন প্রচন্ড শিক্ষানুরাগী মানুষ, বিদ্যানুরাগী মহাজন, জ্ঞান-গরিমার গুণগ্রাহী, জ্ঞানের দরজা। তখনও আরব চরিত্র সার্বিকভাবে ইসলামের মহিমাতে মন্ডিত হতে পারেনি, তখনও আরব চরিত্র বেদুঈন অভ্যাস পরিহার করতে পারেনি, তখনও আরব চরিত্র অন্ধকার যুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তখনও আরব সমাজে খুন-জখমের খুব একটা অভাব নেই, তখনও আরব সমাজে আনুগত্যহীনতার প্রবণতায় তেমন খুব একটা ভাটা পড়েনি। আরব বেদুঈনের দুর্বার জীবন দুর্বার স্রোতেই প্রবাহিত ছিল। এর মূল কারণ ছিল আরবের আম জনসাধারণ মহানবীর নিবিড় সান্নিধ্য লাভের পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

খলিফা ধীর ও স্থির ভাবে চিন্তা করলেন এই জাতিকে পথে আনতে হলে শিক্ষা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তিনি নিজেই ছিলেন সুপন্ডিত, বাগ্মী, ভাষাবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, সবার ওপর পবিত্র কোরআনের ছিলেন অপূর্ব ব্যাখ্যাকার। পবিত্র কোরআনের সর্বমোট ৬৮৬০টি আয়াতের মধ্যে (বাক্য) একটিও আয়াত নেই, যার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ তিনি জানতেন না, যার অর্থ ও ব্যাখ্যা তাঁর নখদর্পণে ছিল না। কোরআন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান-গরিমা ছিল এমনি উচ্চাঙ্গের। এককথায় তাঁর যুগে কোরআন অনুধাবনে তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ। এবং ব্যক্তিজীবনে তার প্রয়োগে ছিল অতুলনীয় মনীষা।

খলিফা একথাও মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন যে কোরআনই ইসলামের মূল উৎস ধারা। তাই কোরআনের শিক্ষাকে তিনি অপরিসীম গুরুত্ব দান

করেছিলেন। তাঁর সময় এমন কোন মসজিদ ছিল না, যেখানে তিনি কোরআনের শিক্ষক নিযুক্ত করে অগণিত ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেননি। দু'হাজার ছাত্রকে তিনি এই শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বৃত্তি দান করেছিলেন। বড়ই দুঃখ ও অনুতাপের কথা যে তিনি মাত্র পাঁচ বছরের মত সময়কাল খলিফা ছিলেন, কিন্তু পাঁচ রাতও স্বস্তিতে নিদ্রা যেতে পারেননি। হযরত ওসমান হত্যার মিথ্যা অজুহাতে তাঁর জীবনকে অশান্তি, অরাজকতা ও ষড়যন্ত্রে দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছিল। তবুও শিক্ষানুরাগী খলিফা শিক্ষাকে ভুলতে পারেননি, বিদ্যানুরাগী আলী বিদ্যাচর্চাকে বর্জনও করতে পারেননি। এমনি ছিল তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা। দেশজোড়া এই শিক্ষাব্যবস্থা যাতে নির্বিঘ্নে চলতে থাকে তার জন্য তিনি বহু পরিদর্শকও নিযুক্ত করেছিলেন। রাজশক্তি, রাজ-আদেশ যে অনিবার্য, তারও প্রভাব তিনি শিক্ষাবিভাগে ফেলতে এতটুকুও দ্বিধা ও কার্পণ্য করেননি।

সে যুগে ইরাকের কুফা, ইসলামের রাজধানী কুফা জ্ঞানচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল, যার পশ্চাতে ছিল খলিফার প্রাণখোলা অফুরন্ত অবদান, সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য। খলিফা তথাকার জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে বিশাল এক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুললেন। বিভিন্ন বিভাগের ভার পড়লো দেশের খ্যাতনামা বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণীদের ওপর। খলিফার রাজদরবাব দেশবিখ্যাত জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশে অলঙ্কৃত হয়ে উঠলো।

বিষয়	বিভাগীয় প্রধান
১। আরবী ভাষা ও সাহিত্য	ওমর ইবনে সলমা
২। আরবী ব্যাকরণ	আবুল আসওয়াদ বিল্লী
৩। আরবী কাব্য ও তর্কশাস্ত্র	আবাদা ইবনে সমীত
৪। কোরআনের বিশুদ্ধ পাঠ	আব্দুর রহমান সলমী
৫। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা	কুমাইল ইবনে যিয়াদ
৬। অলঙ্কার শাস্ত্র ও ইতিহাস	আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
৭। কোরআন হাদিস, ধর্মীয় দর্শন	হযরত আলী
৮। মহা পরিচালক	হযরত আলী

শিশু ভাতা ঃ

হযরত আলীর পূর্বেও শিশু সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। হযরত ওমরের যুগে শিশু সাহায্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু বলতে বাধা নেই যে, এগুলো ছিল অনিয়মিতভাবে। যখন নজরে পড়তো তখন সাহায্য পেতো। হযরত আলী তাঁর খেলাফতে শিশু সাহায্যটিকে একটি নিয়মিত ধারায় এনে শিশু ভাতার প্রথম প্রবর্তন করেন। খলিফা ঘোষণা করলেন খেলাফতের সাহায্য বড়রা পেলে ছোট বা শিশুরাও

পাবে। তাঁর ঘোষণার পর হতে দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ বড়দের ন্যায় ভাতা পেতে আরম্ভ করে।

সেদিনের ইতিহাস হতে এ তথ্য জানা যায়। উম্মে আলা বলেন — "আমি যখন খুব ছোট, আমার পিতা আমাকে মহামান্য খলিফার নিকট নিয়ে গেলেন, এবং তিনি আমার জন্য ভাতা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে আবু ওবায়দা বলেন - "আমাকে আব্দুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি বললেন - তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণের পর তিনি সন্তানসহ খলিফার নিকট গমন করলে, খলিফা ঐ নবজাত শিশুর জন্য ভাতা (১০০ দিরহাম) নির্ধারিত করে দেন। এইভাবে সেদিনের সকল শিশুই খলিফার সাহায্য ও স্নেহাশীর্বাদ পেতে থাকলো। হযরত আলীর চরিত্র ছিল চিরদিনই শিশুসম, তিনি মহানবীব ন্যায় শিশুদের খুবই ভালবাসতেন। তাঁর দর্শন ছিল আজকের শিশু জগৎকে গড়ে তোলা এবং আগামীদিনেব বিশ্বকে গড়ে তোলা একই কথা।

"লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিযে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে।"

—গোলাম মোস্তফা

উপসংহার

প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল নীতি ঃ

হযরত আলী তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন কতকগুলো মূল নীতির ওপর। তিনি মনে করতেন যদি সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি প্রশাসনে নিযুক্ত না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কোন সীমা থাকবে না। যার জন্য খলিফা যখনই গভর্নর, রাজস্ব অধিকারী, বিচারক এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি বড় বড় পদগুলো পূরণ করতেন, তখন তাদের সততা, ধার্মিকতা ও যোগ্যতা খুব ভালভাবেই যাচাই করে নিতেন। অধিকন্তু এঁদের পিছনে রাখতেন গুপ্তচর বাহিনী। এই সমস্ত বিরাট পদাধিকারীগণ কখন কি করছেন, খলিফা তা জানতে পারতেন আপন পথে। তারপরই হতো পদচ্যুতি কিংবা পদোন্নতি, কখনও বা তিরস্কার কিংবা পুরস্কার। যত বড়ই হোন, রেহাই কারো ছিল না।

সতর্কতা অবলম্বন ঃ খলিফা মনে করতেন সরকারি কর্মচারীবৃন্দের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে, তারা ব্যক্তিজীবনে অধিকাংশই হবে অলস ও অসৎ এবং সাধারণ জীবনে হবে অত্যাচারী। রাজকর্মচারী ব্যতীত ও ব্যবসায়ীদের প্রতিও তার ছিল অত্যন্ত কড়া দৃষ্টি। আপন হাতে চাবুক নিয়ে বাজারে ঘুরতেন, যাতে তারা অসৎ পথে পা দিয়ে সাধারণ মানুষকে কষ্ট বা ফাঁকি না দেয়।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি অতি সাধারণ নারী সওদা বিনতে আম্মারের কথা। একদা তিনি খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন, যখন খলিফা নামাজে ছিলেন। নামাজান্তে খলিফা খুবই বিনয় সহকারে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি বক্তব্য। মহিলা রাজস্ব কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। খলিফা সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করালেন। পরে জানতে পারলেন কর্মচারী দোষী। তখন তাকে বরখাস্ত করলেন। এবং প্রার্থনা করলেন – "হে আল্লাহ্, তুমি খুব ভালই জান, আমি কোন কর্মচারীকে জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার করার জন্য কোন রকমেই উৎসাহ দিই না, বরং বারবার সতর্ক করি। আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন জনগণের প্রতি তোমার রসূলের যোগ্য খলিফা (প্রতিনিধি) হতে পারি।" হযরত আলী ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি প্রায়ই কবিতাকারেও প্রার্থনা করতেন।

অগোচরে অনিচ্ছাতে ভ্রান্তি নাহি নিও
দয়া করে ক্ষমা করে রেহাই দিও ।

২ ঃ ৩০, ২৮৬।

হযরত আলী যখন আততায়ীর হস্তে শহীদ হলেন, তখন এই মহিলাই তাঁর কবর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ্‌র নিকট যে ভাষাতে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

ন্যায়বিচারক ছিলে তুমি
আজকে আছো কবর মাঝে
হে আল্লাহ্, তোমার আশিস
আলীর পরেই শুধু সাজে।

মহান খলিফা আল্লাহ্‌র দরবারে প্রায়ই প্রার্থনা করতেন — "হে আল্লাহ্, আমাকে তুমি সকলের জন্য প্রহরী রূপে নিযুক্ত করেছ, এবং তুমি আমার প্রহরী। তুমি আমার সমস্ত কাজ সদাই লক্ষ্য করছো।"

এমনি প্রহরী তুমি মানব-অন্তরে
দিবা নাই, রাত্রি নাই, তোমার প্রহরে।

কোরআন — ২ ঃ ৭৭, ১৪০, ৩ ঃ ১১৯, ৫ ঃ ১০৯, ১১৬, ৬ ঃ ৫৯, ১০৩, ৮ ঃ ৪৩, ১১ ঃ ৫, ১৬ ঃ ৭৪, ২৯ ঃ ৪৫, ৩১ ঃ ৩৪, ৩৩ ঃ ২, ৩৯ ঃ ৭, ৫০ ঃ ১৬, ৫৭ ঃ ৬, ৫৮ ঃ ১৩, ১৮, ৫৯ ঃ ১৮, ৬০ ঃ ১, ৬৪ ঃ ৪, ৮, ৬৭ ঃ ১৩, ১৪।

শাস্তিবিধানে পরিমাপ ঃ

আমরা যে কথা বহুবার বলেছি – খলিফা আলী যখন খেলাফত নিলেন, তখন সমগ্র আরবে অরাজকতা, বাধাহীন বিশৃঙ্খলতা, ইসলামের ইতিহাস ধূলিলুণ্ঠিত, আদর্শ অবক্ষয়ের চূড়ান্তে, ঐতিহ্য রাহুগ্রাসে পতিত। তবুও কঠোর চিত্তে হাল ধরেছিলেন – ইসলামের হারানো ধনকে ফিরে পেতে। তখনকার জমানায় শাস্তির বিধান ছিল, কিন্তু শাস্তির কোন পরিমাপ ছিল না। হযরত আলীই প্রথম ইসলামে শাস্তির পরিমাপ নির্ধারণ করে দেন। এতে প্রশাসনের বিশেষ করে বিচারকগণের কাজের খুবই সুবিধা হয়েছিল।

পবিত্র কোরআনে বিধান আছে – চুরি করলে চোরের হাত কেটে দেওয়া হোক। ৫ ঃ ৩৮। কিন্তু কি পরিমাণ চুরি করলে ঐ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, তা বলা নেই। হযরত আলী ঠিক করে দিলেন – দশ দেরহামের (সে যুগে) বেশি চুরি করলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। কম করলে ঐ শাস্তি দেওয়া হবে না। মদ্যপায়ীকে চাবুক মারার বিধান ছিল, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বিধান ছিল না। খলিফা আলী ঠিক করে দিলেন – 'আশি চাবুক ঊর্ধ্ব সীমা'। মুখমন্ডল ও লজ্জাস্থানে চাবুক মারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। নারীকে প্রকাশ্যে শাস্তি নিষিদ্ধ

করেছিলেন। যে কোন নারীকে অনাবৃত করাও নিষিদ্ধ করেছিলেন – শান্তিকালীন অবস্থায়।

মহানবী একটি পথহারা জাতিকে পথে এনেছিলেন। খলিফা আবুবকর উচ্ছৃঙ্খলদের আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন। খলিফা ওমর প্রশাসনকে প্রাণদান করেছিলেন। খলিফা ওসমান রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। খলিফা আলী প্রাণহারা প্রশাসনকে আবার পুনর্জীবিত করতে নিজ প্রাণদান করেছিলেন।

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার, ক্ষয় নাই।"— রবীন্দ্রনাথ

প্রশাসন প্রণালী ঃ

হযরত আলী তাঁর শাসনে-প্রশাসনে যে দৃষ্টিভঙ্গি রেখে গেছেন, সেখানে একদিকে পাই জগদ্বিখ্যাত সম্রাটের কৃতিত্ব, জগৎ-মহাবীরের বীরত্ব, অন্যদিকে পাই মহাপুরুষের প্রাণের সাড়া, মহামানবের সহানুভূতির প্রাণের স্পর্শ। এই মহামানবটি মহানবীর মহান আদর্শে যেমন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি আপন আদর্শেও ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। খাঁটি মুসলমান খাঁটি মানবেরই পূর্ণ ছবি। এ কথা স্বার্থকতা লাভ করেছে হযরত আলীর জীবনে। তিনি এক হাতে মুসলমান, অন্য হাতে মহামানব, একহাতে মহাবীর অন্যহাতে মহাজ্ঞানী। প্রশাসনে তুলে ধরেছিলেন যেমন বীরত্বের ছবি, তেমনি জ্ঞানজগতের পরিচ্ছন্ন ছবি, যা আজও বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডারে বিশাল সম্পদ। তাঁর প্রবর্তিত প্রশাসন প্রণালীর আমরা সামান্য কয়েকটি এখানে তুলে ধরবো। যে কয়েকটি হতে সহজেই একটি সরল সত্য আপন পথে স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হবে যে, হযরত আলী মুসলমান ছিলেন, তাঁর ধর্ম ছিল ইসলাম, এটা ছিল তাঁর বাইবের রূপ, কিন্তু তাঁর ভিতরের রূপে লুকিয়ে ছিলো – একজন জগদ্বিখ্যাত মানুষ, এবং যাঁর ধর্ম ছিল মনুষ্যত্ব। কেননা যাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁরাও মুসলমান ছিলেন, এবং তাঁদের ধর্মও ছিল ইসলাম, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়নি। হযরত আলীর প্রাণে যেমন মানবতার স্পর্শ বিকশিত, প্রশাসনেও তেমনি মনুষ্যত্বের ছাপ পরিস্ফুটিত।

কর্মচারীদের প্রতি হযরত আলী ঃ

১। ব্যবহার ঃ জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের প্রতি সম-ব্যবহার করবে। মুসলমানগণ তোমার ভাই, অমুসলমানগণও তোমার মত মানুষ। অন্তরে সবার প্রতি সমান ভালবাসা রেখো। যে কোন মানুষের সাথে পশু আচরণ পরিত্যাগ করো। ক্ষমা করতে কার্পণ্য বোধ করো না। এবং আপন অপরাধে ক্ষমা চাইতেও লজ্জা বোধ করো না। সৎকাজে সৎমানুষে পুরস্কার দিতে দেরি করো না, কিন্তু অসৎ

কাজে অসৎ মানুষে শাস্তি দিতে বিলম্ব করো। অযোগ্য অক্ষমকে শুধরিয়ে নিতে চেষ্টা করো। ক্রোধকে সংবরণ করো। হিংসুকের প্রতি প্রতিহিংসায় আপন গুণরাশিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিও না। তুমি যে জনসাধারণের সাহায্যকারী বন্ধু, একথা আপন কাজের মাধ্যমে তাদের বুঝতে দিও। জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হওয়াটা সরকারি কর্মচারীবৃন্দের একটি মহৎ গুণ। জনসাধারণকে বারবার কথা দিয়ে হয়রানি ও পেরেশানির মধ্যে ফেলো না।

২। **কর্মচারী নিয়োগ ঃ** কর্মচারী নিয়োগে স্বজনপোষণ দুর্নীতি পরিহার করো। মানুষকে আল্লাহ্ যে যোগ্যতা দান করেছেন, তুমি তার মর্যাদা দিও। নচেৎ আল্লাহ্র ক্রোধে পড়বে। মানুষের রোষানলে পড়বে। যে কোন অত্যাচারীকে কখনও সরকারি কাজে নিয়োগ করবে না। যার পূর্ব ইতিহাস অত্যাচারে কলঙ্কিত, তাকে পরিহার করবে। যারা সৎ ও সত্যবাদী, যারা দয়ালু ও বিনম্র, যারা সাহসী ও নিষ্ঠাবান, তাদের স্থান আগে দাও। বিভাগীয় প্রধান (সেক্রেটারি) পদে তাদেরই নিয়োগ করবে, যারা জ্ঞানে, গুণে, আচরণে, অভিজ্ঞতায় সবার ওপরে। কখনও কাউকেও প্রথম স্থায়ীভাবে নিয়োগ করবে না। তার কর্মগুণই তাকে স্থায়ী করবে।

বেতন ঃ কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে, নচেৎ তারা কাজে অমনোযোগী হবে। কখনও বেতন কম দেবে না। প্রয়োজনের তুলনায় বেতন কম হলে চুরি করবে, এবং চুরি করা অপেক্ষা চোরকে আশ্রয় দেওয়াটা বেশি অন্যায়। কর্মচারীবৃন্দের বেতন, ছুটি ও অন্যান্য সকল বিষয়ে লক্ষ্য রেখো। সৎ ও সন্তুষ্ট কর্মচারী ব্যতীত খাঁটি প্রশাসন গড়ে ওঠে না।

গুপ্তচর বাহিনী ঃ প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুপ্তচরবাহিনী রাখবে। প্রতিটি বড় অফিসে কিছু গুপ্তচর থাকা একান্ত প্রয়োজন। যার ফলে প্রশাসন বহু বড় ক্ষয়ক্ষতি হতে মুক্ত থাকে।

জনসংযোগ ঃ কোন সরকারি বড় অফিসারই যেন জনসংযোগ না হারান। সাক্ষাৎ প্রার্থী হতে পারে গরিব, অনাথ, অসহায়, অন্ধ, খোঁড়া, নাবালক, অত্যাচারিত ইত্যাদি। এদের বক্তব্য শোনাটাই বড় কর্তব্য পালন। এদের সাহায্য করাটাই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যত্নবান হও। কোরআন বারবার মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাগিদ দিয়েছে। এতে মানব সমাজের জন্য প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। ২ ঃ ১৯, ২৭৫, ২৬ ঃ ১৮১, ২৮ ঃ ৬৯, ৫৫ ঃ ৯, ৭৮ ঃ ১১, ৮৩ ঃ ৩। আবার অসাধু ব্যবসায়ীকেও কোন ক্রমেই ক্ষমা করবে না। মহানবী এদের ক্ষমার চোখে দেখেননি। এরা সমাজের শত্রু। একটি দেশে আমদানি ও রপ্তানি যত বেশি পরিমাণ হবে, ততই দেশের ও জাতির মঙ্গল।

কৃষি ও কৃষক ঃ কৃষি-সম্পদ দেশের অন্যতম শাখা। এর প্রয়োজন সকল দেশেই সমান। কৃষিজাত বস্তু মানুষের প্রাথমিক চাহিদাকেই প্রথম পূরণ করে। খাওয়া, পরা ও বাসস্থান মানুষের প্রথম ও অপরিহার্য বস্তু। এগুলো সবই কৃষিভিত্তিক। সুতরাং প্রশাসনকে কৃষি ও কৃষকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নজর রাখতে হবে।

শান্তিময় প্রশাসন ঃ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে। কোথাও অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেন মাথা চাড়া দিতে না পারে। প্রশাসনের এক হাতে থাকবে দুষ্টের দমন, অন্য হাতে থাকবে শিষ্টের পালন।

হযরত আলীর প্রশাসন প্রণালী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত খ্রীস্টান আইনজ্ঞ মসীহ আনতকী বলেন — "আমরা মূসা ও হামুরাবী হতে যে প্রশাসন নীতি বা ধারা পেয়েছি, হযরত আলীর প্রশাসন ধারা তা অপেক্ষা অনেক উন্নতমানের। আলীর প্রশাসন দু'ভাগে বিভক্ত, শাসককুল ও শাসিতকুল। মধ্যবর্তী স্থানে আছে পবিত্র কোরআন। অর্থাৎ কোরআন ভিত্তিক মানবিক শাসন। যে শাসনে শাসক পাবে আনন্দ, শাসিত পাবে সুখ ও শান্তি। মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা আল্লাহ্‌র শাসন, এটাই ছিল আলীর প্রশাসন। ইসলামের পূর্বে কোন ধর্মই এরূপ একটি আদর্শ ও জনকল্যাণকর প্রশাসন দাবি করতে পারেনি। হযরত আলী নিজ প্রশাসনে যা প্রয়োগ করেছিলেন, তা ভবিষ্যৎ প্রশাসকদের জন্য প্রশাসনের মূল নীতিরূপে পুস্তক পৃষ্ঠায় রেখে যাওয়ার নিমিত্ত চির প্রশংসার পাত্র হয়ে আছেন ও থাকবেন।"

চরিত্র পর্বঃ

বৃক্ষের পরিচয় যেমন ফলে, মানুষের পরিচয় তেমনি আচরণে। মানববৃক্ষের কান্ডরূপ মেরুদন্ড তার চরিত্র রূপ শিকড়ের ওপর চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকে। যে শিকড়ের অদৃশ্য নির্যাস তার ব্যক্তিত্বরূপী বিবিধ শাখা-প্রশাখাতে বিচিত্র বর্ণে ও গন্ধে নানা ফুল ও ফল রূপে ফুটে ওঠে দৃশ্যময় হয়। হযরত আলী ছিলেন মানব সমাজে ঐরূপ একটি শাখাময় ফুলে ফলে সারবান বৃক্ষ।

বীরজগতে, জ্ঞানজগতে আলী ঃ

বিশ্বের ইতিহাসে এমন ব্যক্তি খুবই কম জন্মিয়েছেন, যাঁরা ছিলেন দৈহিক বলে মহাবলীয়ান, আবার জ্ঞান-গরিমাতেও মহা গরীয়ান। হযরত আলী ছিলেন এই বিরল মানুষ। মানব চরিত্রের এমন কোন গুণ নেই, যা তাঁর চরিত্রে ফুল রূপে ফুটে উঠেনি। এমনি ছিল তাঁর চরিত্রবাগ। নবী রসুল ধর্মীয় দূত প্রভৃতি না হয়েও মানুষ যে আপন চরিত্র বলে কত দূর আগাতে পারে, হযরত আলী তার একটি বিরল দৃষ্টান্ত। মহানবী বলেন – "আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও"। হযরত আলী ছিলেন ঐ গুণান্বিত পুরুষ। কোরআন বলে – "নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে

সৃষ্টি করেছি।" মহান আলী ছিলেন ঐ সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানের ধারক ও বাহক।

হযরত আলীর বীরত্ব আজও রূপ কথা ও প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে আছে। 'ইয়া আলী', 'ফতেহ আলী', 'হায়দরী হাঁক' প্রভৃতি শব্দগুলো আজও মুসলিম জাহানে, (এমনকি আনন্দবাজার পত্রিকাতেও) বীরের উপমা ক্ষেত্রে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের স্থানলাভ করে থাকে। হযরত আলী তাঁর সমগ্র জীবনে একটি যুদ্ধেও যোগদান করেননি, যেখানে পরাজিত হয়েছিলেন। মহানবীর জীবনে সকল যুদ্ধেই তিনি শরিক ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন। মিলিত যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, সকল যুদ্ধেই ছিলেন 'অজেয় বীর', তাঁর রণনীতিও ছিল অপূর্ব অতুলনীয়। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে কি করে একটি বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করা যায়, এ সুনিপুণ কৌশল তিনি জানতেন। তাঁর রণকৌশল বা রণনীতি সম্পর্কে এইটুকু শুধু বললে অবিচার করা হয়। কোন সমরে, কোন রণাঙ্গনে কখনও বীরের নীতিকে বর্জন করেননি। শত্রু অস্ত্রহীন হলে আপন অস্ত্র তুলে দিয়েছেন শত্রুর হাতে। শত্রু আশ্রয়প্রার্থী হলে অতিথির মর্যাদা দান করেছেন। কোন এক সময় মল্লযুদ্ধে শত্রু নিপতিত হলে তিনি তাঁর বুকের ওপর বসা মাত্রই শত্রু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে থুতু ছুঁড়ে দিলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। শিবিরে ফেরার পর সকলে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো – এহেন শত্রুকে ছাড়লেন কেন ? উত্তরে বলেন – "যুদ্ধ করছিলাম ইসলামের জন্য। থুতু ছোঁড়ার পর আমার ব্যক্তি আক্রোশ বেড়ে গিয়েছিল, যদি হত্যা করতাম, তাহলে ব্যক্তি আক্রোশেই হত্যা করা হত, সেটা অন্যায়, তাই ছেড়ে দিয়েছি।"

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত ছিল, সেটি তাঁর 'হায়দারী হাঁক'। যখন তিনি কোন রণাঙ্গনে হাঁক ছাড়তেন, তখন শত্রুপক্ষ তো দূরের কথা, আপন পক্ষও সম্বিৎ হারিয়ে ফেলতো। দিশেহারা হয়ে যেতো বহু বীর। এমনি ছিল তাঁর তর্জন ও গর্জন। অথচ স্বাভাবিক জীবনে যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর কণ্ঠ ছিল অতীব সুমধুর। এই বিপরীত মিলন সত্যিই বিরল বস্তু।

এক কথায় তাঁকে জন্মযোদ্ধা বলা হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক ও খাইবারের বীর যখন জীবনের পরিণত বয়সে, পৌঢ়ত্বে দাঁড়িয়ে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে যোগদান করলেন, তখন পৃথিবীর যৌবনপ্রাপ্ত বীরগণ আর একবার দেখলো – শের-ই-খোদার সেই 'হায়দারী হাঁক', ভয়াল মূর্তি, মেঘসম মেদিনী কাঁপন ভীষণ গর্জন, যেন ঝড়ের বেগে বাজপাখির ঝাপটা, যেন শৃগালের মাঝে বনরাজ সিংহের আগমন। এই সকল অবস্থাতেই তাঁর রণনীতি ছিল অতি মানবিক, মহানবীর সমরনীতিতে চির আস্থাবান সমররাজ আলী ছিলেন চির আদর্শ।

হযরত আলীর জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, মহানবী বলেন – "আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা। আলী কোরআনের সাথে, কোরআন আলীর সাথে।" হযরত ওমর বলেন — "আলীর পরামর্শ ব্যতীত আমার সর্বনাশ ঘটতো।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন – "যে কোন সমস্যার সমাধানে আলীর ন্যায় জ্ঞানী আর কেউই ছিলেন না। সকল সমস্যার তিনি ক্ষণিকেই সমাধান

সূত্র দিতে পারতেন।" সকল ঐতিহাসিক এক বাক্যে বলেন – আলী ছিলেন জ্ঞানসাগর। আলীর খুৎবা, চিঠিপত্র, জীবন-দর্শন নানা উপদেশাবলী হতে আজও যা পাওয়া যায়, তা হতে অতি সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বিচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ঃ

হযরত আলী বিচার সম্পর্কে কোরআনের উক্তি কথায় কথায় উল্লেখ করতেন। কেবল যে উল্লেখ করতেন, তাই-ই নয়, তার প্রয়োগ প্রণালী এমনভাবে নির্ধারণ করতেন, যা সাধারণ মানুষ চিন্তাও করতে পারতো না। মহানবী যখনই তাঁকে যেখানকারই গুরুদায়িত্ব ও গুরুভার দিয়েছিলেন, তিনি আপন বিবেক ও বিচারে তাঁর সঠিক সমাধান করতেন। তাঁর বিচারবুদ্ধিতে মহানবী অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি নবীবর হযরত সোলায়মানের হঠাৎ বুদ্ধির সাথে হযরত আলীর হঠাৎ বুদ্ধি, বিচার নৈপুণ্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তুলনা করা হয়। যত বড়ই আপনজন হোক, তিনি কোন অন্যায় ও অপরাধকে ক্ষমার চোখে না দেখে ন্যায়বিচারের নিরিখে দেখতেন। তাই হযরত আলীর বিচারও ছিল প্রবাদতুল্য।

যে জিনিসটি তাঁকে বিচারে অবিচল রেখেছিল, সেটি ছিল তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা। প্রথম খলিফা আবুবকরের সময় এই ন্যায়ের সৈনিক ছিলেন তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা। আবার দ্বিতীয় খলিফা ওমরের যুগেও ন্যায়কথা বলতে ও ন্যায় পরমার্শ দিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হননি। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের খেলাফতকালে যখন অনেক সময় ন্যায়নীতি ভূলণ্ঠিত হচ্ছিল, তখন তিনি সরবে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত মহান আবুজর গিফারীকে রবজ মরুভূমিতে বিদায় দিতে কারো পরোয়া করেননি। বহুবার বহু অন্যায় বরদাস্ত করতে না পেরে খলিফা ওসমানের দরবারেও প্রকম্প জাগিয়েছিলেন। ন্যায় ও নিষ্ঠাকে আপন জীবনের একান্ত ও অনিবার্য বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে ন্যায়ের জন্য ছিলেন আপসহীন সংগ্রামী মানুষ। যখন খেলাফতের পদ অলঙ্কৃত করলেন, তখন খেলাফত অন্যায় ও অবিচাবে ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত। আবম্ভ করেছিলেন অন্যায-অনাচারের বিরুদ্ধে আবার আপসহীন সংগ্রাম। যেখানে ন্যায়ের জন্য অবলীলায় ত্যাগ করেছেন সকল কিছুকে। শেষাবধি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতে অবিচল থাকতে শাহাদতও বরণ করলেন। শত ষড়যন্ত্রে, শত কুচক্রে পড়ে হযরত আলীর ন্যায় ন্যায়ের একনিষ্ঠ সাধকের যে ব্যর্থতা ভেসে উঠল, তার গভীর দেশে রয়ে গেল সমগ্র মানব সমাজের সংগ্রামী মানুষের আগামী দিনের সফলতার গোপন চাবি।

জীবন বিপন্নময় এ সত্যও জেনে
দুরাচার দুর্নীতি নাওনি মেনে।

সরল জীবন, দিনমজুর আলী ঃ

ইংরেজিতে একটি কথা আছে – Simple living high thinking অর্থাৎ সাধারণ জীবনধারা অসাধারণ চিন্তাধারা। এ কথাটির জ্বলন্ত প্রমাণ ছিলেন হযরত আলী। তিনি ছিলেন স্বভাবেসরলতায় পূর্ণ। কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, বেশভূষা সকল কিছুতেই ছিলেন অতি সরল। জাঁকজমক, শান-শওকত, আড়ম্বর-বিলাসিতা, অপব্যয়-অপচয় ইত্যাদি তাঁকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর নীতি ছিল জীবনধারণের জন্য খেতে হবে, পরতে হবে, কিন্তু নিছক খাওয়া পরার জন্য জীবনধারণ নয়। তাঁর দারিদ্র তাঁকে এই পথে নিয়ে আসেনি। নানা যুদ্ধ বিগ্রহে মাঝে মাঝে তিনি বহু ধনরত্ন লাভ করেছিলেন, কিন্তু একদিনের বেশি তা তাঁর নিকট থাকতো না, সবই গরিবদের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করে দিতেন।

মক্কাতে হিজরতের পূর্বেও ছিলেন দরিদ্র, মদীনাতে হিজরতের পরও ছিলেন দরিদ্র। ভালবাসতেন গরিবী খাবার, গরিবী পোশাক। পৃথিবীতে যে কয়েকজন মানুষ স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করে, দরিদ্রের মর্মবেদনা অনুভব করে দরিদ্র মানুষকে ভালবেসেছিলেন, হযরত আলী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পরবর্তীকালে যখন খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে দেশের সর্বাধিনায়ক হলেন, তখনও তাঁর জীবনে কোনরকমই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। সারাদিনে মাত্র দুটো শুকনো রুটি খেতেন এবং গায়ের জন্য ছিল পুরাতন দুটো মোটা-ছেঁড়া-তালি দেওয়া জামা। তাঁর সরল জীবনযাত্রা সম্পর্কে একই কথা বলে গেছেন — তিবরী, সাবিদ ইবনে গাফ্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। জুতা সেলাই, কাপড় সেলাই, কাপড় কাচা ইত্যাদি যে কোন রকমের ছোট কাজকে তিনি কখনও পরিহার করতেন না। মহানবী বলতেন - "আল্-ফাকরু-ফাখরী" – গরিবীই আমার গৌরব। পরবর্তীকালে যে দু'জনের জীবনে এই মহৎ বাণী সুমহান সার্থকতা লাভ করেছিল, যাঁরা ছিলেন এই বিশুদ্ধ বাণীর বিশুদ্ধ প্রয়োগকারী, সারা বিশ্বের সর্বকালের বিরল জীবন, তাঁরা হযরত ওমর ফারুক ও হযরত আলী হায়দার।

দিনমজুর হযরত আলী ঃ

পিতা আবু তালিব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু সচ্ছল ছিলেন না। তাই তাঁর পুত্র আলীকে লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন স্বয়ং মহানবী। তাই মক্কার মাটিতে আলী ছিলেন গরিব পিতার দরিদ্র সন্তান। তাঁকে খেটে খেতেই হতো। মহানবীর মহাদুর্দিনে আলী সদাই তাঁর পাশে ছিলেন। মদীনার মাটিতেও আলীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এমনকি খলিফা জীবনেও নিজের কোন পরিবর্তন করেননি। হযরত আলী বলেন – "মদীনাতে একদিন খুবই খিদে পেলো, কিন্তু

ঘরে কিছুই নেই। বের হলাম মজুরির সন্ধানে। এক ইহুদী মাটি ভেজাবার জন্য মজদুর খুঁজছিলেন.। আমি হাজির হলাম। সে আমাকে বললো – যত ডোল পানি তুলবে, ততটি খেজুর পাবে। আমি সম্মত হয়ে কাজ আরম্ভ করলাম। কাজ শেষে মজুরি (খেজুর) নিয়ে মহানবীর নিকট হাজির হলাম। একসঙ্গে তৃপ্তির সাথে ঐ খেজুর আমরা আহার করলাম। মহানবী আমার জন্য দোয়া করলেন। বাকি খেজুর মহানবী মহিলাদের জন্য পাঠালেন। সে খেজুর বিবি ফাতেমাও খেয়েছিলেন। তখনও আমি অবিবাহিত ছিলাম।"

"বিবাহের পর একদিন খিদের তাড়নায় স্ত্রী ফাতেমার নিকট কিছু খাবার চাইলাম। ঘরে কিছু না থাকায় তিনি বিব্রত বোধ করলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম মজদুরির জন্য। একজন বণিকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। তাঁর মাল বোঝাই বহু উট। মালগুলো সব নামালাম। গুদামে সামলিয়ে দিলাম। পরে মজুরি নিয়ে গম কিনলাম। গম নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। স্ত্রী ফাতেমা গম দেখে খুব খুশি। দু'জন মিলে গম আটা করলাম। ফাতেমা রুটি বানালেন। পরে দু'জনে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে আল্লাহ্র শোকর গুজার করলাম।" মহানবী বলেন – "আল কা'সেবো হাবিবুল্লাহ" – পরিশ্রমী আল্লাহর বন্ধু। হযরত আলী ছিলেন আল্লাহ্র বন্ধু। কোরআন বলে – "যাঁরা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই, দুঃখ নেই, চিন্তা নেই"। ১০ ঃ ৬২–৬৪। আলী ছিলেন দিনমজুর, পরিশ্রমী আল্লাহ্র বন্ধু।

দানশীল হযরত আলী ঃ

জগতের ইতিহাসে আমরা তাঁদেরকে দাতা বলে স্বীকৃতি দিই, যাঁদের দানের পরিমাণ দেখার মত। কিন্তু এ কথাটি খুবই সত্য যে, ধনীর দান ও গরিবের দানের মধ্যে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। হযরত আলী হযরত আবু বকরের ন্যায় মদীনার বুকে মসজিদে নববীর স্থান ক্রয় করার মত কোন বড় মাপের দান তুলে ধরতে পারেননি, হযরত ওমরের মত যুদ্ধাভিযানেও কোন বড় দান দিতে সক্ষম হননি, হযরত ওসমানের মত, বিরে রুমাও, (কূপ) দান করতে পারেননি। এবার আমরা একবার লক্ষ্য করবো তিনি কোন শ্রেণীর দাতা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন – "তাঁর ঘরে সবশুদ্ধ চার দিরহাম আছে। একের পর এক প্রার্থী এসে এক দিরহাম প্রার্থনা করলে, তিনি চারজন প্রার্থীকে চার দিরহামই দান করে রিক্ত হলেন।" জগদ্বিখ্যাত ইমাম শাফী বলেন – " সারাদিন এক ইহুদীর ফলের বাগান সেঁচে যা রোজগার করলেন, তা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ফকিরের চাহিদা মেটাতে সমস্তই দান করে দিয়ে রিক্ত হস্তে শূন্য হয়ে বাড়িতে ফিরে এক আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে অনাহারে রাত্রি কাটালেন।" তিনি বলেন আর একটি লোমহর্ষক ঘটনা – "একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দুপক্ষের সৈনা প্রস্তুত। হঠাৎ

শত্রু শিবির হতে একজন এসে হযরত আলীর নিকট একটি তরবারি প্রার্থনা করলে তিনি কালবিলম্ব না করেই আপন তরবারিটিই তার হাতে দিয়ে দিলেন। তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আলী, আপনি কি দিয়ে যুদ্ধ করবেন ? তখন তিনি উত্তর দিলেন – "আগে প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হয়, তবে আল্লাহ্ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।" এখন আমরা হযরত আলীর জীবনে একটি আকর্ষণীয় দানের কথা উল্লেখ করবো। একবার মহানবী একটি যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে এসে যুদ্ধলব্ধ ধন সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে অভিযানের প্রয়োজন হলে মহানবী সকল সাহাবীকে ডাক দিলেন। এবং সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন – তাদের নিকট কত কি জমা আছে। সকলেই বললেন – যৎকিঞ্চিৎ জমা আছে, বাকি খরচ হয়ে গেছে। সবশেষে আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন। আলী বললেন – 'আমার যৎকিঞ্চিৎ খরচ হয়েছে, বাকি সবই জমা আছে। মহানবী বললেন – 'সে কি' ? এবার উত্তরে আলী বললেন – "আপনি আমাকে ঐ দিন আমার অংশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ওগুলো আর বাড়ি ফিরে নিয়ে যাইনি, পথিমধ্যে গরিব মানুষদের বিলিয়ে দিয়ে খালি হাতে অতি সামান্য নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। সুতরাং আমার সব মালই 'অখেরাতের জন্য জমা' আছে। কিঞ্চিৎ খরচ করেছি।" হযরত আলীর এই উত্তরে সকল সাহাবীই বিস্ময় বোধ করলেন, স্বয়ং মহানবী মুগ্ধচিত্তে তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ-

হযরত আলী ছিলেন সেই ক্ষয়হীন অক্ষয় অমর দাতা।

সদ্ব্যবহারে আলী ঃ

হযরত আলীর বিনীত ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। গর্ব, অহঙ্কার, দর্প, আত্মশ্লাখা কোনদিনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সারাজীবন একই ছিলেন, অতি অমায়িক। এমনিতেই যাঁরা জগদ্বিখ্যাত বীর, তাঁদের ক্রোধটা কম থাকে, তাঁরা সাধারণত মাটির মানুষ হয়ে থাকেন, অর্থাৎ অতি ভদ্র। হযরত আলীর খেলাফত ছিল দুর্যোগপূর্ণ। এই চরম অশান্তিতেও তিনি কোনদিনই মেজাজ হারাতেন না। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেরই সাথে নরম মেজাজে কথা বলতেন। মানুষের আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে তিনি সকলকে কোরআনের দুটো কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

১। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, ও দীন-দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে। ২ ঃ ৮৩।

২। আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি (মহানবী) তাদের (মানুষের) প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছিলে যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে স'রে পড়তো। তুমি তাদের ক্ষমা কর, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" ৩ ঃ ১৫৯।

হযরত আলী আমৃত্যু ছিলেন অতিথিপরায়ণ। এমনকি কয়েকদিন যাবৎ তাঁর গৃহে কোন অতিথি না আসলে তিনি ভয় করতেন বোধহয় আল্লাহ্ তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছেন। তিনি অতিথি আগমনকে আল্লাহ্‌র রহমত আগমন মনে করতেন। সমগ্র আরবে হযরত আলীর অতিথিপরায়ণতা ছিল প্রবাদতুল্য, যদিও তিনি ছিলেন দরিদ্র ব্যক্তি।

শালীনতা ও শিষ্টাচার হযরত আলীর জীবনকে করে ছিল বড়ই সম্ভ্রমময়। হযরত ওমর বলতেন – "আলী একজন রুচিবান পুরুষ। জীবনে কখনও কাউকেও কটুবাক্য বলতেন না, যখন খেলাফত নিয়ে মহা ঝামেলা বেধে গেল, তখন আমির মুয়াবিয়া বহু মানুষ নিয়োগ করেছিলেন – কেবলমাত্র হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের নিন্দা ও কুৎসা রটনার জন্য। এমনকি অনেকে এর প্রতিবাদ করায় মুয়াবিয়' তাদের প্রাণদণ্ড দিতেও কুসুর করেননি। এ হেন জঘন্যতম পরিবেশেও হযরত আলী কোনদিনই কারো সম্পর্কে একটিও কটুবাক্য মুখ দিয়ে বের করেননি। আজ কোথায় মুয়াবিয়ার রাজধানী দামেস্ক, কোথায় সিরিয়াবাহিনী, কোথায় তার কুচক্রী পারিষদবর্গ। কিন্তু মহানবী তথা হযরত আলীর বংশধরগণ সারা বিশ্বে আজও সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের মত শুভ্র। হযরত আলীর শালীনতা, ভদ্রতা, বদান্যতা, অমায়িকতা, সাধুতা, ও সরলতা আজও বিশ্ব মানবের গর্বের বস্তু।

কোরআন ও হাদিস শাস্ত্রে আলী ঃ

হযরত আলী ছিলেন কোরআনের অন্যতম ও প্রধান ওহী (প্রত্যাদেশবাণী) লেখক। তিনি নিজেই বলেছেন – "কোরআনের এমন কোন আয়াত (বাক্য) নেই, যার অবতীর্ণ কারণ ও তাৎপর্য আমি জানি না।" তিনি প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশদভাবে জেনে নিয়েছিলেন স্বয়ং মহানবীর নিকট হতে। কোরআনের অন্যতম ব্যাখ্যাকার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন – "আমি সত্তরটি সূরা মহানবীর নিকট শিখেছি, বাকিগুলো হযরত আলীর নিকট।" কোরআনের আর একজন খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন – "কোরআনের উত্তম ব্যাখ্যাকার আলীর ওপর কেউ নেই।" স্বয়ং নবীজী বলেন – "কোরআন আলীর সাথে আলী কোরআনের সাথে"। মহানবীর তিরোধানের (৬৩২) পর হযরত ওসমানের

শাহাদাত (৬৫৬) পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ২৪ বছর আলী একটানা জ্ঞানসাধনা করেন। এই জন্যই পরবর্তী যুগের অধিকাংশ জ্ঞানীগণই পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে তাঁরই ছাত্র ছিলেন।

এটা বলাও নিষ্প্রয়োজন যে, হাদিস শাস্ত্রে হযরত আলীর জ্ঞানগরিমা ছিল তুলনাহীন। তিনি যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, তার নাম সহিফা। যদিও সেখানে পাঁচশো হতে ছশোর বেশি হাদিস নেই। তবুও মহানবীর একান্ত স্নেহধন্য আলী মহানবীর কথাবার্তা, কার্যকলাপ সম্পর্কে কতখানি সুপরিচিত ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আলীর তিরোধানের পর মুয়াবিয়া হতে ওয়ালিদ পর্যন্ত উমাইয়া খেলাফত ছিল হযরত আলীর বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা রটানোর একটি সাজানো মঞ্চ। এই সমস্ত নানা রাজনৈতিক কারণে তাঁর কাজগুলো তখন সমাজে তেমন সম্মান ও স্থানলাভ করেনি।

ধর্মশাস্ত্রে আলী ঃ

তিনি বলতেন -- "আল্লাহকে স্মরণ করো দুভাবে, এক তিনি মহাবিচারক, অসীম শক্তির আধার, দর্শনকর্তা ও শ্রবণকর্তা, সবার ওপর অন্তর্যামী। শুধু এইগুলো মনে রেখো না, তাহলে তুমি তোমার ভারসাম্য হারিয়ে হতাশায় ভুগতে থাকবে, মানসিক ভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাঁকে অন্যভাবেও দেখো– পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, ক্ষমাকারী, যাঁর দয়ার কোন শেষ নেই। মানুষের গোনাহ বা পাপ যতই হোক, তাঁর দয়া তা অপেক্ষা অনেক বেশি বড়। মনের মধ্যে সদাই এই দ্বিভাব বজায় রাখতে হবে, তবেই তুমি ঠিক থাকতে পারবে।"

তিনি আরো বলেন – "ধর্মকে নিষ্প্রাণ বা আনুষ্ঠানিক করো না। অনুষ্ঠান বা অনুশাসনে আল্লাহ নেই। তিনি আছেন তোমার অন্তরে। নিবিড়ভাবে তাঁকে ভালবাসো, তাঁকে ভালবাসাব পূর্বেই তার সৃষ্টিকে ভালবাসো। আপন অন্তরে বা অনুভূতিতে প্রেম ও ভালবাসা না জাগলে প্রার্থনা হবে প্রাণহীন। প্রাণহীন প্রার্থনার কোন মূল্য নেই।" তিনি তাঁর আপন প্রার্থনাতে এমনিভাবে মগ্ন হতেন, সেখানে জাগতিক ও দৈহিক কোন অনুভূতি আর থাকত না। তিনি বিবশ ও অবশ হয়ে যেতেন। শরীরে তীর মারলে বা শরীর হতে তীর বের করলে কিছুই বুঝতে পারতেন না। এমনি ছিল হযরত আলীর এবাদত বা আরাধনা।

সাহিত্য জগৎ ও আলী ঃ

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আরব সাহিত্যের দিক পরিবর্তন হলো। সাহিত্য ঠিকই ছিল। কিন্তু তা ছিল বাগাড়ম্বর ও অশ্লীলতায় ভরপুর। আরবী সাহিত্যের

দিক পরিবর্তনে যাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি, তিনিই হযরত আলী। গদ্যে পদ্যে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। এককথায় হযরত আলী ছিলেন স্বভাব কবি। আরবী ব্যাকরণ তাঁরই আবিষ্কার। স্বয়ং মহানবী তাঁর বাগ্মিতার প্রশংসা করতেন। কি ধর্মক্ষেত্রে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি সাধারণ সমাবেশে তিনি বিশাল জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় আটকিয়ে রাখতে পারতেন। তাঁর লিখিত বস্তুগুলো আজও বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অমূল্য সম্পদ।

উপসংহার ঃ

হযরত আলী শাহাদত বরণ করেছেন। মুয়াবিয়া মনের সুখে দামেস্কতে রাজত্ব করছেন। একদিন তিনি আলীর অতি নিকট বন্ধু জারার আসাদীকে দরবারে ডাকলে আসাদী ভাবলেন মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই। যাই হোক, রাজ আদেশ অনিবার্য। আসাদী শত দ্বিধায়, কম্পমান বক্ষে মুয়াবিয়ার রাজদরবারে হাজির হলে আমির মুয়াবিয়া তাঁকে নির্দেশ দিলেন আলীর কিছুটা স্তুতি কীর্তন করতে। আসাদী হতভম্ব হয়ে গেলেন। নীরব, নিশ্চল, পাথর-সম দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবলমাত্র চিন্তা করছেন বিড়াল ইঁদুরকে কিছুক্ষণ খেলাচ্ছে মাত্র। যাই হোক,আমির বলতে থাকেন – 'বলুন'। আসাদী ভাবতে থাকেন ভবলীলা সাঙ্গ হতে আর দেরি নেই। শেষাবধি আমির জোরাজোরি করতে থাকলেন। তখন আসাদী মৃত্যুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুনিশ্চিত জেনেই মনে মনে স্থির করলেন মরণের আগে প্রাণভরে হযরত আলীর গুণগান করে যাবেন।

আরম্ভ করলেন গুণগান। আমাদের এই চরিত্র পর্বে আমরা যা কিছু সংক্ষেপে হযরত আলী সম্পর্কে আলোচনা করলাম, আসাদী তার বিস্তাবিত বিবরণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলে যেতে থাকলেন। পরিশেষে দেখছেন আমির মুয়াবিয়ার দুগাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত। আসাদী আবার হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এবার হযরত আলীর চির দুষমন আমির মুয়াবিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে, ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন – "হে আল্লাহ্! তুমি আবুল হাসানের (হাসানের পিতা আলী) ওপর তোমার অনন্ত রহমত বর্ষণ করো। হে আসাদী! আপনি এতক্ষণ যা বললেন, তা একেবারেই সত্য। আলী ঐরূপই ছিলেন। আল্লাহর কসম, আলী অতীব উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন।"

হযরত আলীর চরিত্র সম্পর্কে এ অপেক্ষা আর বড় প্রশংসার কথা কি হতে পারে!

পারিবারিক জীবন ও পরিজনবর্গ

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ঃ

হযরত আলীর বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট নয়জন স্ত্রী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী মহানবীর প্রাণপ্রিয় কন্যা বিবি ফাতেমা। সর্বমোট সন্তানসন্ততি একত্রিশজন। পুত্র চোদ্দজন, কন্যা সতেরো জন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শৈশবে মারা যান। অধিকাংশের মতে, তাঁর বংশধর প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচ পুত্রের দ্বারা বিস্তারিত হয়েছিল– ১। ইমাম হাসান, ২। ইমাম হোসেন, ৩। মহম্মদ হানাফিয়া ৪। আব্বাস ৫। ওমর। তবে মুসলিম সমাজে''সৈয়দ' বলতে কেবলমাত্র নবী-তনয়া বিবি ফাতেমার গর্ভজাত সন্তানদেরই বলা হয়ে থাকে।

	স্ত্রী	পুত্র	কন্যা
১।	খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জোহরা	১। ইমাম হাসান ২। ইমাম হোসেন ৩। মোহসীন	১। রোকাইয়া ২। উম্মে কুলসুম ৩। জয়নাব
২।	হাজাম কালবিয়া কন্যা উম্মুল বানিম	১। জাফর* ২। আব্বাস ৩। আব্দুল্লাহ ৪। ওসমান	
৩।	মাসউদ কন্যা লাইলা	১। ওবাইদুল্লাহ* ২। আবুবকর	
৪।	আনিস কন্যা আসমা	১। আসগর* ২। ইয়াহইয়া	
৫।	আবুল আস কন্যা ইমামা	১। মহম্মদ আওসাত*	
৬।	জাফর কন্যা খাওলা	১। মহম্মদ হানাফিয়া*	
৭।	রাবিয়া কন্যা সহবা	১। ওমর	১। রোকাইয়া
৮।	ইমরুল কায়েস কন্যা* উম্মে সাইদ মহিরাত		১। কন্যা, নামকরণের পূর্বেই মৃত্যু হয়
৯।	ওরুয়া কন্যা* উম্মে সাইদি		১। উম্মুল হাসান ২। রোমলা কোবরা

পুত্রগণ ঃ

ইমাম হাসান হযরত আলীর প্রথম সন্তান। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। পিতার শাহাদত বরণের পর ছ'মাস খেলাফত পরিচালনা করে আমির মুয়াবিয়ার সাথে রাতদিন খুনোখুনি, ঝগড়া, বিসম্বাদ পরিহার করে এক নির্দিষ্ট ভাতার পরিবর্তে খেলাফত ত্যাগ করেন। এবং পিতার রাজধানী কুফা ত্যাগ ক'রে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরে আমির মুয়াবিয়ার চক্রান্তে আপন স্ত্রী কর্তৃক বিষ প্রয়োগে নিহত হন। এই বিবাহটিও হয়েছিল মুয়াবিয়ার চক্রান্তে। ছোট ভাই ইমাম হোসেন কারবালা মরুপ্রান্তরে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়োজিদের ইরাকী গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সেনা সিনান বিন আনাস্ নাখ্য়ী কর্তৃক অতীব নৃশংসভাবে নিহত হন।

দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্রগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ব্যতীত বাকি তিনজনই ইমাম হোসেনের সাথে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন। তৃতীয়া স্ত্রীর দুই পুত্রও ঐ একইভাবে শহীদ হন। চতুর্থা স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্রও ঐ ভাবেই শহীদ হন। পঞ্চমা স্ত্রীর পুত্রটি স্বাভাবিক ভাবেই মারা যান। ষষ্ঠা স্ত্রীর পুত্র মহম্মদ হানাফিয়া বীর ছিলেন। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে দারুণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে হজের সময় একবার খেলাফতের পতাকাও উত্তোলন করেছিলেন। পরে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের সাথে সংঘর্ষে পরাজয় বরণ করে তায়েফে গমন করলে সেখানে মারা যান। সপ্তম, অষ্টম ও নবম স্ত্রীর পুত্রগণ স্বাভাবিকভাবে মারা যান।

কন্যাগণ ঃ

বিবি ফাতেমার গর্ভজাত তিন কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যা রোকাইয়া শৈশবেই মারা যান। দ্বিতীয়া কন্যা উম্মে কুলসুমের সহিত দ্বিতীয় খলিফা ওমরের বিবাহ হয়। হযরত ওমরের ঔরসে পুত্র যায়েদ ও কন্যা রোকাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমরের শাহাদত বরণের পরও বিবি উম্মে কুলসুম পর পর আরো তিনবার সম্ভ্রান্ত ঘরে বধূ রূপে গমন করেন। তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক, কারণ তিনি ছিলেন স্বয়ং নবীর নাতনী এবং ফাতেমার কন্যা। তৃতীয় কন্যা জয়নাবের বিবাহ হয় আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে। তিনি স্বামীর জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন।

স্ত্রীগণ ঃ ঃ

হযরত আলীর স্ত্রীগণের মধ্যে পঞ্চমা স্ত্রী ইমামা ছিলেন স্বয়ং মহানবীর জ্যেষ্ঠা তনয়া হযরত জয়নাবের কন্যা। অর্থাৎ মহানবীর নাতনী। ষষ্টা স্ত্রী খাওলা ছিলেন হানাফিয়া গোত্রের মেয়ে, তাই তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে মহম্মদ হানাফিয়া বলা হতো।

আমরা এখানে চোদ্দজন পুত্রেরই নাম পেলাম। কিন্তু সতেরো জন কন্যার মধ্যে সাতজনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে। বিবি ফাতেমার জীবিতকালে হযরত আলী কোন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। তাঁর পরলোক গমনে একের পর এক পর পর নয়টি দার পরিগ্রহণ করেছিলেন।

কাব্যে হযরত আলী

সদাই নবীর সাথে যেজন সর্বদা
মহান হযরত আলী শের-ই-খোদা।
রাখিতে আপন হাতে রাজ্য খেলাফত
ধরো নাই কোনদিন অসতের পথ।
বলি দিয়ে তব নীতি, তব দরবারে
ডাক নাই দুষ্টজনে তুষ্ট করিবারে।
স্বার্থপর সুবিধাবাদী খুঁজিছে আশ্রয়
তোমার মহান দ্বারে পায়নি প্রশ্রয়।
অকাতরে দিলে প্রাণ পামরের হাতে
সন্ধি তবু কর নাই দুর্নীতির সাথে।
অন্যায় ষড়যন্ত্র গোপন আঘাত
একটি মহান বীর করিল নিপাত।
সমরে সংসারে পেলে বিধাতার বর
ধর্মেতে কর্মেতে ছিলে তাসউফের জড়।
সমরে উড়িতে তুমি বাজপাখি রূপে
টিকে নাই কোন বীর তোমার ধূপে।
যখনই যাহার কাজে সঙ্কট নামে
'ফতেহ আলী' উচ্চারিত তোমারই নামে
রাখিতে বিশাল রাজ্য আপনার হাতে
সন্ধি কভু করো নাই অসতের সাথে।
যত ক্ষোভ যত দুঃখ যত রাগারাগি
মানুষের মানবতা মনুষ্যত্ব লাগি।
অক্ষত রেখেছ এক হৃদয় আসন।
তুচ্ছ করি জগতের রাজসিংহাসন।
তোমারে করিতে খুন, করিল অক্ষম
ইসলামের গণতন্ত্র করিল জখম।
ধরেছিলে যেই পথ যেই মহাগতি
একদিনও ছাড় নাই নবীর নীতি।

প্রলোভনে পড়ে শুধু বাড়াল ফ্যাসাদ
"মুয়াবিয়া-মুগিরা-উক্‌বা-আমর-যিয়াদ"
পেয়েছিলে মহাগুণ মহান জিন্দেগি
আজও প্রবাদ সম তোমার 'বন্দেগি'।
বীরত্বে রেখেছ তুমি এমনি সম্ভ্রম
শত্রুর বুকেতে চেপেও নাহি ব্যতিক্রম
সকল বীরের বীর আলী হায়দার
পেয়েছ নবীর খেতাব "শের-ই-খোদার"।
বলেন দ্বীনের রসূল, দ্বীনের হাদী
মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হবে তার সাদী।
যার ঘরে চান তিনি, বলেন নবী
বধূ রূপে যাবে যেন ফাতেমা বিবি।
নবীর এতই প্রিয় ছিলে দিনরাত
জীবনসঙ্গিনী হলেন 'খাতুনেজান্নাত'।
সমগ্র জীবনে যাঁর নাই জোড়াতালি
মুসলিম জাহানে তিনি হযরত আলী।
চন্দ্র ও সূর্যের আলো ধরণী ধরে
মনুষ্যত্ব মানবতা তব চরিত্র' পরে।
দেখিয়াছ তুচ্ছ ভরে রাজ্য ভাঙাগড়া
দেখনি মানবকুল মনুষ্যত্ব ছাড়া।
দেখিয়া মহান নবী তব 'ইনসানিয়াৎ'
দিলেন তোমার হাতে 'খাতুনে জান্নাৎ'।
সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী মহম্মদ
সকল সূফীর শ্রেষ্ঠ আলী প্রেমাস্পদ।
মহান নবীর পর শ্রেষ্ঠ স্থান যার
'জ্ঞানের দরজা' তিনি আলী হায়দার।

পরিশিষ্ট ১

ন্যায়পরায়ণ সৎ খলিফাগণের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক চিত্র

খলিফা ঃ

খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। কোরআন বলে – "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।" ২ ঃ ৩০। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেছেন– তিনি তাঁর সৃষ্ট জগৎকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন, যে প্রতিনিধি তাঁর পরিবর্তে তাঁর হয়ে জগৎকে পরিচালনা করবেন। মহানবী মহম্মদ (দঃ) ছিলেন আল্লাহর সেই মহান প্রতিনিধি। মহানবীর পূর্বে বহু নবী এসেছিলেন, তাঁরা একের পর এক প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। মহানবী শেষ নবী। আরও কোনও নবী আসবেন্ না। কোরআন বলে "মহম্মদ (দঃ)তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষেব পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহ্র রসুল (দূত) এবং শেষ নবী।" অর্থাৎ তিনি রসুলদেরও শেষ ও নবীদেরও শেষ। তাই মহানবী বলেন–"তোমাদের পূর্বে বনি ইসরাইল গোত্রের নবীগণ নেতৃত্ব দান করেন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তখন একজন নবী অপর একজন নবীর স্থলে স্থলাভিষিক্ত রূপে আগমন করতেন। কিন্তু যেহেতু আমিই আল্লাহ্ব সর্বশেষ প্রেরিত নবী, তাই এবার আমার পর তোমাদের মধ্য হতেই খলিফাগণ (প্রতিনিধিগণ অর্থাৎ নির্বাচিত ব্যক্তিগণ) রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।" সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন মহানবীর পরবর্তী খলিফাগণ। খলিফা কোন রাজশক্তির অধিকারী ছিলেন না। বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতেন এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজ্য ও সমাজ পরিচালনা করতেন। খলিফা এখানে জনগণের প্রতিনিধি রূপেই জনগণকে পরিচালিত করতেন। আর মহানবী আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে জনগণকে পরিচালিত করতেন।

খেলাফত ঃ

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) মাত্র দশ বছর সময়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রজাতন্ত্র বিশ্বের বুকে মদীনায় স্থাপন করে গেলেন, তা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। আমীর আলী বলেন – "এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে কার্য সম্পাদন করেন তা আজ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে লিপিবদ্ধ অত্যাশ্চার্য কীর্তিসমূহের অন্যতম বলে চির অম্লান থাকবে।" মহানবী এক দিগ্বীজয়ী বীরের ন্যায় শুধু একটি রাজ্য স্থাপন করে যাননি। রাজ্য স্থাপন মহানবীর পেশাও ছিল না, নেশাও ছিল না। তাঁর পেশা ছিল– আল্লাহর বাণী

কোরআন প্রচার। এবং নেশা ছিল–মানব জাতির উত্থানে মদৎ দেওয়া। এই মানব জাতির উত্থানের জন্য, মানবতার বিকাশের জন্য যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁকে শাসনে, শৃঙ্খলায়, আচারে-বিচারে, আইনে-কানুনে, নীতিতে-রীতিতে, আদেশে-উপদেশে, প্রয়োগে পদ্ধতিতে একটি সুশোভিত উদ্যানে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই উদ্যানের মালিক। পরবর্তীকালে পর পর চারজন অতীব যোগ্যতম মালীর আবির্ভাব ঘটে। এই চারজনকে বলা হয় 'খোলাফায়ে রাশেদীন'– অর্থাৎ সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ। এই চারজন তাঁদের সময়ে সমাজ-জীবনের সকল শাখায় যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন--তা বর্ণনাতীত,তা বিশ্ব-শান্তির একমাত্র পথ ও পন্থা, তা মানব-সমাজকে সৎপথে পরিচালিত করার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তা সমস্যা বিজড়িত বিশ্বকে বিপদ-মুক্ত করার অনুপম দিক, তা সমগ্র মানব সমাজকে ভাই বলে ডাকার অভ্রান্ত পথ। এরই নাম, ইসলামের খেলাফত।

সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ঃ

মহানবী (দঃ) তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ্ প্রেরিত ওহীর ভিত্তিতে সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বীজ বপন করে যান। তবে এই গণতন্ত্রকে ইংরাজীতে বলা হয় Theocracy। যে তন্ত্রে বা গণতন্ত্রে আল্লাহর বিধানে মানুষ পরিচালিত হয়, তার নাম Theocracy। এবং যে তন্ত্রে বা গণতন্ত্রে মানুষ রচিত বিধানে মানুষ পরিচালিত হয়, তাকে বলা হয় Democracy। মহানবী বিশ্বস্রষ্টার বিধানে বিশ্ব মানবকে চলার বিধি-বিধান দান করে যান। কেননা এই বিধানে কোন অদূরদর্শিতা, কোন অজ্ঞতা, কোন জটিলতা বা দুর্বলতা, কোন অক্ষমতা, কোন নিকট বা সুদূরপ্রসারী ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে না। কিন্তু মানুষ রচিত যে কোন বিধান ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। কেননা ভুল মানুষের চিরসঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষের চিরসাথী । তাই মানুষের জন্য আল্লাহব দূত মহানবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন–আল্লাহ্-প্রদত্ত নীতি বনাম সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র। তাঁর পরবর্তী চারজন সৎখলিফা এটাকে অতি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করেন। যে বীজ মহানবী একদিন রোপন করে গিয়েছিলেন তা এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হল–তাঁর চার খলিফার নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও তিতিক্ষা বলে।

নেতা কেমন হওয়া দরকার, নেতার আচরণ কেমন হওয়া দরকার, তা সূর্যের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে চার খলিফার চরিত্রে, দৈনন্দিন কাজে। এক হাতে রাজ্য, অন্য হাতে ধর্মকে ধারণ করে কিভাবে মানব মণ্ডলীকে পথ দেখান যায়, কিভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করা যায় চার খলিফার চরিত্র তার চির জ্বলন্ত প্রমাণ।

মজলিস-উস-শুরা, সংসদ বা মন্ত্রণা পরিষদ ঃ

স্বয়ং আল্লাহ বলেন–"কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, এবং তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর"। কোরআন সুরা ইমরান ৩ ঃ ১৫৯। মহানবী ছিলেন এই কোরআনের যথার্থ প্রয়োগকারী। তিনি তাঁর জীবনে যথার্থ ভাবে এ কথার প্রয়োগ করে গেছেন। যখনই যে কোন কাজ তিনি করতেন, সাথে সাথে সাহাবীদের (সঙ্গী) ডাক দিতেন, পরামর্শ করতেন, এই পরামর্শ সভাকেই মজলিস্-উস্-শুরা বলা হত। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন, ডাক দিলেন– মোহাজেরীন ও আনসারদের। বলা বাহুল্য, এই 'শূরা'তে শুধু যে মুসলমানই থাকতেন তা নয়, সেখানে আস্, খাজরাজ ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকতেন এবং সকলে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। মহানবীর এই সভা বসত মদীনার মসজিদে। আল্লাহর ঘরকে তিনি সভার ঘরে পরিণত করেছিলেন। আল্লাহর দরবারকেই তিনি মানুষের মীমাংসা দরবারে পরিণত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীন এই শূরাকে মহাশক্তিশালী সভায় পরিণত করেন। বিশেষ করে হযরত ওমর বলতেন–"পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত চলতে পারে না।" এই শুরা আপন দেশ হতে বিজিত দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা, যুদ্ধ-ব্যবস্থা গভর্নর নিয়োগ, সৈন্যদের বেতন, খলিফার ভূমিকা ইত্যাদি সকল বিষয়ে খলিফাকে পরামর্শ দান করত। এই শুরার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল–যে কোন সাধারণ মানুষ পর্যন্তও শূরাকে পরামর্শ দান করতে পারত। এমন কি, বিজিত অঞ্চলসমূহে সেখানকার জনগণের সাথে পরামর্শ না করে জোরপূর্বক তাদের ঘাড়ে কোন কিছুকেই চাপিয়ে দেওয়া হত না। মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মজলিস-উস-শূরাকে চার খলিফা পূর্ণ মর্যাদা দান করেন, বিশেষ করে হযরত ওমর তার গৌরব বৃদ্ধি করেন। সুতরাং এই শুরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে--ইসলাম একনায়কত্বের পূর্ণ পরিপন্থী, স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারিতাকে সে পাপ বলে গণ্য করে। রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র কোরআনের সম্পূর্ণ মোখালেফাৎ বা বিরুদ্ধ। যদিও বহু মুসলিম দেশে রাজতন্ত্র সগৌরবে মাথা তুলে আছে। কিন্তু ইসলামের বিধান তা নয়।

প্রশাসনিক বিভাগ ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় শাসন ও সামরিক কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের প্রদেশ নামে অভিহিত করা হত। যেমন বাইরাইন ও আহওয়াজ ছিল একটি প্রদেশ। সিজিস্তান, মেকরান ও কিরমান অন্য একটি প্রদেশ, তাবারিস্তান, খোরাসান এবং উত্তর পারস্য একটি প্রদেশ, ইরাকের কুফা ও বসরা বিভিন্ন দুটো প্রদেশ। বায়জানটাইনদের অধিকৃত

অঞ্চলসমূহকে কয়েকটি জুনদ বা সামরিক প্রদেশে বিভক্ত করেন। যেমন–হিম্‌স্‌, দামেস্ক, গ্যালিলী হতে সিরিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত অঞ্চল উরদুশ বা জর্দান নামে পরিচিত ছিল। তাছাড়া, ছিল–ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইন। হযরত ওমরের শাসনকালে মিশর বিজিত হলে সমগ্র দেশটিকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। রোমানদের সময় মিশরের যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, হযরত ওমর তাব বিশেষ কিছু রদবদল করেননি।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা ঃ

হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ড নবীদের সাথে যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় প্রশাসনকে খুব একটা ভাল মত সাজিয়ে তোলার সময় পাননি। তখন ইরাক-ইরান ও রোমকদের সাথে তাঁকে অবিরাম যুদ্ধে রত থাকতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে হযরত ওমর সেই ইসলামি শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে তুললেন। যার জন্য হযরত ওমরকে ইসলামি রাজ্যের ও শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর রাজ্যকে সর্বমোট ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। যথা–মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাযিরা, বসরা, কুফা, মিশর, ফিলিস্তিন, ফারস, খোরাসান, কিরমান, মেকরান, সিজিস্তান ও আযারবাইজান ইত্যাদি। প্রতিটি প্রদেশে একজন যোগ্যতম ব্যক্তিকে ওয়ালী বা গভর্নর রূপে নিযুক্ত করতেন। এই নিযুক্তিকরণ তিনি এককভাবে করতেন না। মজলিস-উস-শূরার পরামর্শ মত তিনি কাজ করতেন। দেশের বিশেষ ব্যক্তিগণকে নিয়ে ঐ শূরা গঠিত হত। গভর্নরগণ আপন আপন কাজের জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। গভর্নরদের উপর একদিকে ধর্মীয় দায়িত্ব অন্যদিকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকত। এমন কি, অনেক সময় তাঁকে সামরিক দায়িত্বও পালন করতে হত। শুধু কাজী ও রাজস্ব সচিব পৃথকভাবে দায়ী থাকতেন খলিফার নিকট। ন্যায়বিচারের জন্য হযরত ওমর বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেন। কোন ওয়ালী যাতে অত্যাচারী বা স্বৈরাচারী না হয়ে যান, তার জন্য খলিফা গোয়েন্দা বিভাগের লোক নিযুক্ত রাখতেন। কোথাও কোথাও কোষাগারের দায়িত্বও তাকে পালন করতে হত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোষাধ্যক্ষই খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। প্রতিটি প্রদেশে একটি প্রাদেশিক প্রশাসন ভবন থাকত, যাকে বলা হতো দিওয়ান। এবং শাসনকর্তার বাসভবনকে বলা হত দারুল-আমারা। প্রতিটি প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল, এবং জেলার শাসনকর্তাকে আমিন, বিচারককে কাজী, রাজস্ব সচিবকে সাহেব-উল-খারাজ, অর্থ সচিবকে সাহিব-উল-বাইতুলমাল এবং পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাকে সাহিব-উল-আহদিস বলা হত। এঁরা প্রত্যেকেই গভর্নরের নিকট আপন আপন কাজের জন্য দায়ী থাকতেন। ভাল কাজের জন্য

যেমন কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা হত, তেমনি মন্দ কাজের জন্য তিরস্কৃতও করা হত। প্রয়োজন বোধে সরকারি কাজ হতে বরখাস্তও করা হত। অনেক সময় অন্যায়ভাবে অর্জিত ধন সম্পদকে বাজেয়াপ্তও করা হত। হযরত ওমরের বিচারে হযরত আবু হুরাইরা ও আমর-বিন-আল-আসের মত মানুষও এই শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাননি। বিচারে খলিফা ওমর এতই কঠিন ছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম অজেয় বীর খালিদকেও ছেড়ে কথা বলেন নি।

রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ

ইসলামের মূল বক্তব্যকে সমাজে রূপ দেওয়ার জন্য তার রাজস্ব-ব্যবস্থা একটি অন্যতম দিক। ইসলামের মূল বক্তব্য বলতে আল্লাহকে মেনে সাম্য ভিত্তিক সমাজ বাবস্থা। মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান না রাখা। গরিব ও দরিদ্রকে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করা। এই মূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য ইসলাম তার রাজস্ব ব্যবস্থাকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে। যাতে সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিগণ এই রাজস্ব ব্যবস্থা হতে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। এই রাজস্বের কয়েকটি উৎস ছিল। যেমন–(১) যাকাত, (২) খারাজ, (৩) জিজিয়া, (৪) আল-ফে, (৫) আল-ওশর, (৬) উশূর, (৭) গনিমাত।

১. যাকাত ঃ মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবিত কালেই যাকাত প্রচলন করে যান। পবিত্র কোরআনেও এই যাকাতের কথা বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত একটি। রাষ্ট্র গরিব মানুষকে সাহায্য করবে, এবং এই রাষ্ট্রের প্রথম আয় ছিল যাকাত। যাঁরা সমাজে ধনী বা বিত্তশালী ব্যক্তি, তাঁদের উপর এই কর ধার্য ছিল। সাধারণত শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হয়। শস্য, সোনা, রূপা, গৃহপালিত জন্তু ইত্যাদির উপর এই কর ধার্য হত। ইসলামে নামাজের (উপাসনার) পরেই যাকাতের (দানের) স্থান। অর্থাৎ প্রভূর স্মরণ ও গরিবের রক্ষণ। এইটাই ইসলামের মূলকথা।

২ খারাজ ঃ এটি ভূমির রাজস্ব নামে পরিচিত ছিল। ইসলামের বিজয় ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর কঠোরভাবে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করেন। কোন সৈনিক বিজিত অঞ্চলে জমি-জায়গা ক্রয় করতে পারতেন না। এইভাবে খলিফা ওমর জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেন।

খলিফা ওমরের সময় বিজিত অঞ্চলের জমি-জায়গা জমির মালিকদের হাতেই থাকত। তাঁরা একটা নির্দিষ্ট কর দিতেন এবং এই কর 'বায়তুলমালে' জমা হত। এই কর যাতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ধার্য হয় তার জন্য খলিফা ওমর উসমান ইবনে হুনাইফ আল-আনসারীকে জরিপ কার্যের দায়িত্ব দেন। এই জরিপের ফলে তখনকার ইরাকে রাজস্ব প্রদানযোগ্য জমির পরিমাণ দাঁড়ায়–৩৬,০০০,০০০ জরীব।

নিম্নলিখিত কর ধার্য ছিল ঃ

১	জরীব	জমির	উৎপন্ন গমে	এক	দিরহাম	বার্ষিক কর
"	"	"	বার্লিতে	১/২	"	"	"
"	"	"	খেজুর/আঙ্গুরে	১০	"	"	"
"	"	"	তুলাতে	৫	"	"	"
"	"	"	তিলে	৮	"	"	"

সিরিয়া ও মিশরে তখন জরিপ করা সম্ভব হয় নি। তাই ঐ সমস্ত অঞ্চলে পূর্ব ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের রাজত্বকালে সিরিয়া হতে ১৪,০০০,০০০ দিনার রাজস্ব আদায় হত। মিশর সম্পর্কে খলিফা খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করেন। কেননা, মিশর ছিল অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। অনুরূপভাবে পারস্যের রাজস্ব ব্যবস্থা পূর্ববৎ ছিল। প্রতিবছর উৎপন্ন ফসলের উপরই রাজস্ব নির্ধারিত হত। যাতে কোন কৃষকের উপর অবিচার করা না হয়, সেদিকে খলিফা অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তখন রাজস্বের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল—১২৮,০০০,০০০ দিরহাম। কিন্তু অনুর্বর কোন জমি হতে খারাজ আদায় করা হত না।

৩. জিজিয়া ঃ বহুকাল থেকেই একটি কিংবদন্তী শোনা যায়, মুসলমান রাজা বাদশারা অমুসলমান প্রজাদের উপর জিজিয়া নামে একটি কর চাপিয়ে জুলুম করতেন এবং মুসলমান রাজা-বাদশারাই এর প্রচলন করেন। কিন্তু এর কোনটাই সত্য নয়। আসলে এর প্রবর্তন কোন মুসলমান রাজা-বাদশাই করেননি। ইসলামের বহু পূর্ব হতেই পারস্য বা সাসানীয় এবং রোমান বা বায়জানটাইনদের দ্বারা যে সমস্ত অঞ্চল অধিকৃত হত, তাদের অধিবাসীদের এই কর দিতে হত, যার নাম জিজিয়া। এই করের বার্ষিক পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ৪ দিনার, কোথাও বা কখনও কখনও ২ হতে ১ দিনার পর্যন্ত ছিল। মুসলিম রাজত্বে যাঁরা এই কর দিতেন, তাঁরা অমুসলমান ছিলেন। এই করের পরিবর্তে তাঁদের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান করতে হত না, ফলে প্রাণহানির সম্ভাবনাও ছিল না। এই কর থেকে অমুসলমানদের নারী, শিশু ও অক্ষমদের রেহাই দেওয়া হত। আবার যাঁরা স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতেন তাঁদেরও এই কর থেকে মুক্তি দেওয়া হত। সুতরাং মুসলমান রাজত্বে অমুসলমানদের উপর জিজিয়া ছিল, এটা ঠিক না। এটা ছিল একমাত্র তাঁদেরই উপর, যাঁরা সামরিক বাহিনীতে যোগদানে সক্ষম, অথচ অনিচ্ছুক। মুসলমানদের মধ্যে অনিচ্ছুকতা প্রকাশের কোনই সুযোগ ছিল না। তাঁদের সক্ষম ব্যক্তিদের যুদ্ধে যোগদান করতেই হত। অমুসলমানদের এই কর দেওয়ার জন্য তাঁদের মান-সম্মান-ধন-সম্পদ সমস্ত কিছু রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল মুসলমান বাদশার। তিনি কখনও অক্ষম হলে জিজিয়া ফেরৎ দিতেন, বা নেওয়া বন্ধ করতেন।

৪. **আল-ফে ঃ** মালিকবিহীন জমি, খাসজমি, শত্রুদের নিকট হতে বাজেয়াপ্ত জমি, অনাবাদী বা অন্যান্য জমি হতে যে কর আদায় হত, তাকেই আল-ফে বলা হত। তবে এর পরিমাণ খারাজ অপেক্ষা অনেক কম ছিল। এছাড়াও তখনকার দিনে 'হিমা' নামে অন্য একটি কর আদায় হত। মহানবীর জীবিতকালেও এটির প্রচলন ছিল। তখন অনেক চারণভূমি থাকত। যাদের উট ও ঘোড়া নিয়মিতভাবে ঐ সমস্ত চারণভূমিতে বিচরণ করত, তাঁদের 'হিমা' নামে একটি কর দিতে হত।

৫. **আল ওশর ঃ** দুই রকমের জমি ছিল। এক শ্রেণীর জমিতে নিয়মিতভাবে সেচের ব্যবস্থা ছিল। এই নিয়মিতভাবে সেচব্যবস্থাপূর্ণ জমিতে 'আল-ওশর' নামে কর ধার্য ছিল, এর পরিমাণ ছিল–উৎপন্ন শস্যের ১/১০ অংশ। কিন্তু জমিদার বা বড় জোতদার ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে এটি আদায় করা হত না। যে সমস্ত জমিতে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জলসেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাদের উৎপন্ন ফসলের ১/২০ অংশ কর দিতে হত।

৬. **উশুর ঃ** বাণিজ্যকরকে উশুর বলা হত। কোন বিদেশী বণিক ইসলামি রাজ্যে বাণিজ্য করতে এলে শতকরা ১০ টাকা ও মুসলমান বণিকদের শতকরা ২ $\frac{১}{২}$ টাকা আমদানিকৃত পণ্যের উপর কর দিতে হত। মামুলী ব্যবসায়ীদের এই কর দিতে হত না। পণ্যের মূল্য ২০০ দিরহামের বেশি হলে এই কর দিতে হত।

৭। **গনিমাত ঃ** গনিমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ। এই সম্পদের ১/৫ অংশ বাইতুলমালে জমা পড়ত, এবং চারভাগ বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হত। সরকারি কোষাগারে যে ১/৫ অংশ জমা পড়ত, তাকে খুম্‌স্ বলা হত। এই খুমসের যে অংশ মহানবী (দঃ) ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ভাগে পড়ত, তা হতে সেনাবাহিনীর নানাবিধ উপকরণ ক্রয় করা হত। যেহেতু মহানবী (দঃ) ও তাঁর নিকট আত্মীয় কেউ সদ্‌কা বা দান গ্রহণ করতেন না।

বায়তুলমাল ঃ এর আভিধানিক অর্থ সম্পদের ঘর, পরিভাষাগত অর্থ কোষাগার। মহানবীর (দঃ) এর সময়ে যে অর্থ প্রাপ্তি হত, তা পরিমাণে খুব বেশি না হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বিলি হয়ে যেত। সুতরাং কোষাগার স্থাপনের কোন প্রয়োজন তখনও দেখা দেয়নি। এই ব্যবস্থা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময়েও চলতে থাকায় তখনও কোন কোষাগার স্থাপিতহয়নি। পরবর্তী খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সময় এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, যখন ইসলামের বিস্তৃতি বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যখন বিজিত অঞ্চল হতে অপরিমিত অর্থ-সমাগম হতে থাকে, তখন সেগুলোকে নিরাপদে সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিল। যখন ওয়ালিদ ইবনে হিশাম প্রথম খলিফাকে একটি

কোষাগার স্থাপনের পরামর্শ দেন, তখন মজলিশ-উস্-শূরার পরামর্শ মত খলিফা কোষাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথম মদীনায় কেন্দ্রীয় কোষাগারে ও পরে প্রতি প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক কোষাগার স্থাপিত হল। আবদুল্লাহ ইবন-উল-আরফান প্রথম কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে প্রয়োজনমত অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দও নিযুক্ত হন। এই কোষাগারগুলো গভর্নরের বাসগৃহের সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত হত, যাতে উপযুক্তভাবে রক্ষাবেক্ষণ করা যায়। আজিও ইসলাম জগতের কোষাগারে অন্য কিছু থাক না থাক তিনটি নাম চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত আছে ও থাকবে– হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), ওয়ালীদ-ইবনে-হিসাম, আব্দুল্লাহ-ইবনে-আরফান।

দীওয়ান ঃ বায়তুলমালে যে প্রচুর অর্থ সমাগম হত, তাকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার জন্য খলিফা দীওয়ান বা রাজস্ব-বিভাগ স্থাপন করেন। এই বিভাগের কাজ ছিল বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যের করগুলো সুষ্ঠুভাবে আদায় করা এবং আদায়ীকৃত অর্থ গরিব জনসাধারণের কল্যাণে বণ্টন করা। দেশের রক্ষার্থে, গরিবের উপকারার্থে এই অর্থ বণ্টন করা হত। অন্যান্যদের যখন ভাতা হিসাবে অর্থ দেওয়া হত, তখন পক্ষপাতিত্বহীন নীতি অনুসরণ করা হত। ভাতার হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

মহানবীর বিধবা পত্নীদের প্রত্যেকে	১২,০০০	দিরহাম
বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী আনসার, মোহাজের	৪০০০	”
এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ	৫০০০	”
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী	৫০০০	”
মক্কার অধিবাসী ও অপরাপর লোকজন	৮০০	”
অন্যান্য মুসলমানগণ	৬০০-২০০	”

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রখর দৃষ্টি রাখতেন যাতে বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও একজনের হাতে বেশি সম্পদ সঞ্চিত না হয়। তিনি ধনতন্ত্র রাজতন্ত্র ইত্যাদি সৃষ্টির ঘোর বিরোধী ছিলেন। সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, আল্লাহ-প্রদত্ত নীতি তাঁর জীবনের একান্ত নীতি ছিল। তাই তাঁর সময়ে কোথাও জমিদার বা জোতদারের জন্ম হয়নি। তিনি ছিলেন World-communism বা বিশ্ব-সাম্যবাদের জনক স্বরূপ। দুঃখের বিষয় তারপর এই ইসলামি প্রথা নানা আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল। যার ফলে হযরত ওসমানের সময় জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর অভ্যুদয় হলে সাম্যের সৈনিক মহানবীর একান্ত সহচর হযরত আবুজর গিফারী সাম্যবাদের পক্ষে ও ধনতন্ত্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মহানবী (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Communism সাম্যবাদ হযরত ওমর (রাঃ) পর্যন্ত নির্বিবাদে চলেছিল। সুতরাং World-communism বা বিশ্ব-সাম্যবাদের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মহানবী (দঃ) নিজে, এবং

পরবর্তীকালে তাঁর দুই খলিফা তাঁর একান্ত অনুসারী, এবং আবুজর গিফারী সাম্যবাদের পক্ষে প্রথম সংগ্রামী মানুষ। পরবর্তীকালে আবুজর গিফারীর সাম্যবাদের আরবী পুস্তক জার্মান ভাষায় অনূদিত হলে বহু জার্মান পন্ডিত ও চিন্তাবিদ, এমন কি কার্লমার্কসও তাঁর আদর্শে প্রভাবান্বিত হন।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ আরব জাতীয়তাবাদ ঃ

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) আরব জাতিকে একটি সুগঠিত সামরিক জাতিতে পরিণত করার জন্য আরব-জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন। সমরে সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য তাঁর এই দূরদর্শিতার কোন তুলনা ছিল না। আরব জাতিকে শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করার জন্যই তিনি তাদের অন্যান্য দেশ হতে পৃথক রাখলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন কোন আরবীয় মুসলমান আরব ব্যতীত কোথাও জমি-জায়গা ক্রয় করতে পারবে না। কোন সামাজিক বা বৈবাহিক সম্পর্কেও তারা জড়িত হতে পারবে না। এর জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন বিজিত অঞ্চলের জমি-জায়গা ঐ অঞ্চলের পূর্ব মালিকগণই ভোগ করবে। এইভাবে আরবীয় মুসলমানদের তিনি আরব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে একটি বিরাট শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করেন।

সেনানিবাস ঃ

আবব সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে রাখার জন্য খলিফা কতকগুলো সেনানিবাস তৈরি করেন। এই সেনানিবাসগুলো ছিল–হিমস্, কুফা, বসরা, জাবিয়া, আমওয়াস, তাবাবিয়া, লদ্, রামলা, ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। কিন্তু এই সমস্ত সেনারা ঐ অঞ্চলের কোন জমি-জায়গা ক্রয় করতে পারত না, কোন বিবাহ-বন্ধনে জড়িত হতে পারত না, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা উৎসবে যোগদান তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে তাদের নিখুঁত সামরিক চরিত্রকে নির্ভেজাল রাখা হয়েছিল। সমগ্র আরব জাহানকে আরব জাতীয়তাবাদের পীঠস্থানে পরিণত করার জন্য খলিফা খাইবারের ইহুদী ও নাজরানের খ্রীস্টানগণকে আরবভূমি হতে স্থানান্তরিত করেন। এইভাবে আরবভূমি খলিফা ওমরের দ্বারা ইহুদী ও খ্রীস্টানমুক্ত হয়।

সেনাবীহিনী ঃ হযরত আবুবকর ঃ

প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের সময়ে সেনাবাহিনী সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু শক্তিতে বেশি ছিল। যদি ঐরূপ না হত, তাহলে মহানবীর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে যে বিদ্রোহ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা আর কোনদিনই প্রশমিত বা প্রদমিত হত না। কিন্তু খলিফা আবুবকর সামান্য বা সীমিত সংখ্যক

সেনাসহ সমস্ত বিদ্রোহকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হন। মহানবীর পরিকল্পিত জায়েদের পুত্র উসামার নেতৃত্বে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একজনের নামোল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। যিনি খলিফাকে দুহাতে সাহায্য করেন, যিনি আজিও পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বীরের গৌরব অর্জন করে আছেন, যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং খলিফা আবুবকর বলেছিলেন–"পৃথিবীতে এমন কোন দ্বিতীয় জননী আছে কি, যে আর একজন খালিদকে জন্ম দিতে পারে?" স্বয়ং মহানবী বলেছিলেন–"এখন সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) যুদ্ধ পরিচালনা করছে, মুসলমানদের জয় হবে।" অন্যত্র, "হে খোদা, খালিদ তোমারই তরবারি, তুমি তাকে চিরবিজয়ী রেখ।" মহানবীর দোয়া সার্থক হয়েছে, খালিদ আজও অজেয় বীর।

হযরত ওমর ঃ

দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময় সেনাবাহিনী আরো সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠল। তিনি সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেন, যেমন–পদাতিক, তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী। আবার এইসেনাবাহিনীরপেছনে রাখলেন গুপ্তচর দল ও সার্ভিস কোর। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহীগণ তলোয়ার, ঢাল, বর্শা, বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধান করত। পদাতিকগণ পায়জামা ও জুতা পরিধান করত।

সমরে শ্রেণীবিভাগ ঃ

প্রতিটি সামরিক ঘাঁটিতে জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থাদি থাকত। যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী সাধারণত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত থাকত,–অগ্র, পশ্চাৎ, মধ্য, ডান ও বাম ভাগ। এই দলগুলিকে যথাক্রমে বলা হত–মোকাদ্দমা বা ভূমিকা, মাকাহ, কলব, মায়মানা ও মায়সার ইত্যাদি।

বাহিনীতে স্তরবিন্যাস ঃ

সেনাবাহিনীর একজন অধিনায়ক থাকতেন, যাঁকে আমীর বলা হত, তিনি খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। দুটো সেনাবাহিনী একসাথে যুদ্ধ করতে থাকলে একজন সবাধিনায়ক নিযুক্ত হতেন। একটি সেনাবাহিনীতে দশ জন কায়েদ থাকতেন। একজন কায়েদের অধীনে একশ জন সৈন্য থাকত। প্রতিটি কায়েদ আবার দশটি দলে বিভক্ত থাকত। এই দশজনের দলটিতেও একজন সেনাপতি থাকত, যাঁকে বলা হত আমীর-উল-আশরাহ,--অর্থাৎ দেশের প্রধান। সুতরাং প্রতি দশজন হতেই সেনাবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ হত। পদাতিক, তীরন্দাজদের

ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনী যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে মিশে গেলে সামান্য দূর হতে স্কাউটগণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করে অধিনায়ককে জানাতেন। সেনাধ্যক্ষকে প্রাত্যহিক নামাজে ও জুম্মার নামাজে ইমামতী করতে হত। তিনি একদিকে সৈন্য পরিচালনাও করতেন আবার নামাজ পরিচালনাও করতেন। তাই তাঁকে ইমামও বলা হত। সেনাবাহিনী যাতে যুদ্ধের পর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে তার জন্য খলিফা দেহরক্ষী সেনাবাহিনীরও প্রচলন করেন।

পরবর্তীকালে যখন অন-আরব মুসলমানগণ বহুল পরিমাণে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে থাকলেন, তখন তাঁদের তত্ত্বাবধান ও মূল সেনাবাহিনীর সাথে তাদের যোগাযোগ ইত্যাদির প্রশাসনিক কাজের জন্য খলিফা একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করেন, যাঁকে বলা হত-'আরিক'। যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ও রসদ সরবরাহের জন্য খলিফা দ্বিতীয় একজন পদস্থ কর্মচারীর অধীনে একটি বিভাগ খোলেন, এই বিভাগকে 'আহরা' বলা হত। আত্মরক্ষা ও পরিখা খনন বা প্রাচীর নির্মাণ কাজের জন্য পৃথক সংস্থা ছিল। অনেক সময় সেনানিবাসে সৈন্যদের স্ত্রী-পুত্রগণও থাকতেন।

সামরিক বিভাগ ঃ

খোলাফায়ে রাশেদুনের সময় সমগ্র সামরিক শক্তি মোটামুটি নয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন—কুফা, বসরা দামেস্ক, ফুসতাত, হিমস্ প্যালেস্টাইন, উরদুন এবং মদীনায় ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। আরো বহু সামরিক ঘাটি ছিল। সেনাবাহিনীর অভিযোগ খলিফা মনোনিবেশ সহকারে শুনতেন। তাঁরা ৩০০ হতে ৬০০ দিরহাম বেতন পেতেন। তাঁদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের ভাতার সুবন্দোবস্ত ছিল। যখন কোষাগারে টাকা-পয়সার আমদানি হতো, তখন ওশর হতে সেনাবাহিনীর বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল, পরে 'উশুর' হতেও দেওয়া হত। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধলব্ধ ধনের ৪/৫ অংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হত। থাকা-খাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদেরও অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা ছিল। মহানবীর সময় কোন সেনাবাহিনী ছিল না বললেই চলে, তাঁর একান্ত অনুচরবৃন্দ একদিকে ছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত উম্মৎ বা শিষ্য এবং অন্যদিকে ছিলেন বিপদের সময়ে শহীদী সেনা। সাধারণ মানুষ জীবনকে যেমন বা যতটুকু ভালবাসে, তাঁরা মৃত্যুকে (শাহাদাৎ বরণকে) তা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালবেসেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁদের সংখ্যা ছিল তিন থেকে পাঁচ হাজার মাত্র। এই সামান্য কয়েকজন সৈন্যই বিশাল আরব বেদুঈনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০,০০০। কেননা সিফফিনের যুদ্ধে আমরা খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষে ৯০,০০০

সৈন্যের সমাবেশ দেখতে পাই। তখন প্রতিটি সৈন্য শিবিরে ৪০০০ অশ্ব ও ৩৬,০০০ অশ্বারোহী মজুত থাকতেন। এই সমস্ত সৈন্য শুধু যে যুদ্ধেই বীর ছিলেন তা নয়, সামাজিক কাজেও তাঁরা ছিলেন অসাধারণ।

নৌশক্তি ঃ

যদিও আরব দেশে বিশেষ কোন নদী-নালার প্রাচুর্য নেই, মরুভূমি মরূদ্যানের দেশ। তবুও দেশটি তিন দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের সময় হতেই নৌবহর গড়ে উঠতে থাকে। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া এই কাজে প্রথম পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হন। তাই সমরকুশল মুয়াবিয়াকে মুসলিম নৌবহরের জনক বলা হয়। যখনই আরব সেনাবাহিনী আপন দেশে আরবকে পূর্ণভাবে করতলগত করে বাহির বিশ্বের দিকে পা বাড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হল নৌবহর। কেননা, আরব ছিল তিনদিকে জল দ্বারা বেষ্টিত। হযরত আবুবকরের সময় মুসলমান সেনাবাহিনীর যে উদ্দীপ্ত কামনা হযরত ওমরে রূপময় হয়ে উঠল, এই বিরাট সাফল্যের মুলে ছিল–মুসলিম নৌ-বহরের বিশাল অবদান। পারস্য ও বাইজানটাইনের বহু অঞ্চল মুসলিম পতাকাতলে আসার মূলে ছিল মুসলিম নৌবহর। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান একটি বিশুদ্ধ আরব নৌবহর তৈরি করেন। এই নৌবহর কতৃক ৬৪৯ ও ৬৫১ খ্রীস্টাব্দে ভূ-মধ্যসাগরের সাইপ্রাস ও রোডস অধিকৃত হয়। ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম নৌবহরের সাথে সংঘর্ষের ফলে এক বিশাল বাইজানটাইন নৌবহর একেবারেই বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তীকালে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরেও মুসলিম নৌবহর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে যায়।

সুতরাং মুসলিম সামরিক ব্যবস্থা মুসলিম বীরদের ঈমানের স্পর্শে বা আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের বিশ্বাসের জাদুদণ্ডে সোনারূপে ফলে উঠেছিল।

সমাজ জীবন ও সামাজিক ব্যবস্থা ঃ

বিচার বিভাগ ঃ

আজও জগতের কোণে কোণে প্রবাদবাক্য রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে–'কাজীর বিচার'। এই কাজীর বিচারের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)। তিনি ঘোষণা করেছিলেন–৬০ বছরের 'নফল এবাদৎ' অতিরিক্ত উপাসনা অপেক্ষা একদিনের একটি ন্যায়বিচার আল্লাহর নিকট অধিক মূল্যবান। এই সামান্য কথাতেই ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বয়ং মহানবী তাঁর সময়ে হযরত ওমরকে বিচারপতি নিযুক্ত করেন। হযরত ওমর তাঁর নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার দ্বারা তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন. মহানবীর জীবিতকালেই বিচারক ওমর আপন হাতে আপনার পুত্র আবুশামার প্রাণদণ্ড দেন। আবার খলিফা থাকাকালীন পৃথিবীর অজেয়-বীর সেনাপতি খালেদ-বিন-ওয়ালিদকে পদচ্যুত করে বিশ্ববিচারাসনের গৌরব বৃদ্ধি করেন। সুতরাং খলিফাদের সময় বিচার ছিল একেবারেই নিখুঁত বিকশিত গোলাপের ন্যায় গ্লানিহীন।

স্বয়ং খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। প্রতিটি প্রদেশে একজন প্রধান বিচারপতি থাকতেন, জেলায় জেলায় একজন করে কাজী থাকতেন। এই সমস্ত বিচারক নিযুক্ত হতেন খলিফার নেতৃত্বে মজলিস-উস-শুরার মাধ্যমে। বিচারক নিয়োগের সময় লক্ষ্য রাখা হত বিচারকের জ্ঞান-গরিমা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে। খলিফাগণ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন—উত্তম জননী ব্যতীত যেমন উত্তম সন্তান পাওয়া যায় না, তেমনি উত্তম বিচারক ব্যতীত উত্তম বিচারও আশা করা যায় না।

আজ হতে ১৪০০ শত বছর পূর্বে হযরত ওমর অনুভব করেছিলেন—প্রভাব-মুক্ত ন্যায়বিচার পেতে হলে বিচার বিভাগকে সাধারণ প্রশাসন হতে পৃথক করতে হবে। তিনি তাই করেও ছিলেন। এই ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে আজও অনুসৃত।

খলিফাদের সময় বিচারকার্য সমাধা হত কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ইত্যাদি দ্বারা। তবে যারা অমুসলমান ছিলেন, তাঁদের বিচার তাঁদের আপন ধর্মানুযায়ীই হত। এমন কি, অনেক সময় তাঁদের বিচারকার্য তাদের লোক দ্বারাই করা হত।

ধর্মীয় বিভাগ ঃ

ইসলামে পৃথক ভাবে কোন ধর্মীয় জীবন নেই। তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিজীবনই ধর্মীয় জীবন। তাঁর দৈনন্দিন কাজেই তার এবাদৎ বা উপাসনা। ইসলাম বলে, মানুষের প্রতিটি সৎকাজই তার বড় এবাদৎ। যে তার আপন কর্মজীবনে অসৎ সে ধর্মেও অসৎ। সুতরাং ইসলামে ধর্মীয় বিভাগ বলে কোন বিভাগ নেই। কোরআন ৫১ ঃ ৫৬। ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের দর্শন - মানুষের সংসারের কর্মই তার স্বর্গের ধর্ম। এই জন্যই খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যাঁরা কর্মময় জীবনের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন, তাঁরাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর ইমামতি করতেন বা নেতৃত্ব দিতেন। খলিফা স্বয়ং মসজিদে নববীতে শুক্রবারের জুম্মার সাপ্তাহিক নামাজে খুৎবা পাঠ করতেন, বা বক্তৃতা দিতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় বিজিত অঞ্চলে বহু মসজিদ গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময় আরবে প্রায় ৪০০০ মসজিদ গড়ে ওঠে।

জিম্মী ঃ

খোলাফায়ে রাশেদুনের সময় যে সমস্ত অমুসলমান তাঁদের রাজত্বে বাস করতেন, তাঁদের জিম্মী বলা হত। খলিফা ওমর এই জিম্মীদের উপর অসাধারণ ভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের ধর্মীয় স্থানগুলোকে নষ্ট করা তো বহু দূরের কথা, সেগুলোর তত্ত্বাবধানের ও সংস্কার এবং মেরামতের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতেন। জিম্মীদের ধর্মীয় স্থানগুলোকে করমুক্ত করেও খলিফা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। জিম্মীদের সকল অসহায়, দুঃস্থ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-অন্ধ-খঞ্জ প্রভৃতির জন্য বায়তুলমাল হতে ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, মজলিস-উস-শূরার মাধ্যমে জিম্মীদের প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং শাসনকার্যে তাঁদের সম-মর্যাদা দান করতেন। খলিফা ওমর কর্তৃক মহাবীর খালিদের পদচ্যুতির এ নাকি একটি কারণ ছিল। তিনি অমুসলমানদের প্রতি খুব কঠোর ছিলেন। এটা খলিফা পছন্দ করতেন না। অধ্যাপক হিট্টী বলেন--"মুসলিম আইনের বাইরেও তাঁরা তাঁদের নিজস্ব আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন, এবং তাঁদের ধর্মীয় প্রধানগণ তাঁদের বিচার করতেন।" এইভাবে ইসলামের উদার নীতি ও সাম্যবাদ অপরকে আপন করে তুলেছিল।

পুলিশ বিভাগ ঃ

প্রথম খলিফা আবুবকরের সময়ে কোন পুলিশ বিভাগ ছিল না। তখন জনগণকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদেরই সতর্ক থাকতে হতো। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের সময় পুলিশ বাহিনীর প্রবর্তন হয়। এই পুলিশ বাহিনীর মূল কাজ ছিল সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির মানুষকে প্রশমিত করা। রাত্রিবেলাও পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা ছিল। এককথায় তখন শাসন-ব্যবস্থা অত্যন্ত নিখুঁত ছিল। হযরত আলীর সময় পুলিশ বাহিনীকে আরো জোরদার ও সুসংহত করা হয়। তখন এই বিভাগকে 'শুরতা' এবং এই বিভাগের প্রধানকে সাহিব-উশ-শুরতা বলা হত। এই বিভাগ বাজার, হাট, ওজন-মাপ, ও সমাজদ্রোহীদের উপর নজর রাখত।

শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ

ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও জ্ঞান ভিত্তিক স্বয়ং মহানবী (দঃ) শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত ধর্মকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেননি। তিনি বলেন, "অশিক্ষিত ব্যক্তির এবাদৎ বা উপাসনা অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির নিদ্রা উত্তম।" এই কথার দ্বারা সহজেই বুঝা যায়–তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে কত ভালবাসতেন। তিনি আরো বলেন–"শহীদের রক্ত অপেক্ষা জ্ঞানীর কলমের কালির মূল্য বেশি।" পবিত্র

কোরআন বলে—"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো।" ২৪ ঃ ৩৫। পবিত্র হাদিস বলে—"জ্ঞানই আলো।" সুতরাং মহানবীর (দঃ) দৃষ্টিতে যে জ্ঞান লাভ করছে, সে আলো লাভ করেছে, এবং যে আলো লাভ করেছে, সে যেন আল্লাহকে লাভ করেছে। তাই মহানবী (দঃ) তাঁর উম্মৎ বা শিষ্যদের মধ্যে ঘোষণা করে গেছেন – " প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন অতি অবশ্যই কর্তব্য।" সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম-ধর্ম ও শিক্ষা জ্ঞান ভিত্তিক।

পবিত্র কোরআন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা দিচ্ছে—বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট জ্ঞান ভিক্ষার জন্য—

হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"
মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যা বল—হে প্রভু আমার। ২০ ঃ ১১৪

মহানবী নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা করতেন জ্ঞানের জন্য—

তোমার কামনা যেটি বলেছে কোরআন
ধন নয়, জন নয়, দাও মোরে জ্ঞান।
বুকেতে বাসনা আর ধমনীতে ধ্যান—
"হে বিশ্ব পালক মম বৃদ্ধি কর জ্ঞান।"
করেছ ধৈর্যের সাথে অন্তহীন ধ্যান
পেয়েছ নিখিল জোড়া আদি অন্ত জ্ঞান।

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী (দঃ) এইভাবে নিজেই শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়ে গিয়েছিলেন। এককথায়, তিনি বুঝিয়ে গিয়েছিলেন—মানুষ ও পশুর পার্থক্য শুধু শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ পশুতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং শিক্ষাকে মহানবী মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলেই বর্ণনা করে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদুন মহানবীর কথার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করেন। এবং তাঁরাও শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। প্রতিটি মসজিদ-সংলগ্ন স্থানে একটি করে মক্তব বা মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। যেখানে সেখানকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা নিতে পারত বা এই ধারা সারা বিশ্ব মুসলমানকে প্রভাবান্বিত করে। তাই আজও দেখা যায় অনেক মসজিদ-সংলগ্নে মক্তব ও মাদ্রাসার ক্ষীণ চিহ্ন বিরাজমান। খোলাফায়ে রাশেদীনদের প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত মাদ্রাসাতে শুধু যে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত তা নয়, সকল প্রকারের শিক্ষা দেওয়া হত। তাঁরাই গড়ে গিয়েছিলেন—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর। (বিস্তারিত – মহানবী দ্রষ্টব্য)

জনহিতকর কাজ ঃ

জনগণের সুখ-সুবিধার জন্য খোলাফায়ে রাশেদু'ন নিজেদের জীবনকেই উৎসর্গ করেছিলেন। প্রজাদের বা কৃষকদের সুখ সুবিধার জন্য রাজ্যের জমি জরিপ করা হয়। যাতে কারো প্রতি কোনরূপ অবিচার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য পৃথক অফিসারও নিয়োগ করা হয়। এই সামগ্রিক জরিপ ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে এখানেই প্রথম। অতঃপর কৃষকগণের সুবিধার জন্য ক্যানেল বা খাল খননও করা হয়। খলিফা ওমরের অনুমতি ক্রমে আমর-ইবন-আল আস মিশরও আরবের মধ্যে "আমিরুল-মোমেনিন" নামে একটি খাল খনন করেন। এ ছাড়াও বহু অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য আরো কতকগুলো বিখ্যাত খাল খনন করা হয়। যেমন—নহর-ই-সাদ, নহর-ই-মালিক, ও নহর-ই মুসা প্রভৃতি প্রধান। সাধারণ মানুষকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য—ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রিস নদীর বাঁধ খলিফাদের অমর অবদান। রাস্তাঘাট নির্মাণেও তারা ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। গরিব দুঃখীদের সাহায্যার্থে ছিল বাইতুলমাল। এইভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে যে ইতিহাস তাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন তা আজও বিশ্ব ইতিহাসে বিস্ময়কর।

খোলাফায়ে রাশেদীন জীবনের মহিমা ও সার্থকতা প্রমাণ করে গেছেন। ধর্মের অধ্যায়ে তাঁরা দেখিয়েছেন—জীবন আত্মসচেতনতায় নয়, আত্মসমর্পণে এবং কর্মের অধ্যায়ে দেখিয়েছেন—জীবন ভোগে নয়, ত্যাগে।

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় আরব অন-আরব, মুসলমান ও অমুসলমান সবই খলিফাদের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ইসলামি সাম্রাজ্যকে একটি একান্নবর্তী পরিবারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও নিচে কিছু কিছু সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল। যেমন আনসার, মোহাজেরীণ, ও আরব মুসলমান প্রভৃতি প্রথম সারির অন্তর্গত ছিল। অন-আরব মুসলমান দ্বিতীয় সারির ও বাকি অন্যান্যগণ তৃতীয় সারির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় ও শাসনে বা প্রশাসনে এই শ্রেণী-বিন্যাসের কোন বিশেষ মূল্য ছিল না। সেখানে সকলেই সমান। বস্তুতঃ ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব-ভিত্তিক শান্তির প্রতীক।

অনেক সময় অনেক অন-আরব মুসলমান সামরিক বিভাগে যোগদান করত এবং আরব মুসলমানের সমপর্যায়ে আসত। আবার অনেক সময় অনেক অন-আরব অমুসলমান আরব মুসলমানদের সাথে কার্যক্ষেত্রে যুক্ত হত যাদের 'মওলা' বলা হত।

নাগরিক জীবন ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের নাগরিক জীবন বা দৈনন্দিন জীবনধারা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। কোন রাজপ্রাসাদ তাঁদের ছিল না। কোন দ্বারী দরজায় প্রহরারত থাকত না। কোন খাস বাবুর্চীখানাও ছিল না। এমন কি বাড়িতে কোন চাকর বাকরও ছিল না। নিজ কাজ নিজ হাতে করতেন। বাড়িগুলো সাধারণত একতলা ইটের ছিল। আঙ্গিনায় একটি করে কূপ থাকত। সেই কূপের নিকট খলিফা নিজ হাতে নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন। কোন সময় দড়ি বেয়ে জল তুলতেন। এই ছিল তাঁদের জীবন। সাধারণ মানুষও খুব একটা আড়ম্বর-পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারতেন না। কেননা গরিবের জন্য যাকাত ও নানাবিধ কর পরিশোধ করতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় সঞ্চয়ের পথ প্রায়ই রুদ্ধ হত। পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল—আলখাল্লা, লম্বা কুর্তা, চামড়ার বেলটে বাঁধা ঢিলা পায়জামা, মাথায় পাগড়ী। মহিলাগণ ঢিলা পায়জামা, মাথায় দোপাট্টা, গায়ে পিরহান ইত্যাদি ব্যবহার করত। ধনীদের রেশমী ও পশমী কাপড় ব্যবহার করতে দেখা যেত। খনিজ পদার্থও কিছু কিছু প্রচলন ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

স্থাপত্য শিল্প ঃ

ইসলাম জগতে স্থাপত্য শিল্পের সূচনা হয় মসজিদ গৃহ থেকে। ইসলাম জগতের প্রথম মসজিদ মদীনার মসজিদ-ই-নবী, অর্থাৎ নবীর মসজিদ। পরবর্তীকালে বসরা, কুফা ও ফুস্তাতে মসজিদই নব্বীরঅনুকরণে মসজিদ নির্মিত হয়। এইভাবে আরব দেশের বাইরেও যখন মুসলমানগণ ছড়িয়ে পড়লেন তখন নানা স্থানে মসজিদ গড়ে উঠতে লাগল। আরবের বাইরে প্রথম বসরায় ওকবা ইবন গাজওয়ান কর্তৃক ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে একটি সাধারণ মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে বসরার শাসনকর্তা আবু মূসা আল আশারী একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করেন। ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে কুফার শাসনকর্তা সাদ ইবন-আবু ওয়াক্কাস কুফাতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে মিশর বিজিত হলে আমর-ইবন-আল-আস ফুসতাতে (কায়রো) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদগুলো খুব একটা আড়ম্বর পূর্ণ ছিল না। তবে এইগুলোই ছিল মুসলিম স্থাপত্যের সূচনাস্বরূপ। যে সূচনা একদিন সৃষ্টি করল বিশ্ববিখ্যাত 'তাজমহল' ও স্পেনের 'আলহামরা', যা আজও জগৎ স্থাপত্য শিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার গৌরবে গৌরবান্বিত।

পরিশিষ্ট—২

ইসলামি গণতন্ত্র

(Democracy under the Pious Caliphs)

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রত্যেক নিয়মতান্ত্রিক (আইনানুগ) সরকারের বিশেষ এক নীতি থাকে, যাকে ভিত্তি করে সব পরামর্শ ও আইন-কানুন রচনা হয়ে থাকে, ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা তার নাম দিয়েছে মূলনীতি। সরকার সর্বদা এই মূলনীতি অনুসরণ করে চলতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রে যত আইন-কানুন ও রীতি প্রবর্তিত ও প্রচলিত হবে, তা সব সেই মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত হবে। তার প্রতিটি ধারা সামগ্রিক নীতিগত ভিত্তিতে রচিত হয়। ছোটখাট বিষয় সম্পর্কে তাতে কোনই উল্লেখ থাকে না। সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্র ও রাষ্ট্রের প্রতিটি দিক সম্পর্কে এসব মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ইসলামের যে মূলনীতি রয়েছে, তা হচ্ছে—"কোরআন ও তার বাস্তবায়িত রূপ," যার নাম হল 'সুন্নাহ'। ইসলামের সর্ববিধ আইন-কানুন এর ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে।

ইসলামের এই মূলনীতি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মূলনীতির মত মানুষের মন-গড়া নয়। এ হচ্ছে সেই সর্ববিধির মূল বিধাতার রচিত মূলনীতির ওপরে স্বভাবতই দুনিয়ার প্রতিটি অণুপরমাণু চলছে। তাঁর বাণী ও বিধানের কোন দিন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।

এই মূলনীতির আওতার বাইরে যেসব নৈমিত্তিক পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার দেখা দেবে, এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মিলিত পরামর্শের দ্বারা সে সব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মসজিদে নববী ছিল সেদিনকার পরামর্শ কেন্দ্র বা পার্লিয়ামেন্ট ভবন। মুহাজেরীন ও আনসারদের প্রতিনিধিরা এবং কখনও সাধারণ মুসলমানরা এখানে মিলিত হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরামর্শ সভায় বসতেন। নামাজের জামাতের ব্যবস্থা করে এ মজলিশ অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হত। হযরত (সাঃ) যদিও মানবীয় বুদ্ধি ও শলাপরামর্শের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তথাপি উম্মৎদের শিক্ষাদানের খাতিরে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রার্থী হতেন। তাঁর এ নীতি খোলাফায়ে রাশেদীন হুবহু অনুসরণ করেন। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাববার বা নতুন করে বলার নেই। স্বয়ং কোরআন এ ব্যাপারে পরিষ্কার ঘোষণা দান করেছে ঃ

"কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" ৩ঃ ১৫৯। অন্যত্র সাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ তারা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে চালিয়ে থাকে।" প্রথম আয়াতে নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে তা বাস্তবায়িত হবার খবর দিলেন। প্রথম আয়াতের তফসির লিখতে গিয়ে 'ফতহুল বয়ান' প্রণেতা বিখ্যাত মনীষী ইবনে খোয়ান মেদাদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন।

দেশের শাসকদের উপর অপরিহার্য হচ্ছে যেসব পার্থিব ব্যাপার তাদের জানা নাই, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে তা নিয়ে পরামর্শ করা। তেমনি যুদ্ধের ব্যাপারে সেনাপতিদের সাথে, দেশের কল্যাণের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে, শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে উজীর ও পদস্থ কর্মচারীদের সাথে পরামর্শ করা রাষ্ট্র নায়কের পক্ষে ওয়াজেব বা অতি অবশ্যই কর্তব্য।

যেসব রাষ্ট্রনায়ক শাসনকার্যে শুরা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ না করেন তাদের সম্পর্কে বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রবিদ ইমাম কুরতুবীর ফতোয়া হচ্ছে এই ঃ যে রাষ্ট্রনায়ক পার্থিব জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে নিজ খেয়ালখুশিতে রাজ্য চালাতে চায়, তাকে অপসারণ করা যে ফরজ, এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই।

এখন আমি দেখাতে চাই যে, ইসলামে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন কিরূপে ঘটেছে। হযরত (সাঃ) সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) এ সাক্ষ্য দান করেন—"জনমতের মতামত নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে রসুলের চাইতে বেশি অগ্রসর আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি"। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন—"আমি হযরতের (সাঃ) মত সংগীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করার ব্যাপারে বেশী তৎপর আর কাউকে দেখিনি"।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত আমর ইবনুল আ'শকে (রাঃ) লিখেছিলেন—"রসুলে খোদা (সাঃ) যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের নিকট পরামর্শ চাইতেন। তোমারও তা করা অপরিহার্য।" এ হাদিসে শুধু হযরতের (সাঃ) কার্য পদ্ধতি প্রকাশ পাচ্ছে না, সাথে সাথে আবুবকরের (রাঃ) কার্যধারাও প্রকাশ পাচ্ছে।

এরপর এল হযরত ওমরের (রাঃ) যুগ। তিনি মুহাজের ও আনসারদের নিয়ে দস্তুর মত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বমূলক পরামর্শ সভা গড়ে তোলেন। তাঁদের নিকট হতে তিনি সর্বদা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তা ছাড়াও সর্বসাধারণকেও তিনি পরামর্শ দানের ব্যাপারে এতখানি স্বাধীনতা ও সুযোগ দান করেন যে, তারা রাস্তাঘাটে খলিফাকে কৈফিয়ৎ তলব করত। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের এ ব্যাপক পদ্ধতি তাঁর শাসনকালকে এরূপ উজ্জ্বল ও পূর্ণ করে রেখেছে

যে, কোন এক বিশেষ প্রবন্ধে তার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। উদাহরণ-স্বরূপ মাত্র কয়েকটি ঘটনা আমি তুলে ধরব।

কোহারের বলেন–"হযরত ওমরের (রাঃ) সামনে যখনই কোন জটিল প্রশ্ন দেখা দিত, তক্ষুণি তিনি যুবকদের ডেকে পাঠাতেন, এবং তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সুস্থজ্ঞান ও বিবেক অনুসারে সমস্যার সমাধান বেছে নেওয়া, ও তাদের শিক্ষা দেওয়া। বিখ্যাত ইতিহাসকার–'বালাযুরী' এক স্থানে মন্তব্য করেছেন ঃ–"মসজিদে নববীতে মোহাজেরীনদের এক মজলিশ বসত। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের সাথে এসে বসতেন এবং এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপাবে যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।"

কোরআন ও হাদিসের পরই ফেকার স্থান। ইসলামি ফেকাহ শাস্ত্রের তৃতীয় ভিত্তি হল 'এজমা' বা সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। তাই এজমা হচ্ছে জাতীয় জনমতের সব চাইতে পূর্ণ সার্বিক রূপ। অর্থাৎ ধর্ম-নেতারা কোরআন ও হাদিসের অনুল্লেখিত কোন ধর্মীয় প্রশ্নে এবং রাষ্ট্রনায়করা রাষ্ট্রনীতির কোন ব্যাপারে সবাইকে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারলেই তাকে 'এজমা' বলা হয়, এবং তা নির্ভুল ও অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ হুজুর (সাঃ) অধিকাংশের মতামতকে সর্বদা গুরুত্ব দান করেছেন। তিনি বলেছেন–"আমার উম্মতরা কোন ভ্রান্তির উপরে এক মত হতে পারে না।" আবার কখনও বলেছেন–"জামাতের ওপরে আল্লাহ সহায়তাব হাত বিস্তার করেন।" তাই জামাত হতে দূরে থেকে দল ছাড়া জীবন যাপনকে তিনি কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাতন্ত্রের বদলে জনমতভিত্তিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের মূলনীতিই হচ্ছে এগুলো। এর চাইতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ও সুন্দর রূপ আর কি হতে পারে ?

এ সব প্রমাণ ছাড়াও হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে, যাতে দেখা যায় যে হুজুর (সাঃ) খোদার নির্দেশ পালনের খাতিরে এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে প্রত্যেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজেই সবার পরামর্শ নিয়েছেন। জনমত যাচাই করে তাঁরা সে সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মসজিদে নববী ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের পরিষদ ভবন। মুহাজের ও আনসারদের প্রধানগণ ছিলেন সে পরিষদের বিশেষ সদস্য এবং অন্যান্য মুসলমান ছিল সাধারণ সদস্য। মদীনার অলিতে গলিতে 'আসসালাতু জামেয়াহ' ধ্বনি দিয়ে পরিষদ আহ্বান করা হত। এ পরিষদে যেসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, আমি এখানে তার কয়েকটি তুলে দিচ্ছি।

নবীযুগ ঃ

আযানের পদ্ধতি, হযরত আয়েশার (রাঃ) অপবাদমূলক ঘটনা, বদরের যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া, বদরের কূপের কাছে ছাউনী ফেলা, বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে মুক্তি দান, ওহদের যুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা। খন্দকের যুদ্ধে শত্রুগণের সাথে মদীনার আমদানির এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন প্রশ্ন, হোদায়বিয়ার যুদ্ধ সমস্যা ইত্যাদি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ঃ

কোরআন লিপিবদ্ধ করণ, ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করা, ইরাকের যুদ্ধ, মজুসীদের থেকে জিজিয়া আদায়ের প্রশ্ন, ইরাক ও সিরিয়াকে সৈন্যদের ভেতরে বন্টন করার প্রশ্ন, নেহাওয়াদের যুদ্ধে হযরত ওমরের (রাঃ) অংশগ্রহণ সমস্যা, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শাসনকর্তার নিযুক্তি, সেনাপতির মনোনয়ন দান, গনীমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন, সৈন্যদের বেতন নির্ধারণ, হিজরী সনের প্রবর্তন, দফতর বন্টন ব্যবস্থা, মহামারী এলাকায় প্রবেশের প্রশ্ন, বিদেশী ব্যবসায়ীদের ওপরে শুল্ক আরোপ, আফ্রিকার যুদ্ধ, বায়তুলমাল সম্পর্কিত প্রশ্ন ইত্যাদি।

রাজতন্ত্র বা একানায়কতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সরকারের ভেতরে বড় পার্থক্য এই যে, একানায়কত্বে জনগণের অর্থ ভাণ্ডারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে যথেচ্ছ ব্যবহাব করা হয়। রাজা-বাদশাহরা রাজকোষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে থাকেন। ফলে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও বিলাস-ব্যসন পূর্ণ করে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা হলেই রাজকোষের অর্থ জনগণের স্বার্থে ব্যয় করা হয়। আর সেটাকে তারা নেহাৎ কৃপার কাজ ভেবে থাকেন।

পক্ষান্তরে, নিয়মতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক সরকারের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, জনগণের অর্থভাণ্ডার কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় না। জনগণের অর্থ তখন জনগণের স্বার্থেই খরচ করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ এর থেকে প্রয়োজনীয় একটা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি পেযে থাকেন। ইসলাম সেখানেও এরূপ উজ্জ্বল ও উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছে, যার তুলনা আজ পর্যন্ত মেলেনি। আজকের সভ্যশ্রেষ্ঠ ইউরোপও গণতান্ত্রিক সরকারের এরূপ উত্তম নজীর কায়েম করতে পারেনি। লাখে লাখে টাকা আজও ইউরোপে শাসকবর্গের পেছনে উজাড় করা হচ্ছে। এখনও রাজপরিবারের পূজায় ও প্রেসিডেন্টের পদসেবায় সেখানে জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। সে সবের সামনে খোলাফায়ে রাশেদীনের বেতন ভাতা যদি তুলে ধরা হয়, তা হলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোনটি, তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

ইসলাম গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখে আসছে। দেশের যা কিছু আয়, তা খোদার ও মুসলমান জনসাধারণের, এ শিক্ষা ইসলাম প্রথম থেকেই দিয়ে আসছে। তাই জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের নাম দিয়েছে—'বায়তুলমাল-লিল মুসলেমিন' অর্থাৎ মুসলমানদের ধনভাণ্ডার।

নবী করিমের (সাঃ) যুগে বিজিত দেশগুলো থেকে যেসব ধনসম্পদ আমদানি করা হত, তা থেকে তিনি শুধু ততটুকুই গ্রহণ করতেন, যা এক দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় ভরণপোষণের জন্য অপরিহার্য মনে করে থাকে। অবশ্য সব অর্থ সম্পদ তিনি দেশের অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। অধিকাংশ সময়ে অবস্থা এই দাঁড়াত যে, সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে স্বয়ং আরবদের শাহানশাহ ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে নিতেন। মাসের পর মাস যেত, তাঁর ঘরে উনুন ধরানোর সুযোগ ঘটত না। অধিকাংশ রাতেই তিনি তেল জুটিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে সমর্থ হতেন না। এরূপ চরম সংকট মুহূর্তেও জনগণের অর্থ-ভাণ্ডার থেকে তিনি একটি পয়সাও গ্রহণ করা ঠিক মনে করতেন না। তাই তাঁর ইন্তেকালের পরে দেখা গেল যে, এক ইহুদীর কাছে কয়েক মাস গমের বিনিময়ে তার ঘটি বন্ধক রাখা হয়েছিল।

রাষ্ট্র কারোর ব্যক্তিগত মালিকানায় যেতে পারে না, এর জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন—স্বীয় আপনজনের কাউকে খলিফা মনোনীত না করে পরন্তু তিনি তা নির্বাচনের ভার সর্বসাধারণের হাতে ন্যস্ত করে গেছেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনও এই মহান আদর্শের অনুসারী ছিলেন। চার খলিফার ভেতর কারুরই এ অধিকার ছিল না যে, জনগণের অর্থ-ভাণ্ডার থেকে মাসিক নির্ধারিত যৎসামান্য ভাতাটুকু ব্যতীত এক পয়সাও গ্রহণ করেননি। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) খেলাফত শুরু করেও স্বীয় তেজারত অব্যাহত রেখেছিলেন। বায়তুলমাল থেকে তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। তারপর যখন খেলাফতের গুরুদায়িত্ব তাঁকে তেজারত ছেড়ে দিতে বাধ্য করল, তখন মুসলমানদের পরামর্শ ও অনুরোধে বাধ্য হয়ে তিনি সামান্য কিছু ভাতা গ্রহণে স্বীকৃত হলেন।

হযরত ওমরও (রাঃ) বায়তুলমাল থেকে কোন দিনই নির্দিষ্ট ভাতার এক পয়সাও বেশি নেননি। নিজের ভাতা তিনি নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। শীত ও গ্রীষ্মের জন্য দু'জোড়া কাপড়, জনৈক মধ্যবিত্ত কোরেশীর উপযোগী সরকারি বাহনের সাহায্যে একবার হজের সুযোগলাভ মাত্র।

একদা এক ব্যক্তি শুধু এতটুকু সন্দেহের কারণে তার কথা শুনতে ও মানতে অস্বীকার করলেন যে, হয়ত তিনি বায়তুলমাল থেকে সমান হারে প্রাপ্ত কাপড়

থেকেও বেশি কাপড় গ্রহণ করে জামা তৈরি করে নিয়েছেন। বায়তুলমাল থেকে উট ছুটে পালালে তিনি ঘাবড়ে গেলেন এ জন্যে যে, নিশ্চয় তাকে জবাবদিহী করতে হবে। খেলাফতের কাজে যখন তিনি বাতি জ্বালাতেন, কাজ শেষ হবার সাথে সাথেই তা নিবিয়ে ফেলতেন। তিনি বলতেন—আমার ব্যক্তিগত কাজে এ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

একদা হযরত ওমরের (রাঃ) স্ত্রী সাইয়েদা উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতেমা (রাঃ) কনস্টান্টিনোপল যাত্রী এক মুসলিম দূতের মারফত রোম সম্রাটের স্ত্রীর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠান। ওদিকে তা পেয়ে কায়সরের স্ত্রীও এক রোমক দূতের মারফৎ বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখন একথা জানতে পারলেন তখন ঘরে এসে সেই মহা মূল্যবান উপঢৌকন হস্তগত করলেন। অতঃপর তা বায়তুলমালে জমা দিয়ে স্ত্রীকে বললেন—"এ হচ্ছে সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রাপ্য। আমার খলিফা হবার আগে কি তোমার কাছে কোনদিন কায়সরের স্ত্রী উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।"

এ ঘটনার চাইতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ভাষণটি। তাতে তিনি খলিফার সাথে জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন ঃ—

"তোমাদের 'ধন ভাণ্ডার' ও আমার ভেতরকার সম্পর্ক হল এতীম ও অভিভাবক সম্পর্ক। যদি আমাব সামর্থ্য থাকে, তা হলে তা থেকে আমি কিছুই গ্রহণ করব না। যদি অভাবগ্রস্ত হই, তা হলে কোনমতে খেযে পরে বেঁচে থাকার মত কিছু তা থেকে নেব।"

"জনগণ ! আমার ওপবে তোমাদের কয়েকটি অধিকার আছে। তা তোমাদের দাবী করা উচিত। আমার ওপব তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে, আমি যেন অবৈধভাবে রাজস্ব ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ জমা না করি। আমার ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, রাজস্ব ও যুদ্ধ লব্ধ যা কিছু সম্পদ জমা হবে, তা যেন অবৈধভাবে খরচ না করি। আমার উপর তোমাদের এ দাবীও রয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে দিই।"

হায় খোদা ! আজ জনসাধারণ সরকারের কাছে নিজেরা দাবীদাওযা তুলেও কিছু পাচ্ছে না। অথচ এক যুগে মুসলমানদের অভ্যস্ত করা হত যে, সরকার যদি ভুলে যায়, তবে তারা যেন তাদের প্রাপ্য চেয়ে নেয়। স্বয়ং খলিফাই জনগণকে এই ট্রেনিং দান করতেন।

হযরত ওসমানও (রাঃ) নিজের ব্যাপারে এ পন্থাই অনুসরণ করে চলতেন। শেষ জীবনে যখন কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা প্রকাশ পেল, তখন অবশ্য বিরাট একদল মুসলমান তাঁর সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল।

হযরত আলী (রাঃ) কঠোরভাবে এ নীতি অনুসরণ করে গেছেন। আব্দুল্লাহ বিন যম আ যখন অনুচিতভাবে তাঁর কাছে বায়তুলমাল থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন তিনি জবাব দিলেন–"এ ধন আমার নয়, তোমার নয়, এ হচ্ছে সর্বসাধারণ মুসলমানদের গচ্ছিত ধন।"

ওলিদ বিন আবুল মালিক দামেস্কে অজস্র টাকা ব্যয় করে যখন জামে মসজেদ তৈরি করেছিলেন, জনগণ তখন তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই বলে যে, বায়তুলমালের অর্থ এভাবে ঢেলে দেওয়ার অধিকার খলিফার নাই।

দ্বিতীয় ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাঁর কাছে দুটি প্রদীপ রাখতেন। রাষ্ট্রীয় কাজের জন্যে একটি, এবং ব্যক্তিগত কাজের জন্য অপরটি ব্যবহার করতেন।

এসব ঘটনাবলীর পরেও কি বলা চলে যে, ইসলামি শাসন গণতান্ত্রিক নয়। এর চাইতে উত্তম গণসরকারের নজীর দুনিয়ার আর কোথাও মিলবে কি ? অতীতের ইতিহাস কি তার প্রমাণ দেবে। ভবিষ্যতেও কি এরূপ গণতন্ত্র দেখার সৌভাগ্য কারুর হবে !

এ তো হল মুসলমানদের সেই সব সরকারের স্বর্ণোজ্জ্বল কাহিনী, তেরশ' বছর আগে যা সর্বতোভাবেই ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ যদি মুসলমান আবাব নব জীবন ফিরে পায়, যদি আবার তাদের ধর্মীয় প্রেরণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এবং যদি তারা আবার ইসলামের সেই দুর্জয় প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে চায়, তা হলে ধর্মকর্মের সাথে সাথে রাজনীতিও সঠিকভাবে গড়ে তোলা তাদের পক্ষে অপরিহার্য কারণ, ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেয়নি। ইসলামের ইতিহাস আমাদের যে আদর্শ রাজনীতির আবহাওয়ায় গড়ে তুলেছে, তাতেই আমরা জীবন পেতে পারি অন্যথায় মবণ আমাদের অনিবার্য।

['যে সত্যের মৃত্যু নাই' গ্রন্থ হতে অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক]

পরিশিষ্ট ৩

বনু উমাইয়া যুগে আমর বিল মারুফের

(অর্থাৎ সৎকাজের জন্য আদেশের বা নির্দেশের)গতিরোধ

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

আমার বিশ্বাস কেয়ামতের (উত্থান) দিন যদি জালেমদের ফাছিক দল থেকে পৃথক করে দাঁড় করানো হয়, তা হলে তাদের পয়লা কাতারে বনু উমাইয়ারা থাকবে। সে জালেমরাই ইসলামের এই আজাদীর (গণতন্ত্রের) মন্ত্রটিকে জুলুমের শিকারে পরিণত করল। এর ঠিক উত্থান ও প্রসারতা লাভের মুহূর্তেই গতিরোধ করে দাঁড়ল। ব্যক্তিগত স্বার্থে এ আদর্শটিকে পদদলিত করল। তাই তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দিনটি 'আমব বিল মা' রুফের দ্বার রুদ্ধ হবার পয়লা দিন হিসাবে গণ্য হবে।

তারা যে শুধু ইসলামের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করে ছেড়েছে তাই নয়, অবশ্য ওটাওকোরআনেরদৃষ্টিতে প্রকাশ্য কুফরী বৈ নয়। কিন্তু সব চাইতে বড় জুলুম হল, তারা ইসলামের প্রাণ শক্তি সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নির্দেশটিকে তরবারির জোরে দাবিয়ে দিতে চাইল। মুসলমানদের সত্য বলার স্বতঃফূর্ত প্রেরণাকে নষ্ট করে দিল।

যেহেতু নবী-যুগের কোরআনীশিক্ষা ও আত্মিক শক্তির প্রভাব তখনও তাজা ছিল তাই যদিও নানা রূপ বেদাত ও পাপাচারে বাজার কিছুটা গরম ছিল, তথাপি সত্য প্রকাশের প্রচন্ড ধ্বনি দামেশক্ ও কুফা প্রাসাদে কাঁপন জাগিয়েছিল। ষাট বছরের এক বুড়ীকে দরবারে ডাকা হল। সে মুয়াবিয়ার সামনে বিপুল উদ্দীপনার সাথে শুধু সেই সব চরণ আবৃত্তি করে চলল, যাতে শুধু নবী-পরিবারের প্রশংসাই ছিল না, বরং বনু উমাইয়াদের কুৎসাও ছিল অনেক। আব্দুল মালেকের মত প্রভাবশালী ও অত্যাচারী বাদশাহ মদীনায় এলে, তখন তাঁর দুয়ারে কম্বলধারী ফকীররা এসে তাঁকে 'জালেম' আখ্যা দিয়ে যেত। ইতিহাসেআমরা দেখতে পাই, হাজ্জাজ খোলা তরবারি সামনে নিয়ে বসতেন। কিন্তু অনেক প্রাণোৎসর্গী মু'মিনরা, যাঁরা তার তরবারিকে উপেক্ষা করে সত্য ভাষণে তাঁর অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিত।

[অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক। — যে সত্যের মৃত্যু নাই।]